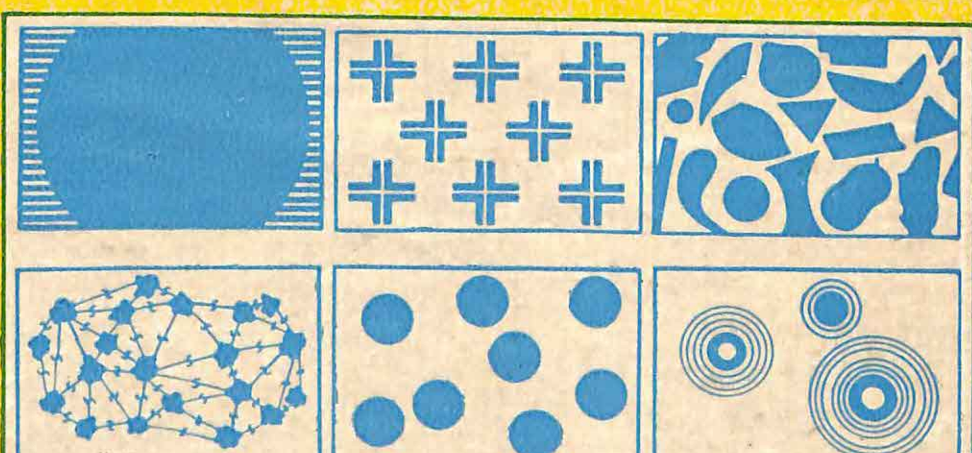
ডঃ শঙ্কর সেনগুপ্ত

পদার্থবিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ





পদার্থবিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ

Science is the century-old endeavour to bring together by means of systematic thought the perceptible phenomena of this world as thorough-going association as possible. To put in boldly it is the attempt at the posterior reconstruction of existence by the process of conceptualization.

—Albert Einstein

পদার্থবিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ

ডঃ শঙ্কর সেনগুপ্ত

বেস্ট বুক্‌স্‌

১এ, কলেজ রো / কলিকাতা-৯

PADARTHAVIJNANER KRAMAVIKASH
By Dr. SANKAR SENGUPTA

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৮২
দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ ঃ ১৯৮৭

প্রকাশক ঃ
বেস্ট বুকস্
১এ, কলেজ রো
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ ঃ স্বপন কুমার দাস

মূল্য ঃ আঠার টাকা (১৮·০০)

মুদ্রক ঃ
কালাচাঁদ ঘোষ
বাণী আর্ট প্রেস
৩৯, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

যাঁদের কাছে প্রথম বাংলা লেখার হাতেখড়ি

সেই পূজনীয় শিক্ষক

শ্রীঅহিভূষণ দাশগুপ্ত

ও

শ্রীজ্যোতিভূষণ চাকী-কে

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

যুগ যুগ ধরে বিজ্ঞানীরা নানা ভাবে প্রকৃতির রহস্য উদ্‌ঘাটনে ব্রতী হয়েছেন। আসল সত্য খুঁজে পেতে তাঁদের চিন্তাভাবনা নদীর ধারা পরিবর্তনের মতন বারে বারে মোড় নিয়েছে। নদী অবশ্য সাগরে বিলীন হয়ে একটা পরিণতি লাভ করে। বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারাটির কিন্তু সেইরকম কিছু নেই—সীমাহীন পথপরিক্রমায় আজও তা সক্রিয়। এই বইটি সেই পথ-পরিক্রমারই কাহিনী।

শঙ্কর সেনগুপ্ত

পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলিকাতা-৩২

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

নবপত্র প্রকাশন কর্তৃক প্রকাশিত 'পদার্থবিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের' প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হওয়ায় বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ বার করা হলো। প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হওয়া এইটাই প্রমাণ করে যে পাঠকরা বইটি গ্রহণ করেছেন। বেস্ট বুকস্-এর প্রকাশনায়, দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থটিতে অনেক পরিবর্তন করা হয়েছে, সংযুক্ত হয়েছে নতুন তথ্য। মুদ্রণ প্রমাদ কমিয়ে এনে ছাপানোর উৎকর্ষতার দিকে নজর দেওয়া হয়েছে। আশা করব বইটি এবারও পাঠকদের সমাদর লাভ করবে।

পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলিকাতা-৩২

শঙ্কর সেনগুপ্ত

Professor S. N. Ghosal Ph D
Khoria Professor of Physics
University of Calcutta

ডঃ শঙ্কর সেনগুপ্তের লেখা 'পদার্থবিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ' বইখানি পড়বার সুযোগ পেয়ে ভালো লাগলো। বইখানি সহজ ভাষায় লেখা। বিজ্ঞানের ছাত্র ছাড়াও যাঁরা বিজ্ঞানের দার্শনিক ভিত্তি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করেন তাঁদের কাছেও এই বইয়ের সমাদর হবে বলে মনে হয়।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের বই সাধারণতঃ পাঠ্যপুস্তক পর্যায়েই সীমাবদ্ধ থাকে। আরও বৃহত্তর ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার প্রভাব সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় লেখা বই-এর সংখ্যা খুবই সামান্য। সেদিক থেকে এই বইখানি একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে মনে করি।

পদার্থ বিজ্ঞানের গোড়ার যুগ থেকে আরম্ভ করে কিভাবে এর অন্তর্নিহিত দার্শনিক ভিত্তির ক্রমবিকাশ হয়েছে, বিশেষ করে বর্তমান শতাব্দীতে বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ এবং কোয়াণ্টাম তত্ত্বের আবির্ভাবের ফলে এই দার্শনিক ভিত্তির যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, সে সম্বন্ধে ডঃ সেনগুপ্ত অতি প্রাঞ্জল এবং মনোজ্ঞ ভাষায় যে আলোচনা করেছেন তা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়।

শ্রীসমরেন্দ্র ঘোষাল

Dr. S. Dutta Majumder D. Sc.
Formerly Prof. of Physics
Indian Institute of Tech.
Kharagpur
Prof. of Mathematics
Viswa-Bharati, Santiniketan.

আমার ছাত্র ডঃ শঙ্কর সেনগুপ্তের লেখা 'পদার্থবিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ' বইখানা পড়ে খুবই আনন্দ পেলাম। বাংলা সাহিত্যে এ'ধরণের একখানা বইয়ের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। বিজ্ঞানকে সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত করার ব্যাপারে তাঁর দক্ষতা অনস্বীকার্য। তিনি পদার্থবিজ্ঞানের গূঢ় তত্ত্বগুলি প্রাঞ্জল এবং চিত্তাকর্ষকভাবে তুলে ধরতে পেরেছেন। বইটির সাফল্য কামনা করি।

সুধাংশু দত্ত মজুমদার

সূচীপত্র

১ সনাতনী পদার্থবিজ্ঞানের মূল কথা

"আমার নিজের মনে হয় যে, আমি শিশুর মতন সমুদ্রের উপকূলে খেলা করছি। মাঝে মাঝে খেলা ছেড়ে সাধারণের চেয়ে একটু বেশী মসৃণ বা বেশী সুন্দর নুড়ি খুঁজে বার করছি। কিন্তু সত্যের বিশাল সমুদ্র আমার সামনে অনাবিষ্কৃত পড়ে আছে।" —নিউটন

গোড়ার কথা

উনবিংশ শতকে পদার্থবিদ্যা বিজ্ঞান হিসাবে সাধারণ মানুষের মনোযোগ খুব বেশি আকর্ষণ করেনি। পদার্থবিদ্যার চর্চা মোটামুটিভাবে জ্ঞানীগুণী লোকেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বিশেষ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানেই কেবলমাত্র পদার্থবিদ্যার সাধনা চলত অতি সাধারণ সব যন্ত্রপাতির সাহায্য নিয়ে। এইসব যন্ত্রপাতির সাধারণত্ব হয়ত আজকে যে-কোনো স্কুলের ছেলের কাছে হাস্যকর মনে হবে। অনেক অর্থ ব্যয় করে জটিল যন্ত্রপাতি তৈরি করার রেওয়াজও ছিল না এবং প্রয়োজনও তেমন হত না। সরল, অনাড়ম্বর ও স্বল্প ব্যয়ে বানানো ছোটোখাটো যন্ত্রের সাহায্যেই বিজ্ঞানীরা বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সন্ধান পেতেন। যেমন যান্ত্রিকশক্তি ও তাপশক্তির মধ্যেকার প্রকৃত সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছেন রামফোর্ড ও জুল। ফ্যারাডের তড়িৎচুম্বকীয় আবেশের সূত্রগুলির উপর দাঁড়িয়ে আছে আজকের দিনের বিদ্যুৎশিল্প। চমকপ্রদ সরলতায় হার্‌ট্‌স্‌ সৃষ্টি করেছেন তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ যার থেকে বেতারের সৃষ্টি। সব কটি আবিষ্কারই যুগান্তর আনল অথচ এই সব কটিই সম্ভব হয়েছিল এমন সব যন্ত্র দিয়ে যাদের মূল্য আজকের নিরিখে অতি সামান্য।

যেখানে আগেকার দিনের বিজ্ঞানীরা কমদামী যন্ত্রের সাহায্যে এই আলোড়ন-সৃষ্টিকারী আবিষ্কার করতে পেরেছেন সেখানে আজকে বিজ্ঞানীদের যে কোনো পরীক্ষানিরীক্ষা এত ব্যয়বহুল কেন? এর কারণ এই নয় যে আগেকার বিজ্ঞানীরা স্বল্প ব্যয়ে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষা চালাতে ও তার থেকে নিত্য নতুন তথ্য বার করতে আজকের দিনের বিজ্ঞানীদের চেয়ে বেশি পারদর্শী ছিলেন। বরং কারণ হিসাবে এটাই বলা যেতে পারে যে তাদের অনুসন্ধান সীমাবদ্ধ ছিল সেইসব বিষয়-গুলোতে যেগুলো মোটামুটিভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। এই কারণেই হয়তো তাদের খুব

সূক্ষ্ম জটিল ও ব্যয়বহুল যন্ত্রের দরকার হত না। ইলেকট্রন, প্রোটন প্রভৃতি প্রাথমিক কণাদের অস্তিত্ব তখনও অজানা। অণুপরমাণুর গঠনরহস্য অজ্ঞানতার অবগুণ্ঠনে ঢাকা। সেই সব প্রাকৃতিক ঘটনাই, সেই সব বস্তুই বিজ্ঞানীদের অনুসন্ধানের বিষয় ছিল যে-সব ঘটনা বা বস্তু চোখে দেখা যেত। একাধিক ভৌতরাশির মধ্যেকার প্রকৃত সম্পর্ক নির্ণয় করার পদ্ধতি খুঁজে বার করাই ছিল তাঁদের মুখ্য প্রয়াস। সেই জন্যেই হয়তো এঁদের অনুসন্ধানের কাজে খুব একটা বড় রকমের কারিগরী কৌশল দরকার হত না।

দৃশ্যমান বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভৌতরাশিদের সম্পর্কে যে-সব সত্য বিজ্ঞানীরা নির্ধারণ করেছেন তাদের আমরা সাধারণভাবে ক্ল্যাসিকাল বা সনাতনী পদার্থবিদ্যা বলে থাকি। মাঝে মাঝে এরকম কথা শোনা যায় যে বিংশ শতাব্দীতে পদার্থ-বিদ্যার নিত্য নতুন আবিষ্কার সনাতনী পদার্থবিদ্যাকে একেবারে নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছে। কথাগুলি কিন্তু সত্য নয়। প্রাথমিক বস্তুকণাদের সম্বন্ধে যে-সমস্ত তথ্যের সন্ধান মিলেছে, সনাতনী পদার্থ-বিদ্যার আলোকে তাদের ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয় ঠিকই, কিন্তু যে-সমস্ত ঘটনা বা বস্তু আমরা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভব করতে পারি তাদের সঙ্গে সম্পর্কিত সনাতনী পদার্থবিদ্যার সব তথ্য আজও অপরিবর্তিত, অলঙ্ঘনীয়।

সুতরাং বলা যেতে পারে যে বিংশ শতাব্দীতে পদার্থ বিজ্ঞানের গবেষকরা এমন একটা ভিন্ন জগৎ সম্বন্ধে অনুসন্ধানে ব্রতী হলেন যে-জগৎটি দৃশ্যমান সবকিছুর পিছনে এক অদৃশ্য প্রেক্ষাপট রচনা করে চলেছে।

এই অদৃশ্য জগতেই আত্মগোপন করে আছে অণু পরমাণু, বহু অতীন্দ্রিয়, অজানা তথ্যের উৎস হয়ে। দৃশ্যমান জগতের বাইরে বস্তুকণাদের অস্তিত্বের কথা প্রথম বলেন প্রাচীন দার্শনিক ডেমোক্রিটাস। তিনিই তাদের নাম দেন অ্যাটম বা পরমাণু, অর্থাৎ যাদের আর ভাঙা যায় না। ভারতের কণাদও অবশ্য পরমাণুর কথা বলেছিলেন। ডেমোক্রিটাসের দেওয়া অ্যাটম শব্দটি আজও বজায় থাকলেও আসলে অ্যাটম একটিমাত্র বস্তু কণা নয়, ইলেকট্রন ও নিউক্লিয়াসের সমন্বয়ে গঠিত। অ্যাটম কোনো বস্তুর ক্ষুদ্রতম অংশ যা রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। ইলেকট্রন এবং নিউক্লিয়াসের মধ্যে যে প্রাথমিক বস্তুকণাগুলো আছে তাদের আর ভাঙা চলে না। সুতরাং ডেমোক্রিটাসের চিন্তাধারার সঙ্গে সংগতি রেখে এই প্রাথমিক বস্তুকণাদেরই প্রকৃতপক্ষে অ্যাটম বলা যেতে পারে। এই প্রাথমিক বস্তুকণাদের যে নিজস্ব জগৎ সেখানে লুকানো আছে বহু অজানা তথ্য ও প্রচণ্ড শক্তির বিরাট উৎস। প্রাথমিক কণাদের সম্বন্ধে এই সব অজ্ঞাত তথ্যের অনুসন্ধান, তাদের মধ্যেকার লুকিয়ে থাকা শক্তির উৎস সন্ধান ও সেই শক্তির

ব্যবহারিক প্রয়োগ—এই বিষয়গুলিই বিশ্বের সমস্ত বিজ্ঞানীদের আজ আকৃষ্ট করছে। যেখানে অনুসন্ধানের বিষয়গুলো দৃশ্যমান নয় বিজ্ঞানীকে সেখানে কল্পনাশক্তির উপর নির্ভর করে এগিয়ে যেতে হয়। কল্পনাকে বাস্তবে যাচাই করার জন্যে দরকার হয় প্রচুর ব্যয়ে নির্মিত সূক্ষ্ম ও জটিল যন্ত্রপাতির।

প্রাথমিক কণাদের এই যে অদৃশ্য জগৎ তা কোন্ নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হয়—এই প্রশ্নই আজ সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। দৃশ্যমান বস্তুরা যে সব নিয়ম বা সত্য মেনে চলে, প্রাথমিক কণাদের ক্ষেত্রে সেসব নিয়ম পরিবর্তিত হয় কিনা বা পরিবর্তিত হলে তাদের রূপ কী হয় এ ধরণের অনেক প্রশ্ন মনকে আন্দোলিত করে। বহুদিন পর্যন্ত এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় নি। এত দেরি হওয়ার কারণ সনাতনী পদার্থবিদ্যার উপর বিজ্ঞানীদের অসীম আস্থা। বহু অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে যাচাই করা সনাতনী পদার্থবিজ্ঞান। দৃশ্যমান সমস্ত প্রাকৃতিক ঘটনাকে সে ব্যাখ্যা করতে পেরেছে নির্দিষ্ট সত্যের আলোকে। তাই বুঝি বিজ্ঞানীরা অগাধ বিশ্বাসে সনাতনী পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মগুলো কাজে লাগিয়ে প্রাথমিক কণাদের স্বরূপ ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। এতে তাঁরা বারে বারে ব্যর্থ হয়েছেন ঠিকই কিন্তু পুরনো বিশ্বাস ছাড়তে পারেন নি। তাই প্রথম যখন নতুন কোয়াণ্টাম-মতবাদের কথা কয়েকজন বিজ্ঞানী ঘোষণা করলেন তখন তাঁদের অনেক বিরূপ মন্তব্য শুনতে হল। তারা বহু বাধার মুখোমুখি হলেন। কোয়াণ্টাম-মতবাদ শেষ পর্যন্ত স্বীকৃতি পেল ঠিকই কিন্তু শুরুতে সে স্বীকৃতি পুরোপুরি স্বতঃস্ফূর্ত হল না।

সনাতনী পদার্থবিদ্যা প্রাথমিক কণাদের ক্ষেত্রে কেন প্রযোজ্য হল না তার কারণ অবশ্য এখন অনেকটা বোঝা গিয়েছে। প্রাথমিক কণাদের যে জগৎ সেটা দৃশ্যমান বস্তুজগতের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ মাত্র—এই ধারণাটাই ভ্রান্ত ছিল। বস্তুতঃ দুটি জগৎ একেবারে আলাদা। ইলেকট্রন, প্রোটন, মেসন প্রভৃতি কণারা যদি শুধুমাত্র আয়তনেই দৃশ্যমান অন্যান্য বস্তু থেকে আলাদা হত তবে তাদের জন্য পৃথক নিয়মের অস্তিত্ব থাকত না। আয়তনই নয়, অখণ্ডতাই প্রাথমিক কণাদের অন্যান্য বস্তু থেকে পৃথক সত্তা আরোপ করেছে।

প্রাথমিক কণাদের অখণ্ডতার প্রকৃত স্বরূপটি বোঝা দরকার। অখণ্ডতা বলতে কেবলমাত্র এইটাই বোঝায় না যে তাদের আর ভেঙে ফেলা যাবে না। ব্যাপক অর্থে অখণ্ডতা বলতে বোঝায় যে এরা একলাই যার যার সমগ্রতা রক্ষা করে, এদের মধ্যে পৃথক কোনো অংশ নেই। যেহেতু ইলেকট্রন ও নিউক্লিয়াস এই দুইটি পৃথক অংশ দিয়ে পরমাণু তৈরি সেজন্য পরমাণুকে আর অখণ্ড বলা যাবে না। শুধু পরমাণুই নয় এই ধরণের সামগ্রিকতা কিন্তু দৃশ্যমান কোনো

বস্তুতেই দেখতে পাওয়া যায় না। দৃশ্যমান সব বস্তুই কোনো না কোনো ভাবে বিভিন্ন অংশবিশেষ দিয়ে তৈরি। কোনো একটি অংশের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যে কোনো বস্তুতে আকৃতিগত বা প্রকৃতিগত পরিবর্তন আসতে পারে। অপরপক্ষে প্রাথমিক কণাদের কিন্তু কোনো পরিবর্তন নেই এবং সেই কারণেই দৃশ্যমান সকল বস্তু থেকে আলাদা ধর্ম অনুসরণ করে।

পরমাণুবাদে যে-কোনো বস্তুকে বিচ্ছিন্ন কতকগুলি সম বা ভিন্ন জাতীয় পারমাণবিক কণার সমষ্টি হিসাবে কল্পনা করা হয়েছে। আধুনিক কোয়াণ্টাম-মতবাদে এই বিচ্ছিন্নতার ধারণাকেই আরো ব্যাপক ও পরিবর্ধিত ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। কোয়াণ্টাম মতবাদ যদিও এখনও পর্যন্ত সম্পূর্ণতা লাভ করে নি তবুও একথা নিশ্চিতভাবে বলা চলে যে কোয়াণ্টাম মতবাদের মূল বক্তব্য আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। এটা অবশ্য সত্য যে, কোয়াণ্টাম মতবাদ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ বিমূর্ত (Abstract) হয়ে উঠছে। যার ফলে এই তত্ত্ব উপলব্ধি করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেখা যাচ্ছে কণা-জগতের নানান ঘটনাকে কোনো ছবির সাহায্যে আর কল্পনা করা যাচ্ছে না। এর কারণ হল, যে-পরিচিত ধারণার আলোকে আমরা ভাবতে অভ্যস্ত সেই-সব ধারণাই প্রাথমিক কণাদের বেলায় আর প্রযোজ্য নয়। আধুনিক পদার্থবিদ্যা চিন্তা করার পদ্ধতিটিকে আমূল পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছে। বাধ্য হয়েছে এমন সব ধারণা প্রবর্তন করতে যেসব ধারণাকে ছবি এঁকে রূপ দেওয়া যায় না কেবলমাত্র গাণিতিক পরিভাষায় তাদের বর্ণনা করা সম্ভব।

আজকের পদার্থ বিজ্ঞান আর আগের মতো কল্পনার সাহায্যে বোঝা যায় না। এই কারণেই হয়ত তা বোধহয় ক্রমশঃ দুর্বোধ্য হয়ে উঠছে। এর থেকে কিন্তু আমরা এই ধারণা করব না যে আধুনিক পদার্থবিদ্‌রা সহজ করে কোনো জিনিস সাধারণের কাছে তুলে ধরতে অপারগ। বরঞ্চ বলা যেতে পারে যে বিজ্ঞানীরা এমন একটি বিচিত্র জগতের সম্মুখীন হয়েছেন যেখানে কিছুই আর নিছক কল্পনার সাহায্যে উপলব্ধি করা যাবে না। এখানে আধুনিক চিত্রশিল্পের সঙ্গে আধুনিক পদার্থবিদ্যাকে তুলনা করা যেতে পারে। আজকের চিত্রশিল্পের মতোই আজকের পদার্থবিদ্যার বিশ্লেষণ পদ্ধতি বস্তুনিষ্ঠ না হয়ে ক্রমশঃ ভাবনিষ্ঠ হয়ে উঠছে। তফাৎ হল এই যে এক জায়গায় ভাবপ্রকাশের জন্যে ব্যবহার করা হচ্ছে বিচিত্র রঙের সমারোহ, আরেক জায়গায় ভাবপ্রকাশের একমাত্র হাতিয়ার হল গণিত।

আগের সবকটি কথা থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে পদার্থবিজ্ঞান শুরু থেকে আজ পর্যন্ত কেবলমাত্র যে জ্ঞানের সীমাই বাড়িয়েছে তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে সে এক

অনাবিষ্কৃত জগতের দ্বার খুলে দিয়েছে। সেই জগতের সবকিছু বুঝতে হলে পুরানো চিন্তাধারা ছেড়ে দিয়ে একেবারে নতুনভাবে ভাবতে হবে। যেহেতু এই নব চিন্তাধারার মূল অবলম্বন গণিত সেজন্যে সাধারণ ভাষায় এই ভাবধারাকে বোঝানো খুবই দুরূহ কাজ। তবুও যতদূর সম্ভব চেষ্টা করতে হবে যাতে এই নতুন সাংকেতিক ভাবধারাকে অন্ততঃ কিছু পরিমাণে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়। স্বাভাবিকভাবে একাজের অনেক অসুবিধা। তবুও আশা করব পরের পাতাগুলো সনাতনী পদার্থবিদ্যা থেকে আধুনিক পদার্থবিদ্যার ক্রমবিকাশের একটি বিশ্বস্ত ছবি তুলে ধরতে পারবে। আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানের বিমূর্ত চিন্তাধারাকে সাধারণের কাছে যতটা সম্ভব প্রাঞ্জল করে পৌঁছে দিতে সক্ষম হবে যাতে মানুষ প্রকৃতির মধ্যে যে বিচিত্র রহস্য আত্মগোপন করে আছে তার কিছুটা অন্ততঃ জানতে পারে।

প্রকৃতি, প্রয়োজনীয়তা ও উদ্দেশ্য

পদার্থ বিজ্ঞান পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান। প্রকৃতির সম্বন্ধে কিছু জানতে বিজ্ঞানীকে কোনো-না-কোনো পরীক্ষা করতে হবে। নিছক কল্পনা করে কিছুই সঠিকভাবে বলা যাবে না। বিদ্যুৎপ্রবাহের সামনে একটি চুম্বক আনলে তার ফল কী হবে, তা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মেধাসম্পন্ন লোকও শুধু ভেবে কিছু বলতে পারবেন না। এ সম্বন্ধে সদুত্তর পেতে গেলে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। প্রকৃতিতে যেসব ঘটনা নিত্য ঘটছে, তারা যদি অকারণে হঠাৎ হঠাৎ ঘটত, তবে যত পরীক্ষাই করা হোক না কেন তাতে কোনো লাভ হত না। একই পরীক্ষার ফল ভিন্ন ভিন্ন হত। অভিজ্ঞতা কথাটি তখন সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে যেত। যে ঘটনা বারে বারেই রূপ পাল্টায়, তার সম্বন্ধে কী আর অভিজ্ঞতা হতে পারে? পদার্থবিদ্যা বিজ্ঞান হিসাবে গড়ে উঠতে পারে যদি প্রাকৃতিক ঘটনাগুলো সুশৃঙ্খল ও নিয়মমাফিক হয় এবং এই সব নিয়মের প্রকৃতি থেকে ভবিষ্যতে কী ঘটবে তা আগে থেকেই বলা সম্ভব হয়। বলা যেতে পারে যে বিজ্ঞানের পথ চলা শুরু হয়েছে সেদিন, যেদিন মানুষের চোখে ধরা পড়েছে প্রাকৃতিক নিয়মশৃঙ্খলা, আর মনে হয়েছে সৃষ্টিকর্তা প্রাকৃতিক ঘটনাগুলো খামখেয়ালী না করে এক সুনিয়ন্ত্রিত নিয়মের শৃঙ্খলে বেঁধে রেখেছেন।

খৃষ্টজন্মের পাঁচশত বছর আগে গ্রীক্ দার্শনিক ডেমোক্রিটাস প্রকৃতির মধ্যে যে চমৎকার শৃঙ্খলা আছে তা প্রথম লক্ষ্য করেন। তাঁর মনে হয়েছিল এই পৃথিবীতে কোনো কিছুই হঠাৎ ঘটে না। সব ঘটনার পিছনে কোনো-না-কোনো

প্রয়োজনীয়তা আছে। সব প্রাকৃতিক ঘটনাই সুনিশ্চিত ও সুনির্দিষ্ট—এই ধারণাই সনাতনী পদার্থবিজ্ঞানের অন্যতম মূলমন্ত্র। এই শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পদার্থ বিজ্ঞানের বিরাট অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু সনাতনী পদার্থবিদ্যার এই মূল চিন্তাধারার পরিবর্তন দরকার হয়ে পড়ল। অবশ্য একথাও ঠিক যে ডেমোক্রিটাসের মত কিন্তু তাঁর আমলেও সবাই মেনে নেয় নি। স্বয়ং এ্যারিস্টটল তাঁর বিরোধী ছিলেন। এ্যারিস্টটলের মতে, যে-কোনো ঘটনার পিছনে একটি প্রাথমিক কারণ বা উদ্দেশ্য আছে এবং ডেমোক্রিটাস এই অতি প্রয়োজনীয় কথাটি একেবারে এড়িয়ে গেছেন। এ্যারিস্টটলের কাছে মনে হয়েছে সব ঘটনার পেছনে এই কারণেরই অস্তিত্বই বড়ো কথা। কারণের মধ্যে দিয়েই প্রাকৃতিক ঘটনাগুলো প্রকৃত অর্থবহ হয়ে ওঠে।

এইভাবে প্রাকৃতিক ঘটনা সম্বন্ধে দুটি বিরুদ্ধ মতবাদের সৃষ্টি হল। একটির প্রবক্তা হলেন ডেমোক্রিটাস। তাঁর মতে যে কোনো প্রাকৃতিক ঘটনাকে সুনিশ্চিত ভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব। অপরটি হল পরমকারণবাদ। এর উদ্গাতা হলেন স্বয়ং এ্যারিস্টটল। এই মতবাদে প্রকৃতির মধ্যে সুষ্ঠু পরিকল্পনা বা উদ্দেশ্য খুঁজে পাবার চেষ্টা করা হয়েছে। কোন্ মতবাদ সত্য, কোন্ মতবাদ ভ্রান্ত সেটা কখনই সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে পদার্থবিজ্ঞানে দ্বিতীয় মত থেকে, প্রথম মতবাদই বেশী কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছে। কারণ পদার্থবিজ্ঞানের আসল উদ্দেশ্য কী তা নিয়ে যতই তর্ক করা হোক না কেন পদার্থবিদ্যার প্রয়াস তখনই সার্থক হবে যখন এর সাহায্যে ভবিষ্যৎ ঘটনার সম্বন্ধে আলোকপাত করা যাবে।

সহজ ভাষায় বলতে গেলে আমরা একজন পদার্থবিদের কাছে প্রত্যাশা করব যে তিনি তাঁর অধীত জ্ঞানের সাহায্যে কোন পরীক্ষায় কী ফল লাভ হবে সেটা আগে থেকেই আন্দাজ করতে পারবেন। অবশ্য তাঁর পক্ষে একাজ তখনই সম্ভব হবে যখন প্রকৃতির মধ্যে বর্তমানের সঙ্গে ভবিষ্যৎকে যুক্ত করার উপযুক্ত নিয়মের অস্তিত্ব থাকবে। এর অর্থ হল ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষেত্রে পদার্থবিদ্যা অধিযন্ত্রবাদকেই (Mechanistic theory) মোটামুটিভাবে অনুসরণ করে এর কারণ হলো ভবিষ্যতে যে ঘটনা ঘটবে তার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পদার্থবিদ্যা বিশেষ চিন্তিত নয়। বর্তমান থেকে সঠিকভাবে ভবিষ্যৎকে জানাই এর মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। কোনো একটি ঘটনা ঘটলে তা মানব সভ্যতার পক্ষে ভালো হবে কি খারাপ হবে এই নিয়ে তার কোন দুর্ভাবনাই নেই।

এ্যারিস্টটল যতদিন বেঁচে ছিলেন পরমকারণবাদ প্রাধান্য লাভ করেছিল ফলে ততদিন কোনো কার্যকরী পদার্থবিদ্যা গড়ে ওঠে নি।

সুনিশ্চিত নির্ধারণ বনাম পারিসাংখ্যিক নির্ধারণ

পরমকারণবাদ সমস্ত ঘটনার পিছনে কি কারণ আছে তা জানতে চায়। এই মতবাদের উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যত সম্বন্ধে কিছু বলা যায় না। এইজন্যে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে পদার্থবিদ্যার আধিযান্ত্রিক (Mechanistic) চরিত্রটাই পদার্থ বিজ্ঞানে বিশেষ ফলপ্রসূ। একথা যে পুরোটাই সত্য তা অবশ্য বলা যায় না। সনাতনী পদার্থবিজ্ঞান থেকে কোয়াণ্টাম পদার্থবিদ্যার উত্তরণের সব কটি ধাপ বুঝতে যাওয়ার চেষ্টা আমাদের তৃতীয় একটি সম্ভাবনার সঙ্গে মুখোমুখি করে দেয়। বেশ কয়েকটা ঘটনা চোখে পড়ে যেক্ষেত্রে আধিযন্ত্রবাদ আর আগের মত কার্যকরী থাকে না।

আগেই বলা হয়েছে যে কার্যকরী বিজ্ঞান আমরা তাকেই বলব যার সাহায্যে ভবিষ্যতকে জানা যাবে। কোয়াণ্টাম বলবিদ্যাও কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানের এই মূল সূরটাকে অস্বীকার করে না। কোনো কিছুর ভবিষ্যদ্বাণী তখনই করা যাবে যখন বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করছে এমন কোনো নিয়মের অস্তিত্ব থাকবে। ডেমোক্রিটাসের মতে সকল ঘটনাই এক বা একাধিক নিয়ম মেনে চলে।

সুতরাং নিয়মের সঙ্গে সংগতি রেখে প্রাকৃতিক ঘটনাগুলো একের পর এক ঘটে যাবে। তাঁর বিশ্বাস ছিল একই পারিপার্শ্বিক অবস্থা বজায় থাকলে বর্তমানে যে ঘটনা ঘটছে, ভবিষ্যতেও তারই পুনরাবৃত্তি হবে।

উদাহরণ স্বরূপ এমন একটি বস্তুর কথা ধরা যাক যার উপরে পারিপার্শ্বিকের কোনো প্রভাব নেই। এই বস্তুটিকে নিয়ে অনেকবার পরীক্ষা করা হল। পরীক্ষা করার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে প্রতিবার পরীক্ষা আরম্ভ করার আগে বস্তুটি একই প্রারম্ভিক অবস্থায় ফিরে আসে। সুনির্দিষ্টভাবে সবকিছু নির্ধারণ করা সম্ভব—ডেমোক্রিটাসের এই মত যদি সত্য হয় তবে প্রতিবার পরীক্ষাতে বস্তুটির অবস্থার রূপান্তর সময়ের সঙ্গে একইভাবে ঘটবে। এইভাবে নিয়মমাফিক যদি কোনো অবস্থা পরিবর্তিত হয় তবে কোনো একটি অবস্থা থেকে পরে কী দাঁড়াবে সেটা বলা অসম্ভব হবে না।

কিন্তু এবার একটি অন্য সম্ভাবনার কথা ভাবা যাক। ওপরের পরীক্ষায় যদি এরকম ফল পাওয়া যায় যে, বস্তুটিকে প্রতিবার একই প্রারম্ভিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা সত্ত্বেও পরীক্ষালব্ধ ফল প্রত্যেকবার ভিন্ন হচ্ছে, তাহলে বুঝতে হবে যে সুনিশ্চিত নির্ধারণ তত্ত্ব সেখানে কার্যকরী হচ্ছে না। তবুও এই আপাত-বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যেও নতুন ধরণের একটি শৃঙ্খলার সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। অনেকবার পরীক্ষা করার পর পরীক্ষালব্ধ ভিন্ন ভিন্ন ফলগুলি নিয়ে যদি একটি

পারিসংখ্যিক (Statistical) অনুসন্ধান করা হয়, তাহলে দেখা যাবে যে এদের মধ্যে বিশেষ একটি বা দুটি ফল বেশির ভাগ সময়ই পাওয়া যাচ্ছে। এর থেকে কোনো একটি নির্দিষ্ট নিয়ম না পাওয়া গেলেও মোটামুটিভাবে পরীক্ষার ফল আন্দাজ করা যাবে।

যদি এমন কতকগুলি অনুসন্ধান কার্য চালানো হয় যাতে প্রতিটি ক্ষেত্রে বহুসংখ্যক পরীক্ষা করতে হবে, সেক্ষেত্রে পরীক্ষালব্ধ ফলগুলি বিশ্লেষণের জন্যে পরিসংখ্যানের আশ্রয় নিতে হবে। এই পরিসংখ্যানের চরিত্র যদি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে একই রকম হয় তাহলে বুঝতে হবে সেখানে নির্দিষ্ট এক পারিসাংখ্যিক শৃঙ্খলা কাজ করে চলেছে। শৃঙ্খলার স্বরূপটি ধরতে পারলে, তার উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করা অসম্ভব নয়। আর যদি দেখা যায় একই অনুসন্ধানের ফলগুলির পরিসংখ্যান প্রতিবারেই পৃথক হচ্ছে তবে ধরে নিতে হবে প্রকৃতিতে চরম বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে।

সব সময় কোনো ঘটনা প্রারম্ভিক অবস্থা বার বার একই থাকলেও তা পূর্ব-নির্ধারিত পথ অনুসরণ নাও করতে পারে। সেই কারণে সমস্ত প্রাকৃতিক ঘটনা-গুলিকে পরিসংখ্যানের আওতায় এনে বিচার করাই ভালো। তাই যদি করতে হয় তবে, একটি পরীক্ষার ফলাফল সম্বন্ধে সুনিশ্চিত কোনো মতামত না প্রকাশ করে তার সম্ভাব্য ফল কী হতে পারে সেটা বলাই যুক্তিযুক্ত। যদি এই পরীক্ষালব্ধ ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে কোনো একটি বা দুটি ফলাফল গড়ে বেশি বার পাওয়া যাচ্ছে, তখন সেই ফলের উপর নির্ভর করে ঐ পরীক্ষা সম্বন্ধে একটি নিয়ম খাড়া করা যাবে। এই নিয়মটিকে পরে আবার যাচাই করে নেওয়া যাবে।

'শুরুর অবস্থা একই থাকলে প্রকৃতিতে যে কোনো ঘটনার অবস্থান্তর বারে বারে একই পথ অনুসরণ করবে'—এই সিদ্ধান্তের জায়গায় একটি আরও ব্যাপক নিয়ম স্থান অধিকার করল। সুনিশ্চিত শৃঙ্খলার (Strict Determinism) জায়গায় এল পারিসাংখ্যিক (Statistical) শৃঙ্খলা। যে-কোনো ঘটনা তার প্রাথমিক অবস্থা থেকে নানা পথে অপর একটি নির্দিষ্ট অবস্থায় আসতে পারে। আপাতদৃষ্টিতে সন্ধান না পাওয়া গেলেও পরিসংখ্যানের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এর মধ্যেও এক বা একাধিক সুনির্দিষ্ট পথের সন্ধান পাওয়া যাবে। তখনই বলা সম্ভব হবে যে এই ঘটনার রূপান্তর কোন্ নিয়মে ঘটেছে।

কতগুলি জায়গায় কিছু নির্ধারণের ব্যাপারটা সুনিশ্চিতভাবে করা সম্ভব হলেও কোনো কোনো সময় তা পারিসাংখ্যিক হয়ে যেতে পারে। সেই হিসাবে বলতে পারা যায় শৃঙ্খলারও দুটো স্বরূপ আছে। একটি হল সুনিশ্চিত শৃঙ্খলা অপরটি হলো পারিসাংখ্যিক শৃঙ্খলা। প্রকৃতিতে কোন ধরণের শৃঙ্খলা বজায়

থাকছে তা অবশ্য পরীক্ষা করে জানতে হবে। যে কোনো একটি ধারণার উপর নির্ভর করে পরীক্ষাপদ্ধতি ঠিক করতে হবে এবং পরীক্ষালব্ধ ফল থেকে অনুমানের যৌক্তিকতা খুঁজে নিতে হবে।

ডেমোক্রিটাস তাঁর দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকে ধরে নিয়েছিলেন যে পারিপার্শ্বিক অবস্থা এক থাকলে দৃশ্যমান সবকিছুর রূপান্তর সব সময়ে সুনির্দিষ্ট নিয়মে হবে। কোনো জিনিসই পৃথিবীতে হঠাৎ করে হওয়া সম্ভব নয়। তাঁর হাতে কোনো যন্ত্র না থাকায় তিনি তাঁর উপলব্ধিকে পরীক্ষার আলোকে যাচাই করতে পারেন নি। তাঁর হাজার বছর পরে গ্যালিলিও প্রথম পরীক্ষা করে দেখালেন নিচের দিকে পড়ন্ত কোনো বস্তু বা দোলকের (Pendulum) ক্ষেত্রে ডেমোক্রিটাসের ধারণা সত্য ও অভ্রান্ত। এই পরীক্ষায় সকল বস্তুই ছিল এমন আয়তনের যাদের সম্বন্ধে সব তথ্যই সনাতনী পদার্থ বিজ্ঞানের সাহায্যে পাওয়া সম্ভব।

এর ফলে সুনিশ্চিত ভাবে নির্ধারণের ব্যাপারটা স্বতঃপ্রতীয়মান নিয়ম হিসেবে স্বীকৃত হয়ে গেল। এই স্বীকৃতি বজায় রইল ততক্ষণ, যতক্ষণ পর্যন্ত না পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণিত হল সুনিশ্চিত ভাবে নির্ধারণের ব্যাপারটা দৃশ্যমান জগতে বজায় থাকলেও অণুপরমাণুদের মতো সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কণাদের বেলায় প্রযোজ্য নয়। এই চমকপ্রদ উপলব্ধিই কোয়াণ্টাম বলবিদ্যার আবির্ভাব সূচিত করল। অবশ্য এ প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো যে কোয়াণ্টাম বলবিদ্যার সাফল্য সত্ত্বেও কিছু কিছু চিন্তাবিদ্ ও পদার্থ বিজ্ঞানী এই মতবাদ সম্বন্ধে এখনও বিরুদ্ধ মত পোষণ করেন। বহু শতাব্দী ধরে যে মতবাদ সমর্থন লাভ করে এসেছে হঠাৎ একদিনে তাকে ত্যাগ করা যে-কোনো লোকের পক্ষেই কষ্টকর। প্রাকৃতিক ঘটনাসমূহে নিশ্চিতভাবে নির্ধারণের ব্যাপারটি প্রাথমিক কণাদের বেলায় কার্যকরী হয় না। যাঁরা এই নতুন মতবাদের স্রষ্টা তাঁরা সবাই অবাস্তব কথা বলছেন এটা ভাবাও ঠিক নয়।

পরমাণুবাদ

বস্তুতে পরমাণুর উপস্থিতির কথা ভাবা ডেমোক্রিটাসের কল্পনাশক্তির পরিচয় দেয়। পরমাণু আর শূন্যতা ছাড়া আর কোনো কিছুই নেই—এই কথাটির মধ্যে দিয়ে তিনি আপাত-অবিচ্ছিন্ন বস্তুগুলির মধ্যে বিচ্ছিন্ন অসংখ্য ক্ষুদ্রতম বস্তুকণার অস্তিত্ব কল্পনা করেছিলেন। তাঁর মতে যে-কোনো ভৌত রাশির পরিবর্তন এই সূক্ষ্ম কণাদের উপর নির্ভরশীল।

কোনো অভিজ্ঞতা থেকে কিন্তু ডেমোক্রিটাসের এই ধারণা হয়নি। সত্যি কথা বলতে যে বিজ্ঞানশাস্ত্রে পরমাণুবাদ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে সেই রসায়নশাস্ত্রই ডেমোক্রিটাস জানতেন না। তাঁর ধারণা নিতান্তই কল্পনা-নির্ভর। সেই সময়কার

আর-সব চিন্তাবিদ্‌দের মতন তিনিও দৃশ্যমান সকল ঘটনাকে বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলেন। খুঁজে পেতে চেয়েছিলেন প্রকৃতির লীলারহস্যের আসল চাবিকাঠিটি। তাঁর মনে হয়েছিল যে, পরমাণুর অস্তিত্ব ধরে নিলে প্রকৃতিতে সব ঘটনা ব্যাখ্যা করতে সুবিধা হবে আর প্রাকৃতিক যে-কোনো ঘটনা পরমাণুদের সংযুক্তি বা বিযুক্তি হিসাবে দেখানো যাবে। পরমাণুদের তিনি আয়তন আরোপ করলেন, যদিও সে আয়তন এমনই যে তাদের চোখে দেখা যায় না। তাঁর মতে, পরমাণুর সর্বপ্রধান ধর্ম তাদের মৌলিকতা। ডেমোক্রিটাসের এই ধারণা পরমাণুর মধ্যেকার গঠনপ্রণালীর অস্তিত্ব বাতিল করে দেয়। কারণ অন্যকিছুর সংযোজনে যদি পরমাণু গঠিত হয় তবে সে আর মৌলিক থাকতে পারে না।

মৌলিক কণা

মৌলিক কণা আমরা তাদেরই বলব, যারা অবিভাজ্য। ডেমোক্রিটাস কল্পিত পরমাণু থেকে তাদের তফাৎ হল এই যে তাদের অস্তিত্ব চিরন্তন নয়। একটি মৌলিক কণা বিভিন্ন কণায় রূপান্তরিত হয়ে যেতে পারে, অথবা দুটি মৌলিক কণা একত্রিত হয়ে একটি আলোকরশ্মিতে পরিণত হয়ে যেতে পারে। উদাহরণ: একটি নিউট্রন কণা একটি প্রোটন, একটি ইলেকট্রন ও একটি নিউট্রিনোতে রূপান্তরিত হতে পারে। আবার একটি ইলেকট্রন ও পজিট্রন মিলে সৃষ্টি হয় একটি ফোটনের বা একটি আলোক কণার। একটি মৌলিক কণা সম্বন্ধে বর্তমান চিন্তাধারা ও ডেমোক্রিটাসের চিন্তাধারার মধ্যে যে তফাৎ তাতে অবশ্য মৌলিক কণাদের এই পরিচয়ের বিশেষ কোনো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেই। ডেমোক্রিটাস পরমাণুর কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের সকল শাখাতেই বিরোধিতার ঝড় উঠেছিল। প্রতিক্রিয়া এতই তীব্র হয়েছিল যে মৌলিক কণা খুঁজে পাবার চেষ্টা করাই মানুষ কিছু দিনের জন্যে ছেড়ে দিয়েছিল। পরমাণু সম্বন্ধে এ ধরনের উদাসীনতার জন্যে এ্যারিস্টটল কিছুটা দায়ী। সম্ভবতঃ তাঁর মতবাদের সঙ্গে পরমাণুর অস্তিত্ব খাপ খায় নি বলেই তিনি এর বিরোধিতা করেছিলেন। এছাড়াও আরেকটি কারণ আছে। ডেমোক্রিটাস বর্ণিত পরমাণুবাদে কিছু অসংগতি ছিল। তিনি বলেছিলেন পরমাণুদের আয়তন আছে এবং তারা অবিভাজ্য—যা কখনই একসঙ্গে সম্ভব হতে পারে না। কারণ আয়তনসম্পন্ন যে কোনো বস্তুকে কতকগুলি ক্ষুদ্র অংশে ভাঙা যেতে পারে। ডেমোক্রিটাসের মতবাদের এই অসংগতি এ্যারিস্টটলের মতো মেধাসম্পন্ন দার্শনিক সহজেই ধরে ফেলেছিলেন এবং তিনি এই অসংগতিকেই পরমাণু তত্ত্বের বিরোধিতার কাজে লাগিয়েছিলেন।

একই ধরণের আপাত-অসংগত ঘটনা আজকের দিনের মৌলিক কণাদের মধ্যেও

দেখা যাচ্ছে। তাত্ত্বিক গবেষণায় দেখা গেছে যে একটি মৌলিক কণার ভর একটি বিশেষ দৈর্ঘ্যের সঙ্গে ব্যস্তানুপাতে (Inversely propotonal) পরিবর্তিত হয়। এই দৈর্ঘ্যটি কণাদের আয়তন ও আকৃতির উপর নির্ভরশীল। যদি কোনো মৌলিক কণাকে একটি বিন্দু হিসাবে চিন্তা করা যায় তাহলে এই নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যটি শূন্যমানের হবে এবং ফলে ভরের পরিমাণও অসীম হয়ে যাবে যা একেবারেই অসম্ভব।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে বিস্তৃতি আর অবিভাজ্যতা—এই দুটি ধর্ম এক্ষেত্রে পরস্পর-বিরোধী থাকছে। এটিকে ভালো করে বোঝার দরকার আছে।

আজকের মৌলিক কণা

১৯৪৭ সালের পর থেকে প্রায় তিনশটির মতন নতুন ধরণের কণা আবিষ্কৃত হয়েছে। মহাজাগতিক রশ্মির গবেষণা চালিয়ে এই সব নতুন কণার সন্ধান পাওয়া যায়। অবশ্য ত্বরণ যন্ত্রের সাহায্যে পাওয়া বিভিন্ন কণাদের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটিয়েও এই সব নতুন কণা পাওয়া যায়।

প্রত্যেক কণার একটি প্রতীপকণা (Antiparticle) আছে। এই সব কণা ও প্রতীপ কণাদের ভর এক কিন্তু তড়িতাধান বিপরীত। উদাহরণ স্বরূপ ইলেকট্রনের প্রতীপ কণা হলো পজিট্রন। পজিট্রনের ভর ইলেকট্রন ভরের সমান কিন্তু তড়িতাধান ধনাত্মক। যখন কোন কণার সংগে তার প্রতীপ কণার সংঘর্ষ ঘটে তখন তারা পরস্পরকে ধ্বংস করে ফেলে। যখন এরকম ঘটে তখন একটি গামারশ্মি বেড়িয়ে আসে। কিছু কিছু কণার স্থিতি ভর আছে। গতিশীল অবস্থায় কণাদের ভর বাড়তে থাকে। কণাদের ঋণাত্মক কিংবা ধনাত্মক তড়িতাধান থাকে আবার নিস্তড়িতও হতে পারে। এইসব কণাদের কারুর স্পিন কৌণিক ভরবেগ আছে কারুর বা নেই। এইসব কণাদের তিনভাগে ভাগ করা যায়।

(ক) ব্যারিয়ন ঃ ব্যারিয়ন বলতে বোঝায় প্রোটন নিউট্রন ল্যামডা, সিগমা, কাই ও মেগাকণা। প্রোটন হলো সুস্থিত কণা যার অর্থ হলো প্রোটন অন্য কোন কণাতে ভেঙ্গে যায় না। কেন্দ্রীণের মধ্যে থাকলে নিউট্রন সুস্থিত। কেন্দ্রীনের বাইরে নিউট্রন প্রোটন, ইলেকট্রন ও একটি এ্যান্টি নিউট্রিনোতে ভেঙ্গে যায়। এ্যান্টি নিউট্রিনো হলো নিউট্রিনোর প্রতীপ কণা। নিউট্রনের অর্দ্ধজীবন হলো বার মিনিট। অন্যান্য ব্যারিয়নরা হলো খুবই অসুস্থিত। (খ) মেসন ঃ মেসন কণাদের মধ্যে আছে পাই মেসন ও K-মেসন। এরা সকলেই ব্যারিয়ন কণাদের চেয়ে হালকা। এদের কোন স্পিন কৌণিক ভরবেগ নেই। (গ) লেপটন ঃ

লেপটনদের মধ্যে আছে ইলেকট্রন, মিউ মেসন এবং নিউট্রিনো। এরা সকলেই খুব হালকা। ইলেকট্রন এবং নিউট্রিনো প্রত্যেকেই খুব সুস্থিত। নিউট্রিনোর কোন ভর নেই। এই জন্য এদের সনাক্ত করা খুব কষ্টকর। কিছু কিছু পদার্থবিদ্ বিশ্বাস করেন যে লেপটন ছাড়া আর সব কণারাই কোয়ার্ক নামে আরও সূক্ষ্ম কণা দিয়ে তৈরী। চারটি কোয়ার্ক ও চারটি এ্যাণ্টি কোয়ার্ক দিয়েই সকল কণার গঠন ব্যাখা করা যাবে। প্রত্যেকটি কণা কোয়ার্কদের ভিন্ন ভিন্ন বিন্যাসের দরুণ সৃষ্ট। মৌলিক কণাদের মধ্যে যে কোয়ার্কের উপস্থিতি থাকতে পারে সেকথা প্রথম বলেন ১৯৬৪ সালে দু'জন আমেরিকান বিজ্ঞানী। এরা হলেন গেলম্যান ও জুইগ।

কোয়ার্কের তড়িতাধান ইলেকট্রনের তড়িতাধানের ভগ্নাংশ। যদিও কোয়ার্কের উপস্থিতি পরীক্ষার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়নি তবুও তাত্ত্বিকভাবে তার উপস্থিতি উপেক্ষা করা যাচ্ছে না। অবশ্য ফোটন ইলেকট্রন, মিউমেসন বা নিউট্রিনো কোয়ার্ক দিয়ে তৈরী নয়।

জ্ঞানের প্রথম সোপান

বিস্তৃতি ও অবিভাজ্যতার মধ্যে দ্বন্দ্ব না মিটলে পরমাণুবাদ যথেষ্ট অসুবিধার সামনে পড়বে। এই দ্বন্দ্বের হয়ত একদিন নিরসন হবে ঠিকই কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকেই যাবে। প্রশ্নটি হল চিন্তাধারার কোন্ ভ্রান্তির জন্যে এই দ্বন্দ্বের শুরু হয়েছিল? কেবলমাত্র বিন্দু ছাড়া সকল বস্তুর বিস্তৃতি আছে এই ধারণা থেকেই হয়তো ভুলের উৎপত্তি। সাধারণভাবে আমরা দৈনন্দিন জীবনে যে-সমস্ত জিনিস দেখি তাতে উপরের ধারণাটি খুবই সংগত মনে হবে। কিন্তু এই ধারণা মৌলিক কণাদের বেলায় খাটছে না।

পুরো ব্যাপারটা বুঝে উঠতে গেলে আমাদের জ্ঞানের প্রাথমিক শর্ত কী তা বুঝে নিতে হবে। জ্ঞানতত্ত্বের প্রাথমিক শর্ত বলতে আমরা কী বুঝি? কোনো বিশেষ ঘটনার কথা ধরা যাক। যেমন উপর থেকে কোনো জিনিস ছেড়ে দিলে সেটা সব সময় নিচের দিকে পড়ে। পড়ন্ত বস্তু সম্পর্কে এটুকু তথ্যেই এ বিষয়ে জ্ঞানের সম্পূর্ণতা আসতে পারে না। এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করতে গেলে একটি বস্তুকে উপর থেকে ছাড়লে সে নিচে পড়ে কেন, কী গতিবেগে পড়ে, সকল বস্তুই এক গতিবেগে পড়ে কিনা—এইসব অনেক তথ্য জানতে হবে। তারপরেই কেবল বিষয়টির সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান হয়েছে বলে ধরা যাবে। এই শর্তগুলির ভূমিকা আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানে খুবই প্রয়োজনীয় বলে পরে এ নিয়ে আরও বিস্তৃত আলোচনা করা হবে। শর্ত অনুযায়ী প্রাকৃতিক কোনো কিছু বর্ণনা করতে গেলে যে-সব ধারণা ব্যবহার করা হবে তাদের

পরিষ্কার ভাবে সংজ্ঞা দিতে হবে। যে-সব বিজ্ঞানী পরীক্ষা করে কোনো তথ্যের সত্যতা যাচাই করবেন তাদের যেন ব্যবহৃত সংজ্ঞা সম্বন্ধে সন্দেহ না থাকে। এমন কি কোনো সংজ্ঞা আরোপ করা হলে তার মধ্যে পরিমাপযোগ্য যদি কিছু থাকে তবে সেই পরিমাপযোগ্য বিষয়টি পরিমাপ করার উপায়ও জানতে হবে।

আমরা যদি সবসময় এই দাবিই করি, যে, যে-কোনো ধারণাকেই পরীক্ষাদ্বারা যাচাই করা যাবে তাহলে তাত্ত্বিক গবেষকদের কাজ হল, যারা প্রকৃত পরীক্ষা করে সত্য যাচাই করবেন তাঁদের ঠিকমতো পথনির্দেশ করা। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কেবলমাত্র পথের সন্ধান পেলেই কি গবেষক পরীক্ষা করে সব মতবাদ যাচাই করতে পারবেন? এমন একটি মতের কথা ধরা যাক যে-মতে মৌলিক কণার নিজস্ব একটি বিস্তৃতি আছে। এই মতের সত্যতা নিরূপণ করতে হলে কী ভাবে মৌলিক কণাদের বিস্তৃতি বোঝা যাবে তা এবং তার মাপার উপায়ও বলে দিতে হবে। চোখে আমরা যে-সমস্ত জিনিস দেখতে পাই (যেমন একটি টেবিল, লাঠি প্রভৃতি) তাদের বিস্তৃতি মাপার জন্যে আমাদের দরকার একটি স্কেল। এইভাবে মাপার পেছনে যুক্তিটা হল যে-দুটি বিন্দুর মধ্যে স্কেলটি রাখা হল তাদের আমরা আলাদা করতে পারি। কিন্তু মৌলিক কণাদের বিশেষ কোনো আকৃতি নেই এবং মৌলিক কণার কোনো একটি অংশ অপর কোনো একটি অংশ থেকে আলাদা করা যায় না। সুতরাং মৌলিক কণার উপর কোনো দুটি বিন্দুকে আলাদা করা সম্ভব নয়।

এইভাবে মৌলিক কণারা তাদের পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নিরীক্ষণ করায় বাধার সৃষ্টি করবে। বিস্তৃতি ও বাহ্যিক গঠন এই দুটো জিনিসই মৌলিক কণাদের ক্ষেত্রে কোনোভাবে অর্থবহ নয় কারণ তাদের বেলায় এই দুটি জিনিসের কোনো একটিরও মাপার উপায় বলে দেওয়া যায় না। বলা যেতে পারে বিস্তৃতি ও অবিভাজ্যতার মধ্যে যে দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করা গিয়েছিল প্রকৃতপক্ষে মৌলিককণাদের ক্ষেত্রে তার কোনো অস্তিত্বই নেই কারণ তাদের বেলায় একই সঙ্গে দুটি ধারণার অস্তিত্ব সম্ভব নয়।

আগে কতগুলি তথ্য নিয়ে সাধারণ আলোচনা করা হল। এই তথ্যগুলোর ক্রমে ক্রমে আরো ব্যাপক আলোচনা করা হবে। এই ধরণের আলোচনার একমাত্র উদ্দেশ্য হল, যে-কয়েকটি নতুন ধারণা বা মতবাদ কোয়াণ্টাম পদার্থবিদ্যাকে গড়ে তুলেছে সেইসব ধারণাগুলির সঙ্গে পরিচিত হবার আগে পাঠকের মানসিকতাকে প্রস্তুত করে নেওয়া। দৃশ্যমান বস্তুর সমস্ত তথ্য জানা গেছে সনাতনী পদার্থবিজ্ঞানের কতকগুলি সুনির্দিষ্ট ও সুপরিচিত তথ্যের উপর নির্ভর করে। অপরপক্ষে মৌলিক কণাদের বেলায় এ সব তথ্য একেবারেই ব্যর্থ।

এ্যারিস্টটল

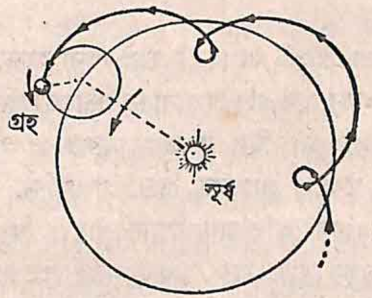
যে শ্রদ্ধা নিয়ে সাধারণ মানুষ এ্যারিস্টটলকে দেখেন ততখানি শ্রদ্ধা নিয়ে হয়তো পদার্থবিদেরা তাঁকে গ্রহণ করতে পারবেন না। যে পরমাণুবাদকে ভালো-ভাবে অনুসন্ধান করলে প্রাচীনকালেও বহু উল্লেখযোগ্য তথ্য পাওয়া যেতে পারত, সেই পরমাণুবাদকে তিনি পুরোপুরি অস্বীকার করেছিলেন। এ্যারিস্টটলের অস্বীকৃতি পরমাণুতত্ত্বের বিকাশের পথে বড়োরকম অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শুধু তাই নয় তিনি মানুষের চিন্তারাজ্যে এমন-সব ঘটনার অনুপ্রবেশ ঘটাতে চাইলেন যে-সব ধারণাগুলোর সঙ্গে বাস্তবের সম্বন্ধ নেই। তাঁর মতো প্রভাবশালী ব্যক্তির বিরোধিতায় বিজ্ঞানের সব শাখাতেই অগ্রগতি কিছুদিনের জন্যে স্তব্ধ হয়ে গেল।

এ্যারিস্টটল প্রকৃতির মধ্যে কারণ সন্ধান না করে উদ্দেশ্যের সন্ধান করে-ছিলেন। নিজস্ব দর্শনের উপর ভিত্তি করে প্রকৃতিকে ইচ্ছামতো চালাবার বাসনাই ছিল তাঁর। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে তিনি এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে স্বনির্ভর বস্তুর পক্ষে সব থেকে সুষ্ঠু ও সব থেকে স্বাভাবিক গতি হল চক্রাকার গতি। এটি একটি নিছক কল্পনা এবং কোনো সূত্র থেকে একে প্রতিপন্ন করা হয়নি। তবুও কোপার্নিকাস পরবর্তীকালে এর বিরোধিতা করতে সাহস পাননি।

পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে পরিক্রমা করে—এই মতবাদ সৃষ্টি করে কোপার্নিকাস বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে একটি সরল নিয়মের সৃষ্টি করলেন। কিন্তু তাঁকেও শেষ পর্যন্ত হতাশার মুখোমুখি হতে হল। কারণ এ্যারিস্টটলের মত অনুসরণ করে তিনি ধরলেন যে পৃথিবী সূর্যকে নির্দিষ্ট একটি গতিতে চক্রাকারে আবর্তন করছে। এর উপর ভিত্তি করে পাওয়া তাঁর গাণিতিক ফলগুলি কিন্তু পরীক্ষালব্ধ ফলগুলির আশানুরূপ ব্যাখ্যা করতে পারল না। হতাশ হয়ে তিনি শেষ পর্যন্ত টলেমির এপিসাইক্‌ল্‌ নিয়মের শরণাপন্ন হলেন। এই মতবাদটিকে প্রথমে তিনি দূরে সরিয়ে দিয়েছিলেন।

এ্যারিস্টটলের স্বাভাবিক 'চক্রাকার গতি' ধারণাকে বজায় রেখে গ্রহ-নক্ষত্রের অনিয়মিত গতিকে ব্যাখ্যা করার জন্যে টলেমি চাতুর্যের সঙ্গে এপিসাইক্‌ল্‌ (Epicycle) নিয়মের উদ্ভাবন করেন। এই নিয়মের মূল কথা হল: মনে করা যাক প্রত্যেকটি গ্রহ ছোট একটি বৃত্তপথে (এপিসাইক্‌ল্‌) আবর্তিত হচ্ছে এবং আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বৃত্তের কেন্দ্রটি আরেকটি বড় বৃত্তের আকারে সূর্যের চারিপাশে ঘুরছে। এইভাবে দুটি সুসম বৃত্তাকার গতির সাহায্যে একটি অনিয়মিত গতির ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে। যদি দুইটি পৃথক পৃথক গতি

সংযুক্ত করে পরীক্ষার সঙ্গে মিল না পাওয়া যায় তবে আরও চক্রাকার সুসম গতির অবতারণা করা যেতে পারে। এর অর্থ হল যে কোনো গতিকেই অনেকগুলি গতির মিলিত ফল হিসাবে চিন্তা করা যায়।



চিত্র—১

টলেমি এবং অন্যান্য প্রাচীন জ্যোতির্বিদদের মতে গ্রহরা কিছুটা জটিল কক্ষপথে আবর্তিত হয়। এই সব বৃত্তাকার কক্ষপথের কেন্দ্রবিন্দু পৃথিবীকে কেন্দ্র করে আর একটি বড়ো বৃত্ত রচনা করে। পরে কোপারনিকাস বলেন যে গ্রহদের কক্ষপথের কেন্দ্রবিন্দু যে বৃত্তে আবর্তিত হয় তার কেন্দ্রে পৃথিবী নয়, থাকে সূর্য।

এই ভাবে কোপার্নিকাস টলেমির মতকেই মেনে নিয়েছিলেন। শুধু তফাৎ এই যে টলেমি ধরে নিয়েছিলেন যে গ্রহগুলি পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে আর কোপার্নিকাসের মতে গ্রহরা সূর্যের চারদিকে ঘোরে। গ্রহজগৎ সম্বন্ধে কোপার্নিকাস ও টলেমি উভয়ের ধারণা খুব জটিল হলেও কোপার্নিকাসের ধারণাকে তুলনামূলকভাবে সরল বলা চলে। সব থেকে উল্লেখযোগ্য হল চিন্তা-ধারার মধ্যে এই পরিবর্তন আনতে কোপারনির্কাসকে যথেষ্ট মূল্য দিতে দিতে হয়েছিল। প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণার মূলে আঘাত করেছিলেন তিনি। মানুষের ধর্ম-বিশ্বাসের উপরেও এর প্রতিক্রিয়া হয়েছিল অপরিসীম। ফলে স্বভাবতই কোপার্নিকাসের তত্ত্ব সাধারণ মানুষের উপর কেনো দাগ কাটে নি। গ্রহনক্ষত্ররা কেবলমাত্র বৃত্তাকারে ঘুরবে এ্যারিস্টটলের এই ধারণা কুসংস্কারের মতো মানুষের মনে গেঁথে গিয়েছিল। জার্মান পণ্ডিত কেপলার সর্বপ্রথম সব ভ্রান্ত ধারণার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পেরেছিলেন। তিনি দেখালেন বৃত্তাকার না হয়ে গ্রহনক্ষত্রের কক্ষপথ উপবৃত্তাকার এবং এর ফলে এপিসাইক্‌ল্‌-এর অস্তিত্ব একদম বাতিল হয়ে গেল।

দু'শ বছর ধরে মানুষ এ্যারিস্টটলের ধারণা বিশ্বাস করে আসছে। কেপলারের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে নতুন ধারণা পুরাতন ধারণাকে সরিয়ে দিল। চিন্তাজগতে

এক নবদিগন্তের সৃষ্টি হল। এখন থেকে মানুষ প্রকৃতির মধ্যেই প্রাকৃতিক ঘটনার রহস্য আবিষ্কারে সচেষ্ট হল, এ্যারিস্টটলের লেখার মধ্যে নয়।

গ্যালিলিও আর নিউটন

পদার্থবিদ্যার উন্নতির প্রতিটি ধাপের ইতিহাস-বর্ণনা আমোদের আসল উদ্দেশ্য নয়। আমাদের মূল লক্ষ্য হল এটা দেখানো যে সনাতনী পদার্থবিদ্যার উন্নতির কয়েকটি ধাপের মধ্যে লুকানো ছিল আজকের চমকপ্রদ ও অপরিচিত কোয়াণ্টাম পদার্থবিজ্ঞানের অনেক তথ্য। আজকের দিনে, পদার্থবিদ্যা ক্রমশঃ নিগূঢ় ও দুর্বোধ্য হয়ে উঠছে এরকম অভিযোগ শোনা যায়। কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানের বিমূর্ততাকে যতখানি নতুন বলে মনে হচ্ছে আসলে ততখানি নতুন সে নয়। পদার্থবিজ্ঞানের প্রাথমিক কাজ হল দুটি পরিমাপযোগ্য রাশির মধ্যে গাণিতিক সম্পর্কটি বার করা। যার মানে হল ঐ দুই রাশির মাঝে প্রকৃতি আরোপিত সম্পর্কটি বার করা। এ কাজে বাধ্য হয়েই পদার্থবিজ্ঞানকে এমনসব ধারণার আশ্রয় অনেক আগে থেকেই নিতে হয়েছে যেসব ধারণাগুলির সঙ্গে সাধারণ মানুষ খুব একটা পরিচিত নয়। এ ধরণের কাজে অগ্রণীদের মধ্যে গ্যালিলিও ও নিউটন অন্যতম।

গ্যালিলিওই প্রথম পদার্থবিজ্ঞানকে কেবলমাত্র কল্পনার আশ্রয় থেকে মুক্ত করে পরীক্ষানির্ভর করে তুলতে চেষ্টা করলেন। তিনিই বললেন যে প্রকৃতির রহস্য ভেদ করতে গেলে পরীক্ষানিরীক্ষা চালাতে হবে—পুঁথির পাতায় তার সন্ধান মিলবে না। অনেক পরীক্ষা করে তিনি দেখতে পেলেন যে, কোনো বস্তুকে যদি পারিপার্শ্বিকের আওতা থেকে মুক্ত রাখা যায় এবং বস্তুটির উপর যদি কোনো বল ক্রিয়া না করে তবে বস্তুটি স্থিতিশীল থাকবে কিংবা সুসম গতিতে সরলরেখায় চলবে। গতিবিদ্যার (Dynamics) ক্ষেত্রে গ্যালিলিওর এ ধারণা খুবই আলোড়ন আনল। এই ধারণাই পরবর্তীকালে নিউটনের হাতে পরিপূর্ণ রূপ পেয়ে নিউটনের প্রথম সূত্র নামে জগদ্বিখ্যাত হয়ে গেল।

আজকের দিনে মানুষ কিন্তু নিউটনের প্রথম গতিসূত্র নিয়ে তেমন মাথা ঘামায় না। এই সূত্রের অন্তর্নিহিত বক্তব্যটি তাদের কাছে স্বতঃস্ফূর্ত মনে হয়। ফলে এই সূত্র চিন্তাজগতে আর বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে না। আপাত দৃষ্টিতে সূত্রটির অর্থ সহজ বলে প্রতীয়মান হলেও আসলে কিন্তু এর মধ্যে অনেক কিছু চিন্তা করার আছে। সূত্রটি বলে যে একটি গতিশীল বস্তুকে সুসমভাবে (Uniform) গতিশীল রাখতে কোন সক্রিয় বলের প্রয়োজন হয় না। অর্থাৎ

গতিশীল বস্তু যাতে গতি হারিয়ে না ফেলে তার জন্যে বস্তুটির উপর কোনো বল প্রয়োগ করে যেতে হবে না।

অভিজ্ঞতায় আমরা দেখতে পাই যে মাটিতে একটি বল গড়িয়ে দিলে সেটি আসতে আসতে থেমে যায় যদি না আবার তাকে ঠেলে দেওয়া হয়। কিন্তু এই যে গতিবেগ কমে যাচ্ছে তার জন্য দায়ী মাটির অমসৃণতা। আমরা খুব সংগতভাবেই ভাবতে পারি যে একদম মসৃণ তলে বলকে গড়িয়ে দিলে তার গতির কোন হ্রাস-বৃদ্ধি হবে না, অর্থাৎ বস্তুর গতি-সংরক্ষণের জন্যে কোনো ক্রিয়াশীল বলের প্রয়োজন হয় না। বল শুধু গতিবেগের পরিবর্তন ঘটায়।

গতির (velocity) পরিবর্তনের হারকে ত্বরণ (acceleration) বলা হয়। পদার্থবিজ্ঞানে ত্বরণ শব্দটি একটু ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সাধারণভাবে ত্বরণ বললে আমরা গতিবেগের পরিবর্তনের হারকেই বুঝি। কিন্তু বলবিদ্যায় ত্বরণ বলতে গতিবেগের হ্রাস বা বৃদ্ধি বোঝাতে পারে আবার গতির মান বজায় রেখে দিক-পরিবর্তনও বোঝানো হয়। একটি বস্তু যদি বৃত্তাকারে ঘোরে তবে গতিবেগ অপরিবর্তিত থাকলেও গতিবেগের দিক ক্রমান্বয়ে পরিবর্তিত হতে থাকবে। এই বৃত্তাকার গতিকে ত্বরিতগতি হিসাবে দেখতে হবে। এক্ষেত্রে কেন্দ্রের দিকে সব সময় একটি অপরিবর্তনীয় ত্বরণ বজায় থাকবে।

বলের সংজ্ঞা

কোনো বস্তুর ত্বরণ সৃষ্টি করতে গেলে বলের (Force) প্রয়োজন ; এই সত্যের উপর নির্ভর করে আছে নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রের মূল কথা। বলের এই নতুন ধরণের সংজ্ঞা বলবিদ্যার প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে সম্পূর্ণ সংগতি বজায় রাখছে। আর তারই সংগে সংগে পদার্থবিদ্যার চিন্তাধারার মধ্যে বিমূর্ততাকে আরও একধাপ এগিয়ে দিচ্ছে।

বল কী? সাধারণ লোক মনে করেন বল সম্বন্ধে তাঁদের বেশ ভাল ধারণাই আছে। কিন্তু যদি বল আসলে কী এই প্রশ্ন করা হয় তখনই তাদের দুর্বলতা ধরা পড়ে। এই জিনিসটাই সুপরিস্ফুট হয় যে বল তাদের কাছে শারীরিক শক্তির প্রকাশমাত্র। কেউ কেউ বলের কোনো সংজ্ঞা দিতে চেষ্টা করেন তবে সেসব সংজ্ঞা পদার্থবিজ্ঞানের কোনো কাজেই আসে না। আগেই বলা হয়েছে যে কোনো প্রাকৃতিক নিয়মের সংজ্ঞা খুব পরিষ্কার হওয়া দরকার যাতে তার অর্থ সম্বন্ধে কোনো রকম দ্বিধা না থাকে। এর ওপরে যদি নিয়মটি কোন ভৌতরাশি সংক্রান্ত হয় তবে তাতে রাশিটি নির্ণয়ের পথও বলে দিতে হবে।

বলের সম্বন্ধে এতক্ষণ যে আলোচনা করা হল তা মোটামুটিভাবে দীর্ঘ

অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে আছে এবং তার পরিমাপ সম্বন্ধে কোনো কথাই বলা হয়নি। এখন তাহলে প্রশ্ন হল যে প্রযুক্ত বলের পরিমাণ কী করে সুষ্ঠুভাবে পরিমাপ করা যাবে। এর উত্তর হল যে সোজাসুজি বল মাপা সম্ভব নয়। পরীক্ষাগারে বলের প্রতিক্রিয়াই কেবল মাপা সম্ভব।

আগেই বলা হয়েছে যে ত্বরণের উৎপত্তিই কোন বস্তুর উপর প্রযুক্ত বলের প্রতিক্রিয়া। বস্তুর ভর যদি কম হয় তবে কোনো একটি বল বেশি ত্বরণের সৃষ্টি করবে।

পদার্থবিদ্‌দের কাছে বলের পরিমাণমূলক সংজ্ঞা হল ঃ বল ভর এবং ত্বরণের গুণফলের সঙ্গে সমান। এর অর্থ হল যে যদি কোন একটি বল পরিমাপ করতে হয় তবে একটি নির্দিষ্ট ভরের বস্তুর উপরে তাকে ক্রিয়া করতে হবে। বলের ক্রিয়াতে বস্তুটিতে ত্বরণের সৃষ্টি হবে। এই ত্বরণের যে মান হবে তাকে বস্তুটির ভরের মান দিয়ে গুণ করলে যে সংখ্যাটি পাওয়া যাবে সেটাই হবে প্রযুক্ত বলের পরিমাপ।

বল নির্ণয়ের নতুন পদ্ধতি সম্পূর্ণ কল্পনানির্ভর সংজ্ঞা দূর করে তার জায়গায় আনল এক গাণিতিক সম্পর্ক। এই সম্পর্কের মধ্যে সকল রাশিই পরীক্ষার সাহায্যে নির্ণয় করা যাবে। এই ভাবে পুরাতন সংজ্ঞা নতুন চিন্তাধারার আলোকে যুক্তিনির্ভর রূপ পেল। এই ভাবেই বলের সংজ্ঞায় এল আমূল পরিবর্তন। আর তার ফলে বল যথাযথ পরিমাপ সম্ভব হল। প্রাকৃতিক নিয়মগুলি সূত্রবদ্ধ করতে আরও কতকগুলি নূতন ধারণার প্রবর্তন করতে হল আর এর জন্য নতুন নতুন রাশি উদ্ভাবনের প্রযোজন হল। উদাহরণস্বরূপ ভরবেগের (Momentum) কথা বলা যেতে পারে। কোনো বস্তুর ভর ও গতিবেগের গুণফলকে বস্তুটির ভরবেগ বলা হয়। এই ভাবে নিত্য নতুন রাশি আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে পদার্থবিদ্যা ক্রমশঃ তার সমস্ত ধারণাকে নির্ভুল ও পরিষ্কার ভাবে বোঝাতে নিজস্ব গূঢ় ভাষার আশ্রয় নিতে শুরু করল।

পদার্থ বিদ্যার বিমূর্ততা

যে বিষয়গুলি আগে আলোচিত হল তারা যে কেবল পদার্থবিদ্যায় সত্য তা নয়, বিজ্ঞানের সব শাখার বেলায় কথাগুলি প্রযোজ্য। পদার্থবিদ্যার একটা নিজস্ব চরিত্র আছে আর তারই জন্য তার নিজস্ব প্রকাশ ভঙ্গিমার দরকার। ফলে কিছু বিমূর্ত চিন্তাধারার অনুপ্রবেশ অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়াল। একথা প্রায়ই বলা হয়ে থাকে যে সনাতনী পদার্থবিদ্যাতে অনেক বিমূর্ত ধারণা উপস্থিত থাকলেও তা মোটামুটিভাবে বোধগম্য ছিল কিন্তু কোয়াণ্টাম মতবাদে যে ধরণের বিমূর্ততার

আবির্ভাব হল তা দুর্বোধ্য, বোঝার অক্ষমতা ঢাকার কৌশল মাত্র। প্রকৃতপক্ষে এই ধরণের অভিযোগ ঠিক নয়। পদার্থবিদ্যা যখন প্রকৃত বিজ্ঞানের সম্মান পেতে শুরু করল তখন বোঝা গিয়েছিল যে বিমূর্ত ধারণার আশ্রয় না নিয়ে পদার্থবিদ্যা কখনই তার অভীষ্ট সাধন করতে পারবে না।

পদার্থবিজ্ঞানের মূল লক্ষ্য হল এমনসব নিয়ম খুঁজে বার করা যাদের সাহায্যে বর্তমান থেকে ভবিষ্যতকে জানা যাবে। এই নিয়ম সর্বজনগ্রাহ্য হওয়া দরকার। এদের একটি সুনির্দিষ্ট অর্থ থাকা চাই যে অর্থকে একজন মানুষ অপর কোন মানুষের কাছে সহজেই পোঁছে দিতে পারবেন। এজন্যে পদার্থবিদ্‌কে প্রথম থেকেই দৃশ্যমান জগতের মধ্যে পরীক্ষানিরীক্ষা সীমাবদ্ধ রাখতে হয়েছে। যেসব জিনিস একান্তভাবে ব্যক্তিবিশেষের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে এবং যে-সব ধারণাকে অন্য মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত করা যায় না সে-ধরণের জিনিস বা ভাবকে পদার্থবিদ্যা শুরু থেকেই সযত্নে পরিহার করেছে। এ ধরণের জিনিসের মধ্যে আছে রঙের অনুভূতি, গন্ধ, স্বাদ প্রভৃতি। একটি লাল জিনিসকে কেউই পুরোপুরি বর্ণনা করতে পারে না অথবা আরেকজন ঐ বস্তুকে কী ভাবে দেখছে তাও বলতে পারে না।

জগতের সকল ঘটনার মধ্যে এমনসব ঘটনা আছে যারা ব্যক্তিগত বিশ্বাস বা স্বীকৃতির উপর নির্ভর করে। এইসব জিনিস কখনই প্রাকৃতিক নিয়মের বিষয়বস্তু হতে পারে না। সুতরাং কতকটা বাধ্য হয়েই পদার্থবিদ্‌কে দৃশ্যমান বস্তুজগৎ সম্বন্ধে ব্যক্তিনির্ভর দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ না করে বিমূর্ত চিন্তাধারার আশ্রয় নিতে হয়েছে। যে ধারণা বা চিন্তা ব্যক্তিনির্ভর নয় তাদের সহজেই এক মানুষ থেকে আরেক মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেওয়া যায়। এই যোগাযোগের মূল হাতিয়ার হল পরিমাপযোগ্য বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে গাণিতিক সম্পর্ক। এর অর্থ হল প্রাকৃতিক নিয়মের কাঠামো এমন হওয়া উচিত যাতে যে সব ধারণা নিজেদের মধ্যে আদান প্রদান করা যায় না তাদের বাদ দিলেও কাঠামোটি অক্ষুন্ন থাকে।

পদার্থবিজ্ঞানের মূল কাঠামোটি আংশিকভাবে সংখ্যাতত্ত্বের সাহায্যে কিংবা জ্যামিতির সাহায্যে বর্ণনা করা চলে। এরপর থেকে এই কাঠামোটিকেই আমরা প্রাকৃতিক ঘটনাসমষ্টির অবয়ব বলে আখ্যা দেব। এর ফলে প্রাকৃতিক নিয়মগুলি এই অবয়ব সম্বন্ধে নির্ভুল তথ্য হিসাবে পরিগণিত হবে। এইভাবে ভৌতবিজ্ঞানের গবেষণার লক্ষ্য সকল বাহ্যিক রূপকে পরিত্যাগ করল। তার জায়গায় মূল অবয়বের অনুসন্ধানই তার প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল।

ক্রমশঃ এটাই দেখা গেল বিমূর্ত হওয়া ছাড়া পদার্থবিজ্ঞানের আর কোনো উপায় নেই। কারণ বিমূর্ততা পদার্থবিজ্ঞানের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে।

এ সত্ত্বেও সনাতনী পদার্থবিদ্যাকে সুপরিস্ফুট ও সহজে কল্পনীয় বলা হয় তার কারণ হল সনাতনী পদার্থবিজ্ঞানের ধারণাগুলো এতই পরিচিত হয়ে গেছে যে এদের মধ্যেকার বিমূর্ত রূপটি নজরেই পড়ে না। অপরপক্ষে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের বিমূর্ত ভাবটি অল্পতে নজরে পড়ে তার কারণ হল আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের মূল ভাবধারাটি গড়ে উঠেছে মৌলিক কণাদের কেন্দ্র করে। এদের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার পিছনে যে মূল কাঠামোটি বজায় আছে তাকে সনাতনী পদার্থবিজ্ঞানের প্রচলিত ধারণার আওতায় আনা যাচ্ছে না। এর ফলে প্রয়োজন হচ্ছে এমন ধারণা প্রবর্তনের যে ধারণাগুলির সংগে মানুষের পরিচিতি ঘটে নি।

মাধ্যাকর্ষণের সূত্র

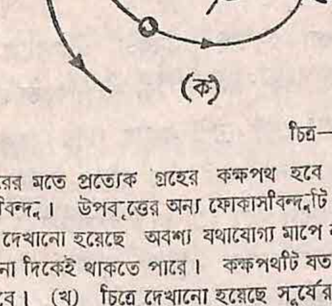
নিউটন তখনও ছাত্র যখন তাঁর মনে হয়েছিল যে একটি আপেল মাধ্যাকর্ষণের জন্যে গাছ থেকে মাটিতে পড়ে। তাঁর আরও মনে হয়েছিল যে এই ধরণের এক মাধ্যাকর্ষণ বল চন্দ্রকে বৃত্তাকার পরিক্রমায় বাধ্য করছে। তাঁর মনে হল পৃথিবী অন্যান্য বস্তুর ওপর এই বলই প্রয়োগ করছে। এই বলের পরিমাণ পৃথিবী থেকে বস্তুটির দূরত্বের উপর নির্ভর করবে। তিনি অংক কষে পৃথিবী চাঁদের উপরে বা একটি আপেলের উপর যে আকর্ষক বল প্রয়োগ করে তার তুলনা করে তাঁর বিখ্যাত মাধ্যাকর্ষণের নিয়মগুলি প্রবর্তন করলেন। এই নিয়মগুলি হলো ঃ দুটি বস্তুর মাধ্যাকর্ষণজনিত আকর্ষক বলের পরিমাণ বস্তু দুটির মধ্যেকার দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক হবে। মজার ব্যাপার হল এই যে নিউটন নিয়মগুলো আবিষ্কার করার বহুদিন বাদে প্রকাশ করেছিলেন। প্রথম প্রথম তিনি আবিষ্কৃত নিয়মগুলোর যৌক্তিকতা সম্বন্ধে পুরোপুরি নিঃসন্দেহ হতে পারেননি। খানিকটা হতাশ হয়েই নিউটন কিছুদিন গবেষণা বন্ধ রেখেছিলেন। পরে অবশ্য তিনি তাঁর গাণিতিক বিশ্লেষণের মধ্যে একটি অসংগতি দেখতে পান। এই অসংগতি কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর আবিষ্কৃত নিয়ম সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হন।

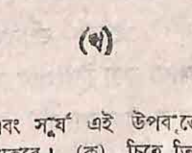
মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে এই পৃথিবী অন্যান্য গ্রহদের নিয়ে এক পরিবারভুক্ত হল। দীর্ঘদিনের পরিচিতির জন্যে আমরা এ আবিষ্কারের বিরাটত্ব আজ হয়ত আর উপলব্ধি করি না। কিন্তু নিউটনের কালে এ ধারণা যুগান্তকারী বলে পরিগণিত হয়েছিল।

এখন প্রশ্ন হল পঞ্চাশ বছর আগে নিছক যুক্তির সাহায্যে গ্রহ পরিক্রমার যে নিয়মগুলি কেপলার বার করেছিলেন সেগুলো কি মাধ্যাকর্ষণ সূত্রের সাহায্যে গাণিতিক ভাবে নির্ণয় করা সম্ভব? গ্রহদের পরিক্রমা সম্বন্ধে বহু তথ্য থেকে কেপলার কতকগুলি ব্যাপক সংজ্ঞা তৈরি করেছিলেন। তারা হল (১) সূর্যের চারপাশে পরিক্রমার পথ উপবৃত্ত (Ellipse) হবে এবং সূর্যই হবে সেই উপবৃত্তের

একটি ফোকাসবিন্দু। (২) প্রত্যেকটি গ্রহ সূর্যের চারিদিকে এমনভাবে ঘুরবে যাতে গ্রহ ও সূর্যের সংযোগকারী সরলরেখাটি যে পরিমাণ ক্ষেত্রফল অধ্যুষিত করবে তার বৃদ্ধির হার ধ্রুবক। এর অর্থ হল গ্রহগুলো যখন সূর্যের কাছাকাছি আসবে তখন খুব তাড়াতাড়ি এবং যখন সূর্য থেকে দূরে থাকবে তখন অপেক্ষাকৃত ধীরে পথ পরিক্রমা করবে। (৩) সূর্যকে একবার পরিক্রমা করতে যে সময় লাগবে তা সূর্য ও গ্রহের মধ্যেকার দূরত্বের গড়ের উপর নির্ভর করবে। প্রকৃতপক্ষে একবার পরিক্রমা করতে যে সময় লাগে তার বর্গ সূর্য ও গ্রহের দূরত্বের ঘনফলের সমানুপাতিক হবে (Directly proportional)। সুতরাং অতি দূরের গ্রহ একবার পরিক্রমা করতে অনেক বেশি সময় নেবে। পরবর্তীকালে দেখা গেল কেপলারের সূত্রগুলি উপগ্রহদের বেলায় সমান ভাবে প্রযোজ্য।

মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম যদি ঠিক হয় তবে এর দ্বারা কেপলারের সূত্রগুলি নিশ্চয় প্রতিপন্ন করা যাবে। এটা করতে হবে সম্পূর্ণ গাণিতিকভাবে, বলবিদ্যার (Mechanics) নিয়মগুলির সাহায্যে। নিউটন বহুপূর্বে ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাসের প্রবর্তন করে রেখেছিলেন। কেপলারের সূত্র প্রতিপন্ন করার সময় তাঁর প্রবর্তিত নতুন গাণিতিক পদ্ধতিটিকে যাচাই করার এক সুবর্ণ সুযোগ তাঁর কাছে উপস্থিত হল। এ সুযোগ তিনি হেলায় হারালেন না। মাধ্যাকর্ষণের ও বলবিদ্যার নিয়মগুলো নিয়ে তিনি নিজস্ব গাণিতিক প্রক্রিয়া প্রয়োগ করলেন। চরম সার্থকতা এলো যখন তিনি দেখলেন সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কেপলারের সূত্রগুলো মাধ্যাকর্ষণের নিয়মের সাহায্যে তিনি প্রতিপন্ন করতে পারলেন।


(ক)


(খ)

চিত্র—২

কেপলারের মতে প্রত্যেক গ্রহের কক্ষপথ হবে উপবৃত্ত এবং সূর্য এই উপবৃত্তের একটি ফোকাসবিন্দু। উপবৃত্তের অন্য ফোকাসবিন্দুটি অনধিকৃত থাকবে। (ক) চিত্রে তিনটি গ্রহের কক্ষপথ দেখানো হয়েছে অবশ্য যথাযোগ্য মাপে নয়। কক্ষপথের বড়ো অক্ষটি (Major axis) যে কোনো দিকেই থাকতে পারে। কক্ষপথটি যত বড়ো হবে সূর্যের চারিদিকে ঘোরার সময় তত বেশি হবে। (খ) চিত্রে দেখানো হয়েছে সূর্যের সঙ্গে গ্রহের সংযোজক রেখাটি নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে অধ্যুষিত করে. এর ফলে গ্রহটি সূর্যের কাছে থাকলে দ্রুতগতিতে ও দূরে থাকলে ধীরে ধীরে পথ পরিক্রমা করে।

163-41

পরিচিত। এই স্থিতিভরই প্রাক্ আপেক্ষিকতাবাদের যুগে কেবল ভর হিসাবেই পরিচিত। স্থিতিভরের জন্য কোনো সংরক্ষণ নীতি কাজ করে না, কেননা এমন অনেক প্রক্রিয়া আছে যেখানে স্থিতিভর শক্তিতে (যেমন বিকিরণ) রূপান্তরিত হতে পারে। এমন কয়েকটি বিপরীত প্রক্রিয়া আছে যেখানে আপাতশূন্যতা থেকে ভরের সৃষ্টি হচ্ছে। এর উদাহরণ হল দ্বৈতসৃষ্টি (Pair creation) প্রক্রিয়া যেখানে বিকিরণের একটি অংশ অদৃশ্য হয়ে গিয়ে ইলেকট্রন ও পজিট্রনের সৃষ্টি হয়। মহাজাগতিক রশ্মি সংক্রান্ত গবেষণায় এ ধরণের প্রক্রিয়া ধরা পড়েছে।

প্রাকৃতিক দর্শনের ক্ষেত্রে একটি অতি প্রাচীন কার্যসূচীর যথার্থ ও চূড়ান্ত রূপায়ণই ভরশক্তির সমতুল্যতা সূত্রটি। এটি হল পদার্থের বেগবানরূপ। আপেক্ষিকতাবাদের আবির্ভাবের আগে পর্যন্ত এই ভাবধারাকে প্রকৃত সমীকরণের রূপ দেওয়া সম্ভব হয় নি। পরীক্ষার আলোকে যাচাই করা প্রাকৃতিক নিয়ম হিসাবে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

তাৎক্ষণিক সংকেত প্রেরণ অসম্ভব

একথা আগেই বলা হয়েছে যে ভর ও শক্তির সমতুল্যতা এমন একটি নতুন বলবিদ্যা থেকে সৃষ্ট যে বলবিদ্যাতে আলোর গতিবেগই গতিবেগের সর্বোচ্চ সীমা। এর থেকে দ্রুতগতি আর কোনো কিছুরই হতে পারে না। এই ধারণার উপরেই ভরশক্তির সূত্রের যাথার্থ্য নির্ভর করছে। যাঁরা আপেক্ষিকতাবাদের বিরোধী ছিলেন তাঁদের মত ছিল কোনো একটি সংকেত বা প্রতিক্রিয়া অসীম গতিবেগে তাৎক্ষণিক-ভাবে প্রবাহিত হতে পারে।

মনে করা যাক, একটি শক্ত দণ্ডের দুটি প্রান্ত P_1 এবং P_2 দ্বারা চিহ্নিত করা হল। P_1 ও P_2 মধ্যে দূরত্ব অনেকখানি। এই দণ্ডটি টেলিগ্রাফ যন্ত্রের চেয়েও দ্রুতগামী সংকেত প্রেরক হিসাবে কাজ করতে পারে, কেন না P_1 প্রান্তে আঘাত করলে সেই আঘাতের প্রতিক্রিয়া তৎক্ষণাৎ অপর প্রান্তে সঞ্চারিত হয়ে যাবে। তাহলে সম্পূর্ণভাবে দৃঢ় একটি দণ্ডের সাহায্যে বহুদূরে অসীম গতিবেগে সংকেত বার্তা প্রেরণ করা যাবে।

উপরের কথাগুলো কিন্তু আপেক্ষিকতাবাদ বিরোধী। বড়ো জোর আলোর গতিবেগ নিয়ে আমরা কোনো সংকেত পাঠাতে পারি। সুতরাং এই ধরণের সম্পূর্ণ দৃঢ় দণ্ডের অস্তিত্ব থাকতে পারে না—এই অতিরিক্ত অনুমানের আশ্রয় নিতে হচ্ছে। প্রকৃত পক্ষে প্রত্যেক বস্তুই অসংখ্য পরমাণু দিয়ে তৈরি। চাপের ফলে পরমাণুদের মধ্যেকার আপেক্ষিক অবস্থান পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে। তার ফলে দণ্ডটিরও আকৃতির পরিবর্তন আসতে পারে। দণ্ডটি নিয়ে পরীক্ষায় সময় P_1 প্রান্তে আঘাত

তৎক্ষণাৎ অপর প্রান্তে সঞ্চারিত হয় না বরং স্থিতিস্থাপক ঘনীভবন তরঙ্গের সৃষ্টি করে, যে তরঙ্গ আলোর গতিবেগের চেয়ে অনেক কম গতিবেগ নিয়ে P_1 থেকে P_2-র দিকে সঞ্চারিত হয়।

আপেক্ষিকতা ও মাধ্যাকর্ষণ

এক সময় আপেক্ষিকতাবাদকে মাধ্যাকর্ষণের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়। মাধ্যাকর্ষণ ভরের অস্তিত্বের ফল। বিশ্বের সকল বস্তু পরস্পরের উপর আকর্ষণ বল প্রয়োগ করে। আইনস্টাইনের অভিমত হল যে এই মাধ্যাকর্ষণের ব্যাপারটা নির্দেশতন্ত্র নিরপেক্ষ ত নয়ই, উপরন্তু বস্তুস্থিত নির্দেশতন্ত্রের সাহায্যেই এদের উৎপত্তি। সম্ভবত মাধ্যাকর্ষণের কারণ হল এমন একটি নির্দেশতন্ত্র যাকে জাড্য নির্দেশতন্ত্র মনে করা হলেও আসলে তা নয়। ভূপৃষ্ঠস্থ যে কোনো স্থানে আকর্ষণের কথাই ভাবা যাক এই শক্তি যে সকল বস্তুর কোনো অবলম্বন নেই তাদের কেন্দ্রের দিকে আকৃষ্ট করবে।

মাধ্যাকর্ষণ সম্বন্ধে দুটো সম্ভাব্য ব্যাখ্যার কথা ভাবা যেতে পারে। এদের মধ্যে সবচেয়ে স্পষ্ট নিউটনের ব্যাখ্যা। এর মূল কথা হচ্ছে পৃথিবী ও অন্যান্য সকল বস্তু পরস্পরকে আকর্ষণ করে। আইনস্টাইনের আগে আর কেউ দ্বিতীয় কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পেতে চেষ্টা করেন নি। মাধ্যাকর্ষণের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করার আরও একটি পথ থাকতে পারে। নিচের দিকে পড়ছে কোনো একটি বস্তুর গতি যে নির্দেশতন্ত্র সাপেক্ষে বর্ণনা করা হচ্ছে সেই নির্দেশতন্ত্রের মধ্যেই দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

আপেক্ষিকতাবাদ অনুযায়ী পৃথিবী নিজেই এই ধরণের নির্দেশতন্ত্র ঠিক করছে। বস্তুর নিম্নমুখী গতিকে সবসময় পৃথিবীর সঙ্গে দৃঢ়ভাবে সংশ্লিষ্ট একটি নির্দেশকের সাহায্যে বর্ণনা করা হয়। কিন্তু বলবিদ্যার নিয়মগুলো মানতে এই গতি পর্যবেক্ষণ স্থানের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী একটি জাড্য নির্দেশতন্ত্র সাপেক্ষে বর্ণনা করা উচিত। মাধ্যাকর্ষণের উৎপত্তির ব্যাখ্যা হিসাবে ধরা যাক যে একটি নির্দেশতন্ত্র নিজে স্থির না থেকে পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে গতিশীল। একটি মুক্ত বস্তু ধ্রুবক ত্বরণ নিয়ে যে ভাবে নিচের দিকে পড়বে ঠিক সেই ভাবে নির্দেশতন্ত্রটিও গতিশীল হবে। এই ধরণের নির্দেশতন্ত্র সাপেক্ষে পড়ন্ত বস্তুটির গতি নেই। এর মানে হলো এই নির্দেশতন্ত্রে যে নিরীক্ষক বসে আছে যে পড়ন্ত কোন বস্তুকে স্থির দেখবে কোনও স্থির বস্তুকে ত্বরণ নিয়ে চলতে দেখবে।

আইনস্টাইন দেওয়া একটা উদাহরণ দিয়েই বিষয়টি বোঝানো যেতে পারে। ধরা যাক একটা এলিভেটর একটা সুড়ঙ্গের মধ্যে মুক্তভাবে নীচে নেমে যাচ্ছে।

বিজ্ঞানে ব্যাখ্যার স্বরূপ

নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ সূত্রগুলি একটি কঠিন সমস্যার সমাধান করল ঠিকই কিন্তু তাদের সম্বন্ধে কিছু সন্দেহ বিজ্ঞানীদের মনে জাগল। মাধ্যাকর্ষণ গ্রহনক্ষত্রদের গতিবিধির পুরো চিত্রটি কি তুলে ধরতে পারছে, বা গ্রহ নক্ষত্ররা নিউটনের সূত্র অনুযায়ী পরস্পরকে আকর্ষণই বা করবে কেন—এইসব বিভিন্ন প্রশ্ন বিজ্ঞানীদের মনে হল। পদার্থবিজ্ঞানে 'হৃদয়ঙ্গম করা' আর 'ব্যাখ্যা করা' এই দুইটি শব্দের মধ্যে দুর্ভাগ্যবশতঃ যে দ্বন্দ্ব ঢুকে পড়েছে তারই ফলে এই সব প্রশ্নের উৎপত্তি। এই তফাৎ নিয়ে বহু তর্কের ঝড় বয়ে গেছে বিজ্ঞানীদের মধ্যে। পরিষ্কার কোনো সিদ্ধান্তে আজও আসা সম্ভব হয়নি। বিশেষ করে কোয়াণ্টাম মতবাদ পরীক্ষালব্ধ ফল ব্যাখ্যা করতে পারলেও পুরো ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করাতে পারছে না—এ অভিযোগ প্রায়শঃই শোনা যায়। এই অভিযোগটি নিয়ে এক বিশদ আলোচনা করা দরকার কেননা অভিযোগটি সত্য কিনা সেটা যাচাই করে দেখতে হবে।

কোয়াণ্টাম মতবাদ যে সমস্ত ব্যাখ্যা দিচ্ছে প্রথম দৃষ্টিতে তারা খুব উৎসাহব্যঞ্জক মনে হচ্ছে না। উদাহরণস্বরূপ মৌলিক কণাদের কথা ধরা যেতে পারে। কিছু পরীক্ষার ফল (পরে বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হবে) থেকে দেখা যায় মৌলিক কণারা (যেমন ইলেকট্রন ইত্যাদি) একসময় বস্তুকণা হিসাবে ব্যবহার করে আবার আশ্চর্যজনক ভাবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা তরঙ্গের রূপ ধারণ করে। সনাতনী পদার্থবিজ্ঞানে এই অত্যাশ্চর্য ঘটনার নজির নেই। কোয়াণ্টাম মতবাদের কাছে এর ব্যাখ্যা চাইলে সে গূঢ় ও গণিতনির্ভর কতকগুলি নিয়মের সাহায্যে ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করবে। সাধারণ পরিচিত গাণিতিক বর্ণনা, যা সনাতনী পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে খুবই সাফল্য লাভ করেছিল, মৌলিক কণাদের বিস্ময়কর ঘটনার ব্যাখ্যায় সেই সফলতা লাভ করছে না।

এই ধরণের কথায় যে কোনো জ্ঞানান্বেষীই খানিকটা অবিশ্বাসে মাথা দোলাবেন। প্রত্যেক জ্ঞানান্বেষীই যে এক একজন বিশিষ্ট গণিতজ্ঞ হবেন এ ধরণের আশা করা ঠিক হবে না। সুতরাং কেউ কেউ বলতে পারেন ইলেকট্রনের দ্বৈত সত্তার কার্যকারণটি গণিতের সাহায্য না নিয়েই তাঁকে বুঝিয়ে দেওয়া হোক। বিস্মিত হলেও তাঁকে তখন এই কথাই মেনে নিতে হবে যে ইলেকট্রনের দ্বৈত সত্তার স্বরূপটি সাধারণ পরিভাষায় বোঝা যাবে না। সুতরাং সাধারণ মানুষ যে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছুটা নিরাশ হবে তাতে আশ্চর্য কী?

কিন্তু নিরাশ হবার যথার্থ কোনো কারণ নেই। এর কারণ হল সনাতনী

পদার্থবিজ্ঞানে প্রাকৃতিক নিয়ম ছাড়া আর কিছু ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হয় না। প্রকৃতপক্ষে প্রাকৃতিক নিয়মের যে রূপ তা অপরিবর্তনীয়। পদার্থবিদ্যা একান্তভাবে পরীক্ষানির্ভর বিষয়। কোনো ঘটনার বৈধতা নিয়ে যদি কেউ প্রশ্ন তোলেন তবে তার একমাত্র উত্তর হবে যে প্রাকৃতিক নিয়ম এমনটাই প্রত্যাশা করে। একটি পাথরকে হাত থেকে ছেড়ে দিলে মাটিতে পড়ে যাবে কেন? এর উত্তর হবে পৃথিবী ও বস্তুটির মধ্যে মাধ্যাকর্ষণের জন্যে। কী করে আকর্ষণজনিত বলের উদ্ভব হল সে প্রশ্ন করা প্রাসঙ্গিক হবে না কেন না প্রাকৃতিক ঘটনাকে কখনও ব্যাখ্যা করা যাবে না।

কেপলারের গ্রহ-পরিক্রমা সংক্রান্ত নিয়মগুলি আরও ব্যাপক মাধ্যাকর্ষণ সূত্রের আলোকে প্রমাণ করা যায়। এখানে এইটাই বলা চলে যে মাধ্যাকর্ষণ সূত্র কেপলার-কল্পিত সূত্রগুলিকে ব্যাখ্যা দিতে সমর্থ হল। এইভাবে ব্যাখ্যা চাওয়ার পরিধিটাকে ক্রমশঃ বাড়ালে দেখা যাবে যে এর নির্দিষ্ট সীমারেখা আছে। এই সীমারেখার বাইরে কোন কিছুর ব্যাখ্যা আর পাওয়া যাবে না।

কোনো প্রাকৃতিক ঘটনাকে 'হৃদয়ঙ্গম' করা হয়েছে তখনই বলা যাবে যখন দেখা যাবে যে ঘটনাটি একটি নির্দিষ্ট সুজ্ঞাত প্রাকৃতিক নিয়মে ঘটছে। 'হৃদয়ঙ্গম' করার অর্থ এর থেকে বেশী কিছু হতে পারে না। কী বাহ্যিক প্রয়োজনে ঘটনাটি ঘটছে তা বুঝতে পারলেই কোনো জিনিসকে যথার্থ হৃদয়ঙ্গম করা হল এ ধারণা ভুল।

একটি বিলিয়ার্ড বল গড়িয়ে যদি আর একটি স্থির বলকে আঘাত করে তবে স্বাভাবিকভাবে আশা করা হয় দ্বিতীয় বলটিও চলতে শুরু করবে। এই চিন্তাটা কিন্তু কোন প্রাকৃতিক নিয়মের সাহায্য ছাড়াই তাড়াতাড়ি মনে আসে। যদি দ্বিতীয় বলটি আঘাত পেয়ে দাঁড়িয়ে থাকত তাহলেও বলার ছিল না। বাস্তবে বলবিদ্যার সাহায্যে স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ সংক্রান্ত আলোচনায় কতকগুলি নিয়ম পাওয়া যায়। সেই নিয়মগুলোর সাহায্যে দেখানো যায় যে দ্বিতীয় বস্তু প্রথম বস্তুর ধাক্কায় চলতে শুরু করে। এই নিয়মগুলির সাহায্যে দ্বিতীয় বস্তুটির গতি-বিধির যা তথ্য জানা যাবে তার বাইরে তর্ক তুলে আর কোনো লাভ নেই।

'আমি কোনো প্রকল্প উদ্ভাবন করি না'

চাপ বা সংঘর্ষজনিত প্রাকৃতিক ঘটনাগুলো বেশ সহজেই মানুষ বুঝতে পারে। অনেকদিন ধরে সমস্ত প্রাকৃতিক ঘটনাকে এই ধরণের নানাবিধ বলের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার সাহায্যে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হয়েছে। নিউটন তাঁর মাধ্যাকর্ষণ সূত্রের সত্যতা ও গাণিতিক ক্ষমতা সম্বন্ধে খুবই আস্থাশীল ছিলেন। কিন্তু তিনি জানতেন যে নিয়মটির কয়েকটি অসম্পূর্ণতা আছে। এক বস্তু অন্য এক বস্তুকে কেন আকর্ষণ

করবে, তাঁর সূত্রগুলি সে কারণ ব্যাখ্যা করতে পারে না। কোনো কিছুর মধ্যস্থতা ব্যতিরেকে একটি বস্তু অপর একটি বস্তুর উপর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে এই কথাটি তাঁর কাছে অবিশ্বাস্য মনে হয়েছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন মাধ্যাকর্ষণ শক্তির উৎপত্তিতে সর্বপরিব্যাপ্ত একটি মাধ্যমের মুখ্য ভূমিকা আছে।

'কেমন করে'—এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে নিউটনকে বিক্ষুব্ধ হতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত তিনি এই চিন্তার জট ছাড়াতে পেরেছিলেন একটি সম্পূর্ণ নতুন মতবাদ দিয়ে। এই মতবাদটি হল 'Hypothesis nonfingo' 'আমি কোনো প্রকল্প উদ্ভাবন করি না'। পরবর্তীকালে এই মতবাদটি আপেক্ষিকতাবাদ ও কোয়াণ্টাম মতবাদের উন্নতিতে আপন শক্তির সাক্ষ্য রেখেছে। এই প্রবচনের সঙ্গে নিউটন ধরে নিলেন যে সমস্ত জিনিস পর্যবেক্ষণীয় নয় তাদের প্রকল্পের পর্যায়ে ফেলা যাবে এবং পদার্থবিদ্যায় সেধরণের প্রকল্পের কোনো স্থান নেই।

পদার্থবিদ্যা কেবলমাত্র পরিমাপযোগ্য এবং সংখ্যার সাহায্যে প্রকাশ করা যায় এমন-সব ভৌতরাশিদের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকবে—এই তত্ত্বের সঙ্গে সংগতি রেখেই নিউটনের বিখ্যাত প্রবাদ বাক্যটি গড়ে উঠেছে। এই ধারণাকেই প্রকৃতির বাহ্যিক কাঠামো বলা হয়েছে। এই কার্যক্রম দৃষ্টিগোচর ঘটনার মধ্যে কাল্পনিক কোনো-কিছুর অনুপ্রবেশ বাতিল করে দিচ্ছে।

পদার্থবিদ্দের চোখে যা দেখা যায় না, যা মাপা যায় না তার কোন অস্তিত্বই নেই। তাই বলে এরকম মনে করা ঠিক হবে না যে পদার্থবিদ্যাতে অনুমানের স্থান কোনো ভাবেই নেই। অনুসন্ধানের সকল পর্যায়ে একজন পদার্থবিদ নিত্যনতুন অনুমান করেন। সেই অনুমানের উপর নির্ভর করেই শেষ পর্যন্ত প্রকৃত নিয়মটির সন্ধান পান। সুতরাং বলা যেতে পারে যে পদার্থবিদ্যায় সেই অনুমানের স্থান আছে যাকে পরীক্ষায় যাচাই করে নেওয়া যায়।

কী ভাবে একটি প্রাকৃতিক নিয়ম আবিষ্কৃত হয়? প্রথমতঃ পদার্থবিদ্কে বিশেষ কয়েকটি ঘটনার দিকে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হয় তারপর তাঁকে কিছু কিছু পরিমাপ করতে হয়। পরিমিত ফলগুলি নিয়ে তিনি ফলগুলির মধ্যে অন্তর্নিহিত সম্বন্ধটি পেতে চেষ্টা করেন। এই অন্তর্নিহিত সম্বন্ধটিতেই পূর্ব নির্বাচিত ঘটনাগুলির মধ্যে বিরাজমান যে নিয়ম আছে তা আত্মপ্রকাশ করবে। বেশিরভাগ সময়ে পদার্থবিদেরা শুরুতেই স্পষ্ট কোন সম্বন্ধ খুঁজে পেতে সফল হন না। অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার পরই গবেষকের চোখের সামনে তার প্রার্থিত সম্বন্ধটি ধরা দেয়। সম্বন্ধটি কিন্তু তখনও অনুমানের পর্যায়ে থাকবে। তার সত্যতা পুনরায় পরীক্ষা করে যাচাই করতে হবে। যদি দেখা যায় যে নতুন পরীক্ষায় অনুমিত সম্বন্ধটি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল না তাহলে আবার নতুন সম্বন্ধের

কথা ভাবতে হবে যার সঙ্গে পরীক্ষালব্ধ ফলের সংগতি থাকবে। এইভাবে ধীরে ধীরে আসল প্রাকৃতিক নিয়মটি আবিষ্কৃত হবে এবং এই নিয়মটি সার্থকভাবে সকল পরীক্ষার ফলের পুনরাবৃত্তি ঘটাবে।

পদার্থবিদ্যায় কিছু কিছু অনুমান আছে যারা কেবলমাত্র গ্রহণীয়ই নয়, অপরিহার্য্যও বটে। ধাপে ধাপে এদের সাহায্যেই প্রকৃত সত্যে পৌঁছানো সম্ভব। এ ধরণের অনুমানের বিরুদ্ধে নিউটন কিন্তু কোনো সমালোচনা করেন নি। কারণ তিনি জানতেন এদের মধ্যে অস্পষ্টতার কোনো অবকাশ নেই। এরা পরীক্ষালব্ধ ফলগুলির মধ্যে যে সামঞ্জস্য বিধান করার চেষ্টা করা হয় সে কাজে সাহায্য করে। যে ধরণের অনুমান নিউটন পরিহার করতে চেয়েছিলেন সেগুলো ভিন্ন চরিত্রের, সম্পূর্ণ অবাস্তব কষ্ট কল্পনা। খানিকটা নিরুপায় হয়ে নিউটন পদার্থবিদের ভূমিকা ছেড়ে নিতান্তই দার্শনিকের মত সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এক অদৃশ্য মাধ্যমের কথা চিন্তা করেছিলেন। এই মাধ্যমকেই তিনি 'আত্মা' বলে আখ্যাও দিয়েছিলেন। তাঁর মতে দুটি বস্তুর আকর্ষণের পেছনে এই আত্মা মধ্যস্থতার কাজ করে।

সাধারণ মানুষ হিসাবে নিউটন এইরকম ভেবেছিলেন কিন্তু পদার্থবিদ হিসাবে এই অনুমানকে অলৌকিক বলে মনে হয়েছিল। পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে মাধ্যাকর্ষণ সূত্র নিউটনের মতে নিছক একটি গাণিতিক নিয়ম। এরসঙ্গে আর কিছু সংযুক্ত করা ক্ষতিকারক হবে। নিউটন কল্পিত আত্মা পরে অবশ্য ইথার রূপে পরিচিতি লাভ করে। আলোর তরঙ্গাকারে ছড়িয়ে পড়া এই ইথারের সাহায্যে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হয়েছিল। পরে অবশ্য এর অস্তিত্ব অপ্রমাণ করে পদার্থবিজ্ঞানের পরিভাষা থেকে ইথার শব্দটি অবলুপ্ত করে দেন মাইকলসন ও মর্লি।

পদার্থবিজ্ঞানকে যদি সবরকম অনুমান মেনে নিতে হত তাহলে তা বিজ্ঞান না থেকে গল্প-কাহিনী হয়ে দাঁড়াত। একটি পেণ্ডুলামের দোলনের কথাই চিন্তা করা যাক। এই ব্যাপারটাকে ব্যাখ্যা করার জন্য সবাইকে যে কোন ধরণের অনুমান করতে বলা হল এই আশ্বাস দিয়ে যে কাউকেই অবৈজ্ঞানিক বলা হবে না। অনেকের মধ্যে একজন হয়ত বলবে যে পেণ্ডুলামের মধ্যে একটা প্রেতাত্মা বসে আছে যে নিয়ম-মাফিক পেণ্ডুলামটিকে দোলাচ্ছে। গ্যালিলিও কিন্তু কোনো অপদেবতার আশ্রয় নেননি। তার পরিবর্তে তিনি এই ধারণাই করলেন যে পেণ্ডুলামের নিয়মিত দোলনের জন্য মাধ্যাকর্ষণই দায়ী। এই ধারণা যদি সত্যি হয় তবে দোলনকাল ও পেণ্ডুলামের দৈর্ঘ্যের মধ্যে একটি সুনির্দিষ্ট সম্বন্ধ থাকবে। পরীক্ষার ফলা গ্যালিলিওর ধারণাকে সম্পূর্ণ সত্য প্রমাণিত করল। বৈজ্ঞানিক গবেষণার এটি একটা ভারী চমৎকার উদাহরণ।

অনেকসময় আপাতদৃষ্টিতে সঙ্গত প্রচেষ্টা শেষ পর্য্যন্ত ব্যর্থ হয়ে যায়। কোয়াণ্টাম মতবাদে এর একটি ভাল নজির আছে। বহুদিন ধরে বিজ্ঞানীরা কোয়াণ্টাম মতবাদের বিমূর্ততা কিয়দংশে কমাতে চেয়েছেন। এরজন্যে তাঁদের কয়েকটা অভূতপূর্ব জিনিসের কথা ভাবতে হয়েছে। এরা হচ্ছে তথাকথিত লুকানো চলরাশি (Hiddenvariable)। দৃশ্যমান সমস্ত জগৎ আর অদৃশ্য কণাজগৎ এই দুই এর মধ্যেকার ব্যবধান কমিয়ে কোয়াণ্টাম মতবাদের ঘটনাগুলোকে সনাতনী পদার্থবিজ্ঞানের আওতায় আনার আশা নিয়েই এই প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল।

এই ধরণের চেষ্টার পেছনে যে মানসিকতা কাজ করছে তা সত্যিই প্রশংসার্হ। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এ ধরণের মিলন কখনই সম্ভব নয়। কোয়াণ্টাম মতবাদের সকল ঘটনা যদি সত্যি সত্যি সনাতনী পদার্থবিজ্ঞানেরই অংশ হতো তবে কোনো কিছু লুকানো থাকার বা কিছু অংশ কল্পনার উপর ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারই থাকত না। প্রকৃতপক্ষে এ ধরণের প্রচেষ্টা কোয়াণ্টাম মতবাদকে খানিকটা বিভ্রান্তির মুখে ঠেলে দিয়েছে। কারণ কোয়াণ্টাম মতবাদের অন্তর্গত সকল ঘটনাই এমন বৈশিষ্ট্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে, যে সব বৈশিষ্ট্যকে সহজেই পরীক্ষার সাহায্যে দেখা যায় বা পরিমাপ করা যায়।

বিগত শতাব্দীর যান্ত্রিক ও জড়বাদী চিন্তাধারা

নিউটন ব্যক্তিগত ভাবে খুবই ধর্মনিষ্ঠ ছিলেন এবং বিশ্বাস করতেন এই পৃথিবী ঈশ্বরের অনির্বচনীয় শিল্প-কুশলতার সৃষ্টি ও তিনিই সমস্ত পৃথিবীকে পরিচালনা করছেন। প্রাকৃতিক নিয়ম ও বিশ্বাসের মধ্যে কোন বিরোধ তিনি স্বীকার করতেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন পৃথিবীর মধ্যে অলঙ্ঘ্য নিয়মের রাজত্ব সব অলৌকিকতাকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে।

পরবর্তী যুগের মানুষ নিউটনের কাজের সম্বন্ধে অন্য দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছিলেন। পরমাণু-তত্ত্ব তখন আবার নতুন জীবন লাভ করেছে। আরও ব্যাপক অর্থ নিয়ে রসায়ন বিদ্যাতে পরমাণু তত্ত্ব নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে সুদৃঢ় ভাবে। স্বাভাবিক ভাবেই পরমাণুতত্ত্বের আলোকে নিউটনের সূত্রকে নূতন ভাবে দেখার ইচ্ছা অনেকেরই মনে জাগল। ডেমোক্রিটাসের কণ্ঠস্বর যেন আবার ধ্বনিত হল—"পরমাণু আর শূন্যতা ছাড়া আর কোনো কিছুরই অস্তিত্ব নেই—বাকি সবই কল্পনা"। এই মতবাদ এত দৃঢ়ভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করল যে এই তত্ত্বের কোনো ত্রুটি বিচ্যুতির কথা মনেই আসেনি। ক্রমে ক্রমে এই সত্যটি প্রকাশিত হবে যে পরমাণুবাদ মানুষকে জ্ঞানের এক বিশাল ভাণ্ডারের

মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। এই মতবাদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে অবশ্য বাড়াবাড়িও কিছু হয়েছিল। মন বা আত্মা পরমাণু দিয়ে তৈরি এ ধরনের অলীক চিন্তাও কেউ কেউ করেছিলেন।

এইভাবে পরমাণুবাদ একধরনের জড়বাদের মূল ভিত্তি হয়ে দাঁড়াল। জড়বাদের একটা আপাত সরলতা আছে আর সেজন্যই তা স্বল্প জ্ঞানী লোকেদের কাছে গ্রহণীয় দর্শন হয়ে দাঁড়াল। এই দর্শনের মূল কথা হ'লো যে এই বিশ্ব-চরাচরে বিচরণশীল পরমাণু ছাড়া কিছুরই অস্তিত্ব নেই। দৃশ্যমান জগতে এই দর্শনের কিছুটা সত্যতা থাকলেও আত্মিক জগতে এর কোনো কার্যকরী ভূমিকা নেই। মানুষের সুখদুঃখ আবেগ প্রভৃতি যে ব্যাপারগুলো একান্তভাবে মনের ব্যাপার সেখানে পরমাণুতত্ত্বের কোনো ঠাঁই নেই। জড়বাদীরা কিন্তু একথা মানতে চাইবেন না। এমন কি ডেমোক্রিটাস পর্যন্ত শুরুতে বিশ্বাস করতেন যে মানুষের মন সূক্ষ্ম ও মসৃণ পরমাণু দিয়ে তৈরি।

দর্শন-হিসাবে জড়বাদের আলোচনা মোটেই আমাদের উদ্দেশ্য নয়। জড়বাদ পদার্থবিজ্ঞানের উপর কিরকম প্রভাব ফেলেছিল সেটাই আমাদের দেখতে হবে। পদার্থবিদেরা যে জগৎ নিয়ে ব্যস্ত সেটা পরমাণু দিয়ে তৈরি এরকম একটা ধারণা ক্ষতিকর তো ছিলই না উপরন্তু কিছুটা সুবিধাজনকই ছিল। পরে সনাতনী পদার্থবিদ্যার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল পরমাণু ছাড়াও অন্য জিনিষের অস্তিত্ব আছে। বল এবং ক্ষেত্র (Field) এই দুটো জিনিষ পরমাণু না হয়েও পরমাণুর মতনই সমান প্রয়োজনীয়। ধরা যাক মাধ্যাকর্ষণের ক্ষেত্রের কথা। মাধ্যাকর্ষণজনিত ক্ষেত্রের মধ্য দিয়েই দুটো বস্তু পরস্পরকে আকর্ষণ করে। আগে অবশ্য এধরণের আকর্ষণকে দূরত্বের ক্রিয়া (Action at a distance) বলে ধরা হত।

এই সময় পরমাণু এবং তাদের ক্রিয়াকলাপ বিজ্ঞানীদের সকল নজর কেড়ে নিয়েছিল। এই রকম একটি মুহূর্তে নিউটনের আবির্ভাব ঘটল। দেখা গেল তাঁর উদ্ভাবিত নীতি অনুযায়ীই বলের ক্রিয়ায় পরমাণুদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। তাঁর সরল নীতি হল সমস্ত প্রাকৃতিক ঘটনা বলবিদ্যার আওতায় আনা যাবে কেননা ঘটনায় অংশ গ্রহণকারী বস্তুদের মধ্যে যে পরমাণুরা আছে তাদের গতি-বিধিকে সম্মিলিত করেই সব ঘটনার উদ্ভব।

এই হল পদার্থবিজ্ঞানের যান্ত্রিক ও জড়বাদী কর্মধারা। উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত কেউই এই ধারাকে সমালোচনা করতে পারেন নি। এই ধরণের মতবাদের আরেকজন উৎসাহী প্রবক্তা ছিলেন হাইগেন। এ ধরণের দৃষ্টিভঙ্গীতে কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানে কয়েকটি নতুন আবিষ্কারকে ব্যাখ্যা করা গেল না। সনাতনী

পদার্থ বিজ্ঞানের কাঠামোতে প্রচলিত যান্ত্রিক নিয়মতন্ত্রের পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা প্রকট হল।

আলোর সম্বন্ধে যান্ত্রিক মতবাদ

সপ্তদশ শতাব্দীতে এমন কোনো ঘটনা চোখে পড়েনি যা প্রচলিত ধারণার সঙ্গে অনৈক্য দাবী করতে পারে। হাইগেন নিজেও যে-সব পরীক্ষানিরীক্ষা করতেন তাদের ক্ষেত্রেও মোটামুটিভাবে যান্ত্রিক ব্যাখ্যাই কার্যকরী হত। আলো নিয়ে গবেষণা করতে তিনি ভালোবাসতেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল আলো এক অতি সূক্ষ্ম ও অদৃশ্য মাধ্যমের মধ্য দিয়ে স্থিতিস্থাপক তরঙ্গের আকারে চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হয়। আলো নিয়ে যে-সব পরীক্ষা তিনি করেছিলেন তার সবকটির ফলই তাঁর উপরোক্ত ধারণার সাহায্যে সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হয়েছিল। হাইগেন তাঁর ধারণার যথার্থতার সম্বন্ধে এতদূর বিশ্বাসী ছিলেন যে তিনি তাঁর বিশিষ্ট গ্রন্থ "Treaties on Light"-এ বলেন—

> "সত্যিকার দর্শনে যান্ত্রিক মতবাদই সব প্রাকৃতিক ঘটনার মূল কথা। আমরা যদি একথা ধরে না নিই তবে পদার্থবিজ্ঞানকে বোঝার সব আশাই আমাদের ছেড়ে দিতে হবে।"

এই উক্তিটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ যান্ত্রিক মতবাদ আজও পর্যন্ত তার অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। হাইগেনের উক্তির মূল বক্তব্য হল, যা কিছু উপলব্ধি করার প্রয়োজন তার সবকিছুর জন্যেই যান্ত্রিক মতবাদের সাহায্য নিতে হবে। পরে অবশ্য এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে এটা কেবল একটি অন্ধ বিশ্বাসমাত্র। তবুও ধারণাটির মধ্যে এমন একটি কার্যকারিতা ছিল যে তার অনুগামীর সংখ্যা বড়ো কম ছিল না। এই অন্ধ অনুগামীরা যান্ত্রিক মতবাদ ভিন্ন অন্য কোন মতবাদকে কোনরকম আমলই দিতে চাইতেন না।

কিছু সময় পর্যন্ত পদার্থবিজ্ঞানের যান্ত্রিক মতবাদ কোনো অসুবিধার সৃষ্টি করে নি। বস্তুত পদার্থবিজ্ঞানের বেশ কয়েকটি শাখায় এর ব্যবহার খুবই সফল হয়েছে। এসব শাখার অন্যতম হল আলোকতত্ত্ব। আলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে হাইগেনের যান্ত্রিক মতবাদ বিষয়টির অগ্রগতিতে অনেক সাহায্য করেছে। পরে অবশ্য আলোর এই যান্ত্রিক স্বরূপটি অস্বীকৃত হয়। ম্যাক্স্ওয়েল প্রমাণ করেন আলোক-তরঙ্গ প্রকৃতিতে তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ। এখানে মনে রাখতে হবে যে এমন কোনো অভিজ্ঞতা হাইগেনের হয়নি যার থেকে আলোর তড়িৎচুম্বকীয় স্বরূপের কথা তাঁর মনে আসতে পারে।

একটি ভৌত তত্ত্ব থেকে কি আশা করা হবে সে সম্বন্ধে হাইগেনের ধারণা ছিল অত্যন্ত পরিষ্কার। তাঁর মত ছিল—যে নীতির উপর কোনো তত্ত্ব নির্ভর করে তাকে তখনই মাত্র পরীক্ষিত বলা যাবে যখন দেখা যাবে তত্ত্বটি অভিজ্ঞতালব্ধ অন্যান্য সকল ঘটনাকেই ব্যাখ্যা করতে পারে। এই মতটি আরও ফলপ্রসূ যখন পরীক্ষালব্ধ ফলের সংখ্যা অনেক। যদি কেউ দেখে যে কল্পনায় যে জিনিসটা আশা করা হচ্ছে কার্যক্ষেত্রেও তাই-ই পাওয়া যাচ্ছে তবে তার থেকে বেশি উৎসাহ-ব্যঞ্জক আর কি হতে পারে?

যে কোনো তত্ত্বের কাছে পদার্থবিজ্ঞান এই আশাই করে যে তার দ্বারা ভবিষ্যদ্বাণী করা যাবে। এই হিসাবে হাইগেনের আলো সম্বন্ধে যান্ত্রিক মতবাদ সম্পূর্ণ ঠিক বলতে হবে কারণ এর সাহায্যে আলোক সংক্রান্ত সকল অভিজ্ঞতার একটি সুষ্ঠু ব্যাখ্যা পাওয়া গিয়েছিল। শুধু তাই নয়—হাইগেন তার তত্ত্বের উপর নির্ভর করে যে সব ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন পরীক্ষাদ্বারা তারা সুপ্রমাণিত হয়েছে। অবশ্য সত্যি যে আলোক সম্বন্ধে হয়ত সকল পরীক্ষার ফলাফল তাঁর প্রস্তাবিত তত্ত্বের আলোকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়নি বা হবে না। কিন্তু এ ঘটনা তো যে কোনো তত্ত্বের বেলাতেই ঘটতে পারে, কারণ সব তত্ত্বের ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে বিশেষ কয়েকটি ঘটনাকে ব্যাখ্যা করার জন্যেই একটি তত্ত্বের উদ্ভব এবং এই হিসাবে যেকোন তত্ত্বই ব্যাপক নয়। ভবিষ্যতে এমন সব ঘটনা নজরে আসতে পারে যাতে অধুনা প্রচলিত যে কোনো তত্ত্বের পূর্ণ বা আংশিক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেবে এবং এর জন্য মনকে উন্মুক্ত রাখাই প্রগতিশীল চিন্তা হবে।

এ্যালেমবার্ট

ফরাসী দার্শনিক এ্যালেমবার্ট নিউটনের সূত্র অবলম্বন করে কয়েকটি উপপাদ্য খাড়া করলেন যেগুলো বলবিদ্যাকে আরও শক্তিশালী করে তুলল। অনেকগুলি বল কোনো বস্তুর উপর সক্রিয় থাকলে তার গতি-প্রকৃতি বা স্থিরতা নির্ধারণের কাজে এ্যালেমবার্টের সূত্রগুলি প্রভূত সাহায্য করে। এ্যালেমবার্ট যান্ত্রিক জড়বাদের উদ্গাতাদের মধ্যে একজন। তিনি জড়বাদের দার্শনিক দিক নিয়ে অনেক আলোচনা করেছেন নানান প্রবন্ধে। যে জিনিসগুলো আমরা প্রতিদিন দেখতে পাই—যাদের আমরা অনুভব করতে পারি তাদেরই আমরা ব্যাপকভাবে প্রকৃতি বলে থাকি। এ্যালেমবার্ট দেখান কী ভাবে এই সহজলভ্য অনুভূতি থেকে শুরু করেই পদার্থবিদ্যা প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করতে পারে।

এ্যালেমবার্টের মতে পদার্থবিদের কর্তব্য হল সকল ঘটনা সম্পর্কে একটি বিমূর্ত ভাবধারা গ্রহণ করা যাতে করে সবকিছুকে তার পর্যবেক্ষণের রীতিনীতির

আওতায় আনা যায়। বর্ণ গন্ধ স্বর ইত্যাদি জিনিসগুলিকে তিনি কঠোরভাবে পরিহার করেছিলেন। আগেই বলা হয়েছে এসব জিনিস একান্তই ব্যক্তি-নির্ভর এবং এদের সম্বন্ধে কোনো চিন্তা একমানুষ থেকে অন্য মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেওয়া যায় না। প্রাকৃতিক নিয়মে এদের কোন ভূমিকা নেই। কিন্তু কোনো ক্ষেত্রে এদের উপস্থিতিকে অগ্রাহ্যও করা যায়নি। তখন এদের সম্বন্ধে বাধ্য হয়ে বিজ্ঞানকে এমন উপায় উদ্ভাবন করতে হয়েছে যাতে সংখ্যার সাহায্যে এদের প্রকাশ করা যায়। রঙ এবং স্বরকে কম্পন সংখ্যার সাহায্যে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। এর ফলে রঙ আর স্বরের সম্বন্ধে ধারণাগুলো আর কেবলমাত্র ব্যক্তিনির্ভর থাকছে না। এ্যালেমবার্টের মতে মানুষ প্রকৃতির সব ঘটনার বহিরঙ্গ খোলসটাকে সরিয়ে অন্তরঙ্গ চেহারাটা খুঁজে পাবার জন্য ইচ্ছে করেই বিমূর্ত চিন্তাধারার আশ্রয় নেয়। এই অন্তরঙ্গ রূপটিই হলো পর্যবেক্ষণযোগ্য ঘটনাগুলোর মূল কাঠামো। এ্যালেমবার্ট প্রায় দুশো বছর আগে এমন ধারণার উল্লেখ করেছেন যা পরবর্তীকালে কোয়াণ্টাম মতবাদের উন্নতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে।

পরমাণু তত্ত্বের ক্রমোন্নতি

দুটি পরমাণুর সংযোগকারী বলের চেহারা বর্ণনা করার জন্যে ষোড়শ শতাব্দীর রসায়নবিদেরা পরমাণুকে উপাঙ্গবিশিষ্ট (Appendge) বস্তু হিসাবে চিন্তা করেছিলেন। তাঁদের মতে এই উপাঙ্গের সাহায্যে একটি পরমাণু আরেকটি পরমাণুর সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। সত্যি কথা বলতে কি এই ধারণা দিয়ে দুটো পরমাণুর সংযুক্তিকে ব্যাখ্যা করা খুবই সহজ। এ ধরণের একটি অতি সরল চিত্রের উপস্থিতিতে বিজ্ঞানীরা অন্য কোনো জটিল চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেননি বা সাহস পাননি।

নিউটন সর্বপ্রথম আবিষ্কার করলেন গ্রহনক্ষত্র পরস্পরকে আকর্ষণ করে। মাধ্যাকর্ষণের সাহায্যে স্পষ্টতই পরস্পরকে কাছে টানার জন্যে তাদের কোনো উপাঙ্গের প্রয়োজন হচ্ছে না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে কোনো কিছুর মধ্যস্থতা ছাড়াই দুটি বস্তুর মধ্যে আকর্ষণ বজায় থাকছে। স্বাভাবিক ভাবেই ধরে নেওয়া যাবে যে পরমাণুসহ সকল বস্তুর মধ্যে এ ধরণের আকর্ষক বল বজায় আছে। এক্ষেত্রে পরমাণুদের আর উপাঙ্গ থাকার প্রয়োজনীয়তা থাকছে না এবং তাদের মসৃণ গোলাকার বস্তু হিসাবে ভাবতেও কোনো বাধা নেই। বাস্তবিকই এটা একটা বিরাট সরলীকরণ।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কিছু বিজ্ঞানী আরেক ধাপ এগিয়ে গেলেন।

তাঁরা বললেন পরমাণুদের কোন বিস্তৃতি নেই—তারা বলের নিছক কেন্দ্রবিন্দু মাত্র। এইভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীতে পরমাণু তার পরিচিত গুণাবলীর কিছুটা হারাতে শুরু করল। এর পরে পরমাণু চিন্তায় কোয়াণ্টাম মতবাদ যে পরিবর্তন আনল তা আরও বেশি বৈপ্লবিক। এই মতবাদে মৌলিক কণাদের বিস্তৃতি আছে কিনা কিংবা তারা কেবলমাত্র এক একটি বিন্দু কিনা এ ধরণের প্রশ্নগুলি একেবারেই সংগত নয়। এর কারণ হল এমন কোনো পরীক্ষা সম্ভব নয় যাতে মৌলিক কণাদের বিস্তৃতি সম্বন্ধে সঠিক তথ্য জানা যায়। এর সঙ্গে যুক্ত হল আর একটি তত্ত্ব : এমন কোনো বিশেষ ধরণের সত্তা মৌলিক কণাদের আরোপ করা যাবে না যা সকল সময়ে অপরিবর্তিত থাকবে।

নতুন আরেকটি নিয়ম আবিষ্কারের ফলে মৌলক কণাদের যে সব স্বকীয়ত্ব কল্পনা করা হোতো তাদের হারাতে হলো। এই নিয়মটি হল অনিশ্চয়তাসূত্র (Uncertainly principle)। এই সূত্রটি নিয়ে পরে আরো আলোচনা হবে। এই সূত্রের তাৎপর্য হল এই যে, যখন কোনো মৌলিক কণার গতিসংক্রান্ত কোনো তথ্য জানার অবকাশ নেই বলে ধরা হবে (অর্থাৎ স্থির) তখনই কেবলমাত্র মৌলিক কণাদের অবস্থান সুনিশ্চিতভাবে বলা যাবে। এই বিশেষ অবস্থা ব্যতিরেকে আর কোনো অবস্থায় মৌলিক কণাদের তাৎক্ষণিক অবস্থিতি কখনই সুনিশ্চিতভাবে বলা যাবে না। এটা কিন্তু কোনো ব্যক্তি বিশেষ বা কোনো পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির ত্রুটি নয়। এ অনিশ্চয়তা প্রকৃতি কর্তৃক আরোপিত। এর ফলে বিশেষ অবস্থা বাদে যে কোনো পর্যবেক্ষণেই এই সহজাত অনিশ্চয়তা থেকেই যাবে। স্থাননির্ণয়ের এই সহজাত অনিশ্চয়তা সাধারণ চিন্তাধারার আওতায় আসে না।

পদার্থবিদ্যার প্রাচীন ভাবধারা ও বর্তমান যুগের কোয়াণ্টাম মতবাদের চিন্তাধারার তুলনামূলক বিচারকালে আমরা দেখতে পাই যে পুরাতন পদার্থবিদ্যাতেও প্রকৃতির রহস্য উন্মোচন করার জন্য বিমূর্ত ভাবধারার প্রবর্তন করতে হয়েছে। কিন্তু দীর্ঘ পরিচিতির জন্যে এই বিমূর্ততা লোকের কাছে আর ততখানি প্রকট ঠেকছে না। কিন্তু আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানের বিমূর্ত ভাবধারা মানুষের কাছে ব্যাপক লাগছে এই কারণে যে মৌলিক কণাদের সূক্ষ্ম জগতে তাদের পূর্ব পরিচিত বিমূর্ত ভাবধারাকে আর যুক্তিগ্রাহ্যভাবে ব্যবহার করতে পারা যাচ্ছে না তার ফলে তাদের পরিহার করে নতুন বিমূর্ত ভাবধারা প্রণয়ন করতে হচ্ছে। ভবিষ্যতে দীর্ঘ পরিচিতির ফলে হয়ত কোয়াণ্টাম মতবাদের এই বিমূর্ততাও মানুষের কাছে সহজ হয়ে আসবে।

আলোর তরঙ্গবাদ

পদার্থবিজ্ঞানে যান্ত্রিক জড়বাদের কথায় আবার ফিরে আসা যাক। এই

মতবাদ অনুযায়ী প্রকৃতিতে যাবতীয় জিনিস যান্ত্রিক ধারণার সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যাবে। এই বিশ্বাসের আওতা থেকে পদার্থবিদ্যাকে বহুদিন মুক্ত করা যায়নি। এই বিশ্বাস দীর্ঘদিন স্থায়িত্ব লাভ করেছিল কারণ যে-সব পরিণতির কথা এই মতবাদ পূর্বে থেকেই ঘোষণা করেছিল তাদের সবকটিই পরে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছিল। উদাহরণ স্বরূপ আলোর প্রসঙ্গে ফিরে আসা যেতে পারে। হাইগেন যখন দেখালেন যে আলো তরঙ্গাকারে পরিব্যাপ্ত হয় তখনই আলোকতত্ত্বর একটি যান্ত্রিক ব্যাখ্যা পাওয়া গেল। তাঁর এই মতবাদের পেছনে কয়েকটি নিজস্ব অভিজ্ঞতা কাজ করেছিল এবং মতবাদটি সম্পূর্ণভাবে কখনই স্বীকৃত হয়নি।

এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটল যখন ফরাসী পদার্থবিদ ফ্রেনেল আলো নিয়ে গবেষণা শুরু করলেন তিনি দুটি আলোকরশ্মির ব্যতিচার (Interference) ও আলোকরশ্মির ব্যাবর্তন (Diffraction)—এই দুই বিষয়ে গবেষণা করে যে ফল লাভ করলেন তাতে আলোর তরঙ্গধর্মী চরিত্রটি পরিষ্কারভাবে প্রতিষ্ঠিত হল। তিনি দেখালেন দুটি আলোর রশ্মির ব্যতিচার কেবল যে বর্ধিত আলো সৃষ্টি করবে তা নয় ব্যতিচার সম্পূর্ণ অন্ধকারও সৃষ্টি করতে পারে। আলোকরশ্মির এই অত্যাশ্চার্য ব্যবহার ব্যাখ্যা করা সম্ভব হবে যদি আমরা আলোকে তরঙ্গ হিসাবে চিন্তা করি। একটি তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের মধ্যে সব সময় একটি তরঙ্গ-শীর্ষ (Crest) ও একটি তরঙ্গপাদ (trough) থাকে। যদি কোনো স্থানে একটি তরঙ্গের তরঙ্গশীর্ষ অপর তরঙ্গের তরঙ্গপাদের উপর পতিত হয় তবে সেইস্থানে তার মিলিত ফল হবে অন্ধকার।

এখন প্রশ্ন হল যে এইসব পরীক্ষা কি তরঙ্গগুলির যান্ত্রিকস্বরূপ প্রমাণিত করে? এই স্বরূপটি সন্দেহ করার মত কোনো কারণ অবশ্য ফ্রেনেলের মনে আসেনি। তাঁর সময়ে তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ সম্বন্ধে কোনো ধারণা প্রচলিত ছিল না বরং কোনো স্থিতিস্থাপক মাধ্যমকে কোনো প্রকারে বিক্ষুব্ধ করলে তাতে যান্ত্রিক তরঙ্গের সৃষ্টি হয়—এ তথ্য অনেকেরই জানা ছিল। অন্য কোনো ধরণের তরঙ্গের কথা লোকের মনেই আসেনি। ফ্রেনেল যে কেবলমাত্র একজন দক্ষ পর্যবেক্ষক ছিলেন তা নয় একজন উঁচুদরের তাত্ত্বিক বিজ্ঞানীও ছিলেন। তখনকার দিনে আলোর সম্বন্ধে যে সব তথ্য মানুষের জানা ছিল তাদের সকলকে স্থিতিস্থাপক মাধ্যমে যান্ত্রিক তরঙ্গ হিসাবে ব্যাখ্যা করতে তাঁর মোটেই অসুবিধা হয়নি।

আজ পরিষ্কার হয়ে গেছে যে আলো যান্ত্রিক তরঙ্গ নয় তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ। সুতরাং এই ভেবে অনেকেই আশ্চর্য হবেন যে আলোর সঠিক চরিত্র না জেনেও ফ্রেনেল কিভাবে আলো সম্পর্কে সব নির্ভুল সিদ্ধান্তে এলেন। এ থেকে কি আমরা

এই কথা মেনে নিতে পারি যে, কোনো নির্ভুল সিদ্ধান্তে আসতে গেলে আলোর প্রকৃত সত্ত্বা কি সেটা না জানলেও চলবে ? আগেই পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে যখন একজন পদার্থবিদ্ কোনো ঘটনাবলী অনুসন্ধান করেন, তখন তাঁর কাছে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় তাদের অন্তর্নিহিত মূল কাঠামোটি খুঁজে বার করা। ঘটনাবলীর মধ্যে যেগুলো পরিমাপযোগ্য নয় বা যাদের সংখ্যার দ্বারা পরিচিত করা যায় না তাদের বাদ দিলে যে জিনিস পড়ে থাকে সেটাই ঘটনাগুলোর মূল কাঠামো। এই মূল কাঠামোটির বিভিন্ন পরিমাপযোগ্য রাশির মধ্যে এক বা একাধিক গাণিতিক সম্পর্কের অস্তিত্ব থাকে। এইগুলিই আলোচিত ঘটনাগুচ্ছের মধ্যেকার নিয়ম বলে পরিচিত হবে। ঘটনাগুচ্ছের পেছনের মূল কাঠামোটি খুঁজে বার করতে কাঠামোর পেছনে কি আছে তা জানার দরকার নেই। এর কারণ হল যা পরিমাপ করা যায় না পদার্থবিদ্‌রা তার সম্বন্ধে চিন্তিত নন।

আলোসংক্রান্ত উপরের কথাগুলি থেকে অনেক কিছু শেখার আছে। সময় ও স্থানের সঙ্গে সঙ্গে আলোর ঔজ্জ্বল্য কিভাবে পরিবর্তিত হবে—এই পরিমাপযোগ্য ব্যাপারটির সঙ্গে ফ্রেনেল খুবই পরিচিত ছিলেন। তিনি খুব সতর্কতার সঙ্গে—পরিমাপ করে দেখতে পান যে এই ঔজ্জ্বল্য এমন একটি নিয়ম মেনে চলে যা স্থিতিস্থাপক মাধ্যমে যান্ত্রিক তরঙ্গ প্রবাহের বেলাও খাটে। অন্য ভাষায় একটি তরঙ্গের যে রকম প্রকৃতি আলোর প্রকৃতিও সেই রকম। তাই তিনি সরলভাষায় বল্‌লেন আলো তরঙ্গ ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি আলোর অন্যান্য যে-সব তথ্য জানতেন তাদের প্রত্যেককে তরঙ্গবাদের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা গেল। যদি দেখা যায় দুটি পৃথক পৃথক ঘটনার মূল কাঠামোটি এক তবে পদার্থবিদদের চোখে তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

তাহলে এই প্রশ্ন উঠতে পারে যে কেন আলোর যান্ত্রিক মতবাদকে তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের অনুকূলে ত্যাগ করা হল ? এর উত্তরে বলা যেতে পারে, পরীক্ষা করে দেখা গেল স্থিতিস্থাপক তরঙ্গের সঙ্গে আলোক তরঙ্গের অনেক মিল থাকলেও এই মিলকে কোনোমতেই সম্পূর্ণ বলা চলে না। আলোর এমন কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ল যারা স্থিতিস্থাপক তরঙ্গে অনুপস্থিত এবং আলোককে তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ হিসাবে চিন্তা করলে ঐ বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। আলো যে তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ এই ধারণা সম্পূর্ণ সত্য। যাদের সহায়তায় বোঝা যায় যে আলো তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ ছাড়া আর কিছুই নয় তাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো ম্যাক্সওয়েল আবিষ্কৃত আলোর প্রতিসরাঙ্কের (Refractive index) সঙ্গে কয়েকটি তড়িৎচুম্বকীয় রাশির মধ্যেকার সম্পর্কটি।

গ্যাসের অণুগতিতত্ত্ব (Kinetic theory)

যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আলোর ব্যাখ্যা বাতিল হয়ে যাবার পর তাপবিজ্ঞানই কেবলমাত্র এই মতবাদ প্রয়োগের একমাত্র ক্ষেত্র হয়ে রইল। এর কারণ হল তাপ-সম্ভূত ঘটনাসমূহ অনুপরমাণুদের বিক্ষিপ্ত গতিবিধির আলোকে সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়। এই ব্যাখ্যা আরও মূল্য পেল যখন মেয়ার এবং হেলমোজ নামে বিজ্ঞানীদ্বয় দেখলেন যে তাপ কোনো বস্তু বিশেষ নয়—এটা শক্তিরই একটি রূপ। এটা প্রমাণিত হবার সঙ্গে সঙ্গে গ্যাসের অণুদের দলবদ্ধভাবে ভ্রাম্যমাণ একদল মশকের সঙ্গে তুলনা করা গেল। এই ইতস্ততঃভাবে ভ্রাম্যমাণ অণুগুলি তাদের যে পাত্রে রাখা হয়েছে সেই পাত্রের গায়ে আঘাত করে ও প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে। এই আঘাতে ভরবেগের পরিবর্তন হয় আর এই জন্যই পাত্রের গায়ে চাপ পড়ে। যদি অনুমান করা হয় যে অনুদের ইতস্ততঃ গতিবিধির তীব্রতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গ্যাসের উষ্ণতা বৃদ্ধি পাবে তাহলে যে-সব ঘটনা তাপের উপর নির্ভর করে তাদের সহজেই ব্যাখ্যা করা চলে। গ্যাসের অনুগতিতত্ত্বের এই চমকপ্রদ সাফল্য আজও বজায় আছে। কোনো ঘটনা ব্যাখ্যা করার এটি এক সুষ্ঠু উদাহরণ এবং এর উদাহরণ দিয়ে আজও আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের সমর্থকদের প্রায়শঃই হেয় করা হয়।

অণুগতিতত্ত্বের এই লক্ষণীয় গুণটির মূলকথাটি হল এই তত্ত্বের মধ্যে বিমূর্ত ভাবধারা সন্তোষজনকভাবে কম। এর ব্যাখ্যা করার নীতিটি এমনই যে, মনে হয় সব ঘটনাই যেন স্বাভাবিক প্রয়োজনীয়তা থেকে ঘটছে। কোনো পাত্রের গায়ে গ্যাস যে চাপ দেয়, গ্যাসের উষ্ণতা বাড়িয়ে দিলে কিংবা পাত্রের আয়তন কমিয়ে দিলে সেই চাপের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। অনুগতিতত্ত্ব, এর খুব সঙ্গত কারণ দেখাতে সক্ষম। পাত্রের দেওয়ালে অণুদের ধাক্কা লাগার ফলেই চাপের উদ্ভব। উষ্ণতা বাড়ালে এই আঘাতের তীব্রতা বৃদ্ধি পায় ফলে চাপও বাড়ে, পক্ষান্তরে আয়তন কমানোর অর্থ হল আঘাতের সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়া আর তার ফলই হল চাপের পরিমাণ বৃদ্ধি।

এই ধরণের ব্যাখ্যা খুবই সঙ্গত। যাদের পদার্থবিজ্ঞানের সঙ্গে সরাসরি কোনো যোগ নেই তাঁরাও এতে সন্তুষ্ট হবেন। হাইগেনের কথায় মানুষকে যদি পদার্থবিজ্ঞান বোঝার আশা ছাড়তে না হয় তবে সকল প্রাকৃতিক ঘটনার কারণগুলি যান্ত্রিক মতবাদের মধ্যে অঙ্গীভূত থাকবে। এই কথার মূল সূত্রটির সঙ্গে গ্যাসের অনুগতিতত্ত্ব সম্পূর্ণ সংগতি রেখে চলছে।

প্রকৃতপক্ষে যান্ত্রিক মতবাদ তাপসম্ভূত ঘটনাগুলোর অন্তর্নিহিত চেহারা সম্বন্ধে কোনো ধারণা দেয় না কেবল ঘটনাগুলি কল্পনীয় করে তোলে। অনুভূতির

সাহায্যে কোনো জিনিস জানার চেষ্টাতে মানুষকে ঠকতেও হতে পারে। না হলে হাইগেনের মত তীক্ষ্মধী লোক ভুলের শিকার হবেন কেন এবং তাঁর একশ বছর পরেই আলোক তত্ত্বটির যথাযথ ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যাবে কেন ?

বেশির ভাগ মানুষই অনুভব করে যে কোনো ঘটনা যদি যান্ত্রিক হয় তবে তা অনুভূতির সাহায্যে সহজেই বোঝা যাবে। এর কারণ হচ্ছে তাদের একধরণের অন্ধ বিশ্বাস আছে যে, যে ঘটনা বারে বারে সংঘটিত হয় তারা বরাবর একই নিয়মে সংঘটিত হবে। যদি একটি বল দেওয়ালে ধাক্কা লেগে ফিরে আসে তাহলে আমরা নিশ্চিত ধরে নিই যে দেওয়ালটি একটি চাপ অনুভব করবে। কারণ এটাই আমাদের বহুকালের অভিজ্ঞতা। এর বিকল্প কোনো চিন্তা তর্কের খাতিরে সম্ভব হলেও আমরা তা মানতে রাজী নই।

ক্রমশঃ প্রতীয়মান হচ্ছে যে অনুভূতিকে কখনই অভ্রান্ত মনে করলে চলবে না। অবশ্য অণুগতিতত্ত্বকে পুরোপুরি অর্থহীন মনে করা সমীচীন হবে না। কোনো একটি তত্ত্বের উদ্দেশ্য হলো দৃশ্যমান ঘটনাগুলো থেকে কতকগুলি প্রাকৃতিক নিয়ম খুঁজে বার করা। প্রাকৃতিক নিয়মের সংখ্যা যত কম হবে, একটি তত্ত্ব ততই ভালো বলে সমাদর পাবে। দুই প্রতিযোগী তত্ত্বের মধ্যে যার মধ্যে কম প্রাকৃতিক নিয়ম আছে সেই তত্ত্বই বেশি সুবিধাজনক।

তাপবিজ্ঞানে দুটো প্রতিযোগী তত্ত্ব হল তাপগতি-বিজ্ঞান (Themo dynamis) ও গ্যাসের অণুগতি তত্ত্ব। একটি ব্যাপারে দুটির মধ্যে মিল আছে কেন না এরা উভয়েই তাপকে শক্তি হিসাবে দেখে। প্রথম তত্ত্বটি তাপশক্তির কোনো বিশেষ স্বতন্ত্র রূপের কথা চিন্তা করে না অন্যদিকে অণুগতিতত্ত্বতে অণুপরমাণুদের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত গতিকে তাপশক্তির উৎস বলে ধরা হয়। অণুগতিতত্ত্ব কিছুটা শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করতে পারে এই হিসাবে যে সে বহু ঘটনাকে ব্যাখ্যা করতে পারে অল্প কয়েকটি নিয়মের সাহায্যে। তাপগতি বিদ্যায় প্রয়োজনীয় কয়েকটি নিয়ম অণুগতিতত্ত্বে অবশ্য অপ্রয়োজনীয় হয়ে যায়।

গ্যাসের চাপ আয়তন ও উষ্ণতার মধ্যে যে গাণিতিক সম্বন্ধ পাওয়া যায় তাকে আমরা অবস্থার সমীকরণ বলে থাকি। তাপগতিবিদ্যার ধারণা অনুযায়ী এই সমীকরণটি অন্য কোনো ধারণা থেকে জানা যায় না। এই হিসাবে তাপগতি বিদ্যায় এর একটি স্বাতন্ত্র্য আছে। অন্যদিকে অণুগতিতত্ত্ব কতকগুলি যান্ত্রিক নীতির সাহায্যে অবস্থার সমীকরণটি প্রমাণ করতে সক্ষম। ফলে অণুগতিতত্ত্বের দিক থেকে অবস্থার সমীকরণ এককভাবে আলাদা একটি নিয়ম নয়। বরং বলা যেতে পারে অনেকগুলি আলাদা আলাদা নিয়মের একটি সামগ্রিক চেহারা।

অণুগতিতত্ত্ব তাপগতিবিদ্যার থেকে অনেকবেশি ফলপ্রসূ। অণুগতিতত্ত্বের

সাহায্যে বিভিন্ন ধরণের গ্যাসের আপেক্ষিক তাপের সঠিক মান নিরূপণ করা যায় যা তাপগতিবিদ্যার সাহায্যে সম্ভব নয়। সাফল্যের মাপকাঠিতে অণুগতিতত্ত্ব তাপগতিবিদ্যাকে কিছু অতিক্রম করে গেছে। সুতরাং গ্যাসের অণুগতিতত্ত্বের মধ্যে যান্ত্রিক মতবাদ সম্পূর্ণ সাফল্য দাবি করতে পারে।

অণুগতিতত্ত্বের নিয়মগুলি পারিসাংখ্যিক (Statistical)

তাপকে যান্ত্রিক শক্তি হিসাবে প্রমাণিত করা ছাড়াও অণুগতিতত্ত্বের আরও কয়েকটি অবদান আছে। নিশ্চিত ভাবে বলা যায় যে, তাপ যে যান্ত্রিক শক্তি এটা অণুগতিতত্ত্বের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য। অবশ্য অচিরেই এর মধ্যেও কিছু অসংগতি লক্ষ্য করা গেল। যদি কোনো পার্থিব জিনিসকে বলবিদ্যার মুখ্য নিয়মগুলোর সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত করতে হয় তাহলে তার প্রাথমিক অবস্থা নিশ্চিতভাবে জানতে হবে। এর অর্থ হল কোনো বস্তুর প্রাথমিক স্থান এবং গতিবেগ জানা থাকা চাই যাতে বস্তুটির পরবর্তী অবস্থাগুলি আগে থেকে নির্ণয় করা যায়। একটি দৃষ্টিগ্রাহ্য বস্তুর মধ্যে যে অসংখ্য অণু আছে তাদের গতিবেগ জানা সম্ভব নয়। সুতরাং দৃশ্যমান কোনো বস্তুর সম্বন্ধে যতই নিশ্চিত পর্যবেক্ষণ করা যাক না কেন বস্তুটির ভেতরে যে অণুজগৎ আছে তাদের গতিবিধি বহুরকমের হতে পারে। নিশ্চিত ভাবে কোনো একটি বিশেষ চেহারার কথা ভাবা যায় না। গতিবিধির এই যে ভিন্ন রূপ এর প্রত্যেকটির ভিন্ন ভিন্ন পরিণতি হতে পারে। এর অর্থ এই দাঁড়াল যে কোনো বস্তুর প্রাথমিক অবস্থা নিশ্চিতভাবে জানা থাকলেও ভবিষ্যৎ অবস্থাটা কী দাঁড়াবে সেটা নিশ্চয় করে বলা যায় না।

একটি প্রারম্ভিক অবস্থা থেকে নিশ্চিতভাবে পরবর্তী ঘটনাপরম্পরাকে নির্দেশ করতে পারে এ ধরণের চূড়ান্ত কোনো নিয়মের অস্তিত্ব বহুসংখ্যক অণুদের বেলায় ভাবা যায় না। এই কথাটি কিন্তু সনাতনী পদার্থবিদ্যায় সবকিছু সুনিশ্চিতভাবে নির্ধারণ করার ব্যাপারটাকে মোটেই অগ্রাহ্য করে না, শুধু মাত্র এটুকুই বলে যে অণুজগতের বেলায় ঘটনা পরম্পরা সম্বন্ধে কোনকিছুই সুনিশ্চিত করে বলা যায় না।

সাধারণতঃ মানুষের মনে এই বিশ্বাসই আছে যে, যে ভৌততত্ত্ব যত ভবিষ্যৎ নির্ধারণে সাহায্য করতে পারে সেই তত্ত্বই তত সফল। কোনো কিছুর অন্তর্নিহিত অবস্থা যদি অণুগতিতত্ত্ব নির্ধারণ করতে না পারে তবে সে সন্তোষজনক আখ্যা কী ভাবে পাবে? তাহলে একটি পথই খোলা থাকছে এবং সেটা হল রাশিবিজ্ঞানের (Statistics) সাহায্য নেওয়া। রাশিবিজ্ঞানের ধারণাকে কাজে লাগিয়েই কোয়ান্টাম মতবাদ গড়ে উঠেছে। ধরা যাক কোন একটি বস্তুর উপর অনেকগুলো

পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। প্রত্যেকটি পর্যবেক্ষণের সময় বস্তুটিকে একই প্রাথমিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা হচ্ছে এবং প্রতিবার ভিন্ন ভিন্ন পথে অবস্থান্তর ঘটানো হচ্ছে। এখন রাশিবিজ্ঞানের সহায়তায় কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যেতে পারে। যেমন,—কতবার কী সম্ভাব্যতা নিয়ে বস্তুটি একটি বিশেষ অবস্থায় উপনীত হচ্ছে। এর সঙ্গে উপরোক্ত পরিসংখ্যান কিভাবে সময়ের উপর নির্ভর করে তা যদি পরীক্ষার সাহায্যে নির্ণয় করা যায় তা হলে যে কোনো এক অবস্থা থেকে শুরু করে ভবিষ্যতে কী হবে তা বলা অসম্ভব হবে না। নিশ্চয়তার সঠিক অর্থ অনুযায়ী এটা হবে না। কারণ রাশিতত্ত্বের সাহায্যে বস্তুটির এক প্রাথমিক অবস্থা থেকে অপর একটি বিশেষ অবস্থান্তরে যাবার সম্ভাব্যতা কত কেবল সেটাই জানা যাবে। এর অর্থ হল পরিচিত কার্যকারণ সম্বন্ধের পরিবর্তে পারিসাংখ্যিক কার্যকারণ সম্বন্ধই প্রাধান্য পাবে।

গ্যাসের অণুগতিতত্ত্ব পারিসাংখ্যিক। কারণ, এ কোনো ঘটনা সম্বন্ধে স্থির নিশ্চয়তা আরোপ করে না বরং সম্ভাব্যতার কথাই বলে। বলে রাখা ভাল যে নিশ্চিত কার্যকারণ সম্বন্ধের অনুপস্থিতির অর্থ এই নয় যে তাকে অস্বীকার করা হচ্ছে। অণুদের গতিবিধি যে বলবিদ্যার নির্ধারিত নিয়মেই হয় এবং সঠিক-ভাবে তা নির্ণয় করা যায় এই সত্যটি কেউ অস্বীকার করে না। কিন্তু প্রত্যেক অণুর গতিপ্রবাহকে আলাদা করে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। সেই কারণে পদার্থবিদ্যা খানিকটা বাধ্য হয়েই রাশিবিজ্ঞানের সাহায্য নিয়েছে। এতদিন পদার্থবিজ্ঞান এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গীর আওতায় ছিল যা যেসব ঘটনা নির্দিষ্টভাবে জানা সম্ভব কেবল তাদের আলোচনাতেই কাজে লাগে।

ধরা যাক একটি লোক জীবনবীমা করতে চায়। বীমা কোম্পানীর পক্ষে লোকটি কদিন বাঁচবে সে কথা বলার কোনো উপায় নেই। সে আজকেও মরতে পারে আবার একশ বছরেও মরতে পারে। এই তথ্যের অভাব কিন্তু চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে কোনো বাধার সৃষ্টি করছে না। পরিসংখ্যান থেকে ঐ বয়সের লোকেদের জীবনকাল কতখানি হতে পারে সেটা ধারণা করা যেতে পারে এবং এর থেকে প্রিমিয়াম নির্ধারণও সহজ হয়ে যাবে। এই প্রক্রিয়ায় কোম্পানীকে হয়ত একবার ঠকতে হতে পারে কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সে লাভ করবে।

একটি অবস্থার সম্ভাব্যতা

যে কোন দৃশ্যমান অবস্থা অনেকগুলো একক এবং ভিন্ন ধরণের আণবীক্ষণিক অবস্থার (Microsopic State) সংযুক্তির ফলে তৈরি হয়। বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্যমান অবস্থার মধ্যে আণবিক অবস্থার সংখ্যাও বিভিন্ন। যে অবস্থার মধ্যে

বিশেষ একটি আণবীক্ষণিক অবস্থার সংখ্যা বেশি বস্তুটির পক্ষে সেই অবস্থাতেই যাওয়ার সম্ভাব্যতা তত বেশি। তাপগতিবিদ্যাতে এই ধরণের অবস্থাকে এনট্রপি (Entropy) নামে অভিহিত করা হয়। কোন বস্তুর এনট্রপি একটি সম্পূর্ণ গাণিতিক রাশি। তবুও রাশিটির ভৌত চরিত্র সম্বন্ধে কিছু ধারণা করা যেতে পারে।

আমরা অভিজ্ঞতা থেকে জানি যে, কোনো জিনিষকে পারিপার্শ্বিকের আওতা থেকে মুক্ত করলে তা সুশৃঙ্খল অবস্থা থেকে বিশৃঙ্খল অবস্থায় যেতে চায় এবং তার বিপরীত কখনই হয় না। যেমন গৃহস্থালীর জিনিসপত্র অগোছাল হয়ে পড়ে। বিশুদ্ধ কোন জিনিস অবিশুদ্ধ হয়ে পড়ে, তাপ ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। স্বাভাবিক ঘটনাপ্রবাহে এই ধরণের পরিবর্তনের বিপরীত কখনও লক্ষ্য করা যায় না। এনট্রপি কোন বস্তুর বিশৃঙ্খলার মাপকাঠি এবং সে জন্য সে সবসময় বাড়বার চেষ্টা করে।

তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র এই ধরণের অভিজ্ঞতারই সুসংহত বহিঃপ্রকাশ। এর বক্তব্য হল, যে পরিবর্তন নিজে থেকেই আসতে পারে সে সব পরিবর্তনে এনট্রপি হয় বাড়বে না হয় স্থির থাকবে, কোনো মতেই কমতে পারবে না। সুতরাং কোন বস্তুর বিশৃঙ্খল অবস্থা পরিবর্তিত হবে না। আর যদি হয় তবে তা বাড়বে বই কমবে না। জার্মান তাত্ত্বিক বিজ্ঞানী বোলজ্‌ম্যান দ্বিতীয় সূত্রটির একটি পারিসাংখ্যিক ব্যাখ্যা দেন। তিনি প্রমাণ করেন এনট্রপির সঙ্গে কোনো একটি অবস্থার সম্ভাব্যতার সঙ্গে সম্বন্ধে আছে। যত এই সম্ভাব্যতা বাড়বে তত এনট্রপিও বাড়বে। এইভাবে ভাবলে দ্বিতীয় সূত্রটি এইরকম দাঁড়াবে, কোন বস্তুর একটি বিশেষ অবস্থাকে পারিপার্শ্বিকের আওতা থেকে মুক্ত রাখলে তা বস্তুটির যে অবস্থায় থাকার সম্ভাব্যতা বেশি, সেই দিকে পরিবর্তিত হতে চাইবে। একটি পাত্রে রাখা কিছু গ্যাস এর ভাল উদাহরণ। মনে করা যাক সমস্ত গ্যাসটিকে পাত্রটির কোণায় জমা করা আছে এবং বাকি অংশ সম্পূর্ণ ভাবে ফাঁকা। এরূপ একটি অবস্থা কিন্তু খুব বেশি সম্ভাব্য নয়। সবচেয়ে সম্ভব হ'লো সমস্ত পাত্রটি জুড়ে গ্যাসের অস্তিত্ব, এর ফলে কোণায় রাখা গ্যাসটি অচিরেই চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে এবং সঙ্গে সঙ্গে এনট্রপিও বেড়ে যাবে। এদিক থেকে দেখলে তাপবলবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রটি একটি পরিসংখ্যান-নির্ভর নিয়ম। এর ব্যতিক্রম থাকলেও সে ব্যতিক্রমের সম্ভাবনা খুবই কম।

পারিসাংখ্যিক বলবিদ্যা (Statistical Mechanics) নিশ্চয়তাকে ত্যাগ করে সম্ভাব্যতার ধারণাকে অবলম্বন করল বেশী করে। এর উপর নির্ভর করে সমস্ত প্রাকৃতিক ঘটনার নবমূল্যায়ন করা হল। এই ধারণায় পৌঁছতে দেরী হ

না যে, কেবল মাত্র তাপবলবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রই নয়, দৃশ্যমান জগতের সকল নিয়মকে পরিসংখ্যানের পরিভাষার আওতায় আনা যাবে। এই যদি হয়, তবে সুনিশ্চিত কার্যকারণ সম্বন্ধ বলে কিছু থাকবে না এবং প্রত্যেক নিয়মের কিছু ব্যতিক্রম থাকলেও তাদের সংখ্যাল্পতা সবসময় নজর এড়িয়ে যাবে।

কোথায় আমরা তাহলে সুনিশ্চিত কার্যকারণ (causality) সম্বন্ধের অস্তিত্ব দেখতে পাব? আগে এই বিশ্বাসই ছিল যে অণুজগতের সকল ঘটনা একটা সুনিশ্চিত কার্যকারণ সম্বন্ধ মেনে চলে এবং সেই হিসাবে তাদের সবকিছু নিশ্চিতভাবে নির্ধারণযোগ্য। এই বিশ্বাসকে কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করা যায় নি এবং কোয়াণ্টাম মতবাদ আত্মপ্রকাশ করার আগেও লোকে পূর্বতন বিশ্বাসের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছিল। ১৯২২ সালে ফ্রানজ্ একস্‌নার বলেছিলেন—"আমাদের এটা ভোলা উচিত হবে না যে কার্যকারণ সম্বন্ধের নিয়মটি সম্পূর্ণভাবে অভিজ্ঞতালব্ধ। এই অভিজ্ঞতার উৎস হল দৃশ্যমান প্রাকৃতিক ঘটনা। অণুজগতের বেলায় এই নীতির প্রয়োগ করলে দেখা যাবে যে, অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে আর তাকে যাচাই করা যাচ্ছে না।"

পরিসংখ্যান বলবিদ্যা :

প্রত্যেকটি চাক্ষুষ বস্তু বা তন্ত্র (macroscopie system) অসংখ্য অণুপরমাণু দিয়ে তৈরী। এক গ্রাম অণু ভরের কোন বস্তুতে অণুর সংখ্যার $৬\cdot০২৩ \times ১০^{২৩}$। এক্ষেত্রে বলবিদ্যার সঠিক ও সার্বিক প্রয়োগ খুবই কঠিন কাজ। প্রত্যেকটি তন্ত্রেরই কতকগুলি ধর্ম আছে। যেমন—চাপ উষ্ণতা, এট্রপি ইত্যাদি। এগুলিকে তন্ত্রের বাহ্যিক ধর্ম বলা হয়। অপরদিকে যেসব উপাদানের সাহায্যে বস্তু তৈরী হয় সেই উপাদান কণাগুলির নিজস্ব ধর্ম, যেমন তাদের অবস্থান, ভরবেগ, শক্তি প্রভৃতি তন্ত্রের আণবীক্ষণিক ধর্ম (microscopic properties)। যে কোন স্থিতাবস্থায় তন্ত্রের বাহ্যিক ধর্মগুলির মান নির্দিষ্ট থাকে। যেমন, মনে করা যাক, একই গতিবেগের কতকগুলি অণুকে একটি আবদ্ধ পাত্রের মধ্যে রাখা হলো। প্রথম দিকে অণুগুলি পাত্রের যে কোন অংশে বেশী সংখ্যায় এবং কোন অংশে কম সংখ্যায় জমায়েত হতে পারে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে একই ভাবে কণাগুলির বণ্টন হয়। এর অর্থ হলো ঐ অবস্থায় সব জায়গায় একই আয়তনে একই সংখ্যক অণু থাকবে বা প্রত্যেক স্থানে ঘনত্ব সমান হবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে তন্ত্রের বাহ্যিক অবস্থার সংগে তার আণবীক্ষণিক অবস্থার যোগাযোগ রয়েছে।

পদার্থের বাহ্যিক ধর্ম পর্যালোচনা করবার একটি পদ্ধতি হলো পরিসংখ্যান

বলবিদ্যা (statiscal mechanics)। পরিসংখ্যান বলবিদ্যার সাহায্যে তন্ত্রের বাহ্যিক ধর্মকে আণবীক্ষণিক ধর্মের আলোকে ব্যাখ্যা করা যায়। অসংখ্য কণার সমাবেশে সময়ের সংগে সংগে প্রত্যেকটির অবস্থান ও গতিবেগ নির্ধারণ করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। একটি কণার ওপর আর সব কণাদের প্রযুক্ত বলের লব্ধি হিসাব করাও সম্ভব নয়। এই অসম্ভব কাজ কিছু পরিমাণে সম্ভব করা যায় পরিসংখ্যান বিদ্যার সাহায্যে। এখানে প্রথমেই একটি গড় অবস্থা ধরে নিয়ে ঐ অবস্থায় কণাটির থাকবার সম্ভাব্যতা হিসাব করা হয়। এই সম্ভাব্যতার সাহায্যে একটি বাহ্যিক অবস্থার জন্য কতগুলি আণবীক্ষণিক বিন্যাস সম্ভব তাও নির্ণয় করাই পরিসংখ্যান বলবিদ্যার লক্ষ্য।

ধরা যাক ছটি বাক্সের মধ্যে পনেরোটি কণাকে বণ্টন করা দরকার। অনুমান করা গেল যে ছটি বাক্স একই আয়তনের এবং আপাতদৃষ্টিতে কণাগুলি একই রকমের। কেবলমাত্র কোন বাক্সে কণা-সংখ্যার পরিবর্তন হলে তবেই চাক্ষুস বিচারে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে বলে ধরা যাবে। আণবীক্ষণিক বিচারে কণাগুলিকে আলাদা ভাবা হবে। দুই বা ততোধিক কণা এক বাক্স থেকে অন্য বাক্সে নিজেদের মধ্যে স্থান পরিবর্তন করলে আণবীক্ষণিক বিচারে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। উপরন্তু একই বাক্সে কোন একটি কণা স্থান পরিবর্তন করলে বা একই জায়গায় একটি কণাকে ঘুরিয়ে বসালেও আণবীক্ষণিক অবস্থার সূক্ষ্মতর পরিবর্তন সম্ভব। সবশেষে অনুমান করা হলো যে একটি বাক্সে যতগুলি ইচ্ছা কণা রাখা যেতে পারে। এই সর্ত সাপেক্ষে আণবীক্ষণিক বিন্যাস সংখ্যা স্থির করবার পদ্ধতি থেকেই 'সনাতনী পরিসংখ্যানের' উৎপত্তি।

সনাতনী পরিসংখ্যানের সংগে কোয়াণ্টাম পরিসংখ্যানের পার্থক্য আছে। কোয়াণ্টাম পরিসংখ্যানে আণবীক্ষণিক বিচারেও কণাগুলি অভিন্ন বিবেচিত হয়। বোস-আইনস্টাইন পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাক্সগুলিতে যতগুলি ইচ্ছা কণা রাখা যায়। ফার্মিডিরাক পরিসংখ্যান অনুযায়ী একটি বাক্সে একটির বেশী কণা থাকতে পারবে না। দেখা গেছে কিছু কিছু কণা (যেমন ইলেকট্রন, প্রোটন ইত্যাদি) ফার্মিডিরাক পরিসংখ্যান মেনে চলে আবার কিছু কিছু কণা (যেমন………… ফোটন ইত্যাদি) বোস আইনস্টাইন পরিসংখ্যান মেনে চলে। বলা বাহুল্য বোস-আইনস্টাইনের বোস হলেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু।

কোয়াণ্টাম মতবাদে পারিসাংখ্যিক কার্যকারণ সম্বন্ধ

বিজ্ঞানী এক্‌সনারের যে মতটির কথা উপরে বলা হল কোয়াণ্টাম মতবাদেও ঐ একই কথা বলা হয়েছে। কার্যকারণ সম্বন্ধের যে ধারণা সনাতনী পদার্থবিজ্ঞানে

আছে অণুজগতের বেলায় তাকে সম্পূর্ণ পরিহার করে পারিসাংখ্যিক নিয়মের প্রবর্ত্তন করাই কোয়াণ্টাম মতবাদের বৈপ্লবিক চিন্তাধারা। আগেই বলা হয়েছে যে এই নিয়ম নিশ্চিতভাবে কোনো জিনিষ বর্ণনা করতে পারে না ; কেবল কোনকিছুর সম্ভাব্যতার পরিমাপ করতে পারে। যেখানে বর্তমান অবস্থাকে সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায় না অথবা ভবিষ্যৎ নিরূপণের জন্য যেখানে সীমিত তথ্যের উপর নির্ভর করতে হয় সেখানে পারিসাংখ্যিক নিয়মই কার্যকর। দৃশ্যমান জগৎ থেকে অদৃশ্য অণুজগতে প্রবেশ করলে আমাদের পর্যবেক্ষণের প্রচলিত রীতিনীতি ক্রমশঃ স্থূল হয়ে পড়ে এবং একটি পরমাণুর ক্রিয়াকলাপ অনুধাবন করার ব্যাপারে ক্রমশঃ অযোগ্য হয়ে যায়। বোধ করি, এইজন্যে তাপ গতিতত্ত্বকে রাশিবিজ্ঞানের দ্বারস্থ হতে হয়েছিল।

কোয়াণ্টাম মতবাদকে যে রাশিবিজ্ঞানের সাহায্য নিতে হয়েছিল তার আরও কতকগুলি কারণ অবশ্য আছে। এদের অন্যতম হল মৌলিক কণাদের বেলায় স্থান ও ভরবেগ যুগপৎ নির্ণয়ের ব্যাপারে অনিশ্চয়তা। ১৯২৭ সালে এই কারণটিই সূত্রাকারে বর্ণনা করেন হাইজেনবার্গ। এই সূত্রটির অর্থ হল প্রকৃতিগতভাবে মৌলিককণাদের যুগপৎ প্রকৃত স্থান ও প্রকৃত ভরবেগ (Momentum) নির্ণয় করা অসম্ভব। এদের যান্ত্রিক বর্ণনা শতকরা একশ ভাগ নির্ভুল হ'তে পারে না। এই অনিশ্চয়তা পর্যবেক্ষণ রীতির চরম উন্নতি সাধন করলেও দূর করা যাবে না। বরঞ্চ পর্যবেক্ষণের কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রাদির সঙ্গে, যা পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে তার যে প্রতিক্রিয়া হবে সেটা পর্যবেক্ষণের ব্যাপারে আরও অনিশ্চয়তা এনে দিতে পারে।

অনিশ্চয়তার সূত্রটি পরে আবার বিশদভাবে আলোচিত হবে। কিভাবে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানে কার্যকারণ সম্পর্কটি কী নতুন ব্যাখ্যা লাভ করল সেটাই আগে আলোচনা করা যাক। সনাতনী পদার্থবিজ্ঞানে কিন্তু কার্যকারণ সম্বন্ধের সঙ্গে কোনো বিবাদ নেই। বোলজ্‌ম্যানের মত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বিজ্ঞানী ভাবতে পারেননি যে পরমাণুদের বেলায় কার্যকারণ সম্বন্ধের নীতিটি প্রযুক্ত হবে না। দৃশ্যমান জগতে আমরা কখনই একটি পরমাণু দেখতে পাই না। বরং বহু পরমাণুর মিলিত ফলটিই দেখতে পাই। এই ধরণের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াগুলো কার্য-কারণ নীতিতে চালিত হয় না—হয় পারিসাংখ্যিক নিয়মে। সুতরাং সনাতনী পদার্থবিজ্ঞানের দাবী অনুযায়ী এই বিশ্বে কার্যকারণ রীতি নিয়ন্ত্রিত একটি কাঠামো আছে ঠিকই, কিন্তু পর্যবেক্ষণের অসম্পূর্ণতার দরুণ এই কাঠামোটি আমাদের দৃষ্টির আড়ালেই থেকে যায়। অপরদিকে অণুজগতে কার্যকারণ নীতিকে অস্বীকার ও পরিহার করে কোয়াণ্টাম মতবাদ তার ভাবধারাতে আরও মৌলিকত্ব আরোপ করেছে।

কোয়াণ্টাম মতবাদ কার্যকারণ নীতিকে পরিহার করার পেছনে যুক্তি হিসাবে তথ্যের অসম্পূর্ণতাকে খাড়া করিয়েছে। এখানে অবশ্য পরমাণুর ক্ষুদ্রতা নয়, প্রকৃতি-সৃষ্ট অনিশ্চয়তা নিয়মটি সম্পূর্ণ তথ্য লাভের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কোয়াণ্টাম মতবাদের বিরুদ্ধে মতবাদ অনেক সৃষ্ট হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে কার্যকারণ-নীতিটিকে অণুজগতেও বজায় রাখার চেষ্টাও হয়েছিল অনেক। অনিশ্চয়তা সূত্রটি কিন্তু কোনমতেই সন্দেহ করা যায়নি। ফলে প্রশ্ন উঠলো, অনিশ্চয়তা নিয়মটি কার্যকারণ নীতিটিকে বাতিল করে দিচ্ছে কিনা। অনিশ্চয়তা সূত্রটির মূল বক্তব্য হল পরমাণু সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান কখনই লাভ করা সম্ভব নয়, পরমাণু জগৎ সম্বন্ধে যদি নিশ্চিত করে সবকিছু জানাই না যায়, তাহলে সেখানে কার্যকারণ নীতির অস্তিত্ব আছে কি নেই, তাই বা নিঃসন্দেহে বলা যায় কী করে?

সুতরাং কার্যকারণ নীতির সমর্থকগণ বললেন, অণুরা কার্যকারণ নীতি দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করে; কিন্তু এই তথ্যটি আমাদের কাছে পরিস্ফুট হয় না অনিশ্চয়তা সম্পর্কটির জন্যে।

তাঁদের মতে, আপাতদৃষ্টিতে পরমাণু জগতে কার্যকারণ নীতির অনুপস্থিতির জন্য পর্যবেক্ষণের অসম্পূর্ণতাই দায়ী। কার্যকারণের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে সংযুক্ত কয়েকটি রাশি কোনো-না-কোনো ভাবে দৃষ্টি এড়িয়ে যাচ্ছে। এই মতের অনুরাগী এখনও কিছু কিছু ব্যক্তি আছেন। অনিশ্চয়তা সূত্র এ ধারণা একেবারেই স্বীকার করে না। কোনো কণার যান্ত্রিক অবস্থার মধ্যে যে অস্পষ্টতা আছে, তা মানুষ দেখতে অক্ষম একথা ঠিক নয়। বরং এটা বলা যায় যে কণাদের অবস্থা বর্ণনায় সনাতনী পদার্থবিজ্ঞানের ধারণাগুলি তেমন কাজে লাগছে না। সেক্ষেত্রে কণাজগতে সঠিক কার্যকারণ সম্বন্ধের অভাব পর্যবেক্ষণের ত্রুটি নয়।

জড়বাদী পদার্থবিজ্ঞানের অবক্ষয়

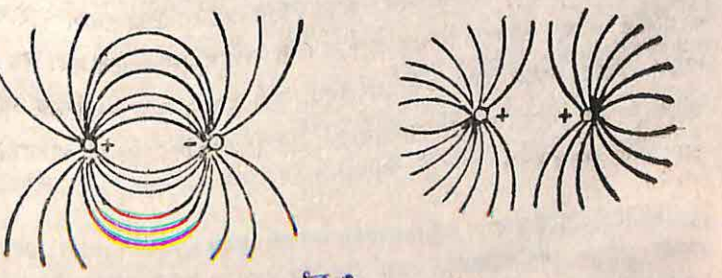
আগেই বলা হয়েছে জড়বাদী পদার্থবিজ্ঞানের যাত্রা শুরু হয়েছিল ডেমোক্রিটাসের সময় থেকে। এই ধারণা অনুয়ায়ী সব কিছু, এমন কি, মানুষের মনও একপ্রকার বস্তু। এই প্রাচীণ ধারণা অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর নতুন জড়বাদ দ্বারা অপসারিত হয়েছিল। যদিও মন বা আত্মা সম্বন্ধে জড়বাদী চিন্তার কোনো পরিবর্তন হয়নি।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে দেখা গেল যে পরমাণু ছাড়া অন্য ধরণের কিছু জিনিসেরও অস্তিত্ব আছে। যেমন বলের ক্ষেত্র। এ ধরণের ক্ষেত্রের জন্য কোনো মাধ্যমের দরকার হয় না। বিশ্বচরাচরে এমন জায়গা আছে যেখানে বস্তুর অস্তিত্ব না

থাকলেও পরীক্ষা করে বলের অস্তিত্ব পাওয়া যাবে। এই ধরনের ক্ষেত্রের উদাহরণ হল তড়িৎচুম্বক ক্ষেত্র যার সম্বন্ধে ফ্যারাডে এবং ম্যাক্সওয়েল সফল অনুসন্ধান করে মানব সভ্যতা সমৃদ্ধ করেছেন। স্থির বা ভ্রাম্যমাণ তড়িৎকণা থেকে তড়িৎচুম্বকীয় ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়! এই ধরনের ক্ষেত্র দুই তড়িৎকণার মধ্যে বলের সৃষ্টি করে। ফ্যারাডে দেখান যে বলরেখার (Lines of force) সাহায্যে এ তড়িৎচুম্বকীয় (Electro magnetic) ক্ষেত্রের রূপ কল্পনা করা যেতে পারে। একটি স্থির তড়িৎ ক্ষেত্রে বলরেখাগুলি বক্র এবং পরীক্ষার দ্বারা এর অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায়।

ফ্যারাডে এই বক্র বলরেখা সম্বন্ধে অনেক ভাবনা চিন্তা করলেন। শেষ পর্যন্ত এই ধারণা তাঁর পরিষ্কার হয়ে গেল যে দুইটি তড়িৎযুক্ত বস্তুর মধ্যে যে বলের অস্তিত্ব আছে তড়িৎচুম্বকীয় ক্ষেত্রই তার উৎস। দুইটি আকর্ষণকারী তড়িৎকণার ক্ষেত্রে বলরেখাগুলি মন্দিরের চূড়ার মত। প্রশ্ন উঠল, এই ধরণের অবস্থা কিভাবে নিজেদের মধ্যে আকর্ষণের সৃষ্টি করে।

ফ্যারাডের চিন্তাধারা তখনও পর্যন্ত যান্ত্রিক পদার্থবিদ্যার উপর নির্ভর করেছিল। সুতরাং ঐ আকর্ষণের জন্যে তিনি যান্ত্রিক ব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারেন নি। তাঁর মতে বলরেখাগুলি স্থিতিস্থাপক সুতার মত এবং তারা দৈর্ঘ্য বরাবর সংকুচিত হয়ে থাকে এবং দৈর্ঘ্যের অভিলম্ব দিকে পার্শ্বচাপ দেয়। এর ফলে দুটো বিপরীত তড়িতাধানের মধ্যে আকর্ষণের সৃষ্টি হয়। ফ্যারাডে তাঁর নিজস্ব ব্যাখ্যা সম্বন্ধে নিশ্চিত ছিলেন, যদিও এই বলরেখাগুলি সত্যিকারের স্থিতিস্থাপক সুতা হতে পারে না। তিনি ইথার মাধ্যমের কথা ধরে নিলেন এবং বলরেখাগুলিকে এই মাধ্যমের বিকৃতি হিসাবে চিন্তা করলেন। এখন ইথার মাধ্যমের বিকৃতির উপর বলরেখার বৈশিষ্টগুলো (যথা, দৈর্ঘ্য বরাবর টান ও পার্শ্বচাপ)



চিত্র ৩

ফ্যারাডে তড়িৎক্ষেত্রে বলরেখার রূপ যেমন কল্পনা করেছিলেন তা চিত্রে ৩ দেখানো হল। বাঁ দিকে দেখানো হয়েছে দুটো বিপরীত তড়িতাধান থাকলে তড়িৎক্ষেত্রে বলরেখার চেহারা। ডানদিকে একই ধরনের দুটি তড়িতাধান থাকলে বলরেখারা কেমন হবে তা দেখানো হয়েছে।

আরোপ করে তিনি তড়িৎক্ষেত্রের আকর্ষণ ও বিকর্ষণের ব্যাখ্যা দিলেন। ম্যাক্সওয়েলও এই ব্যাখ্যা মেনে নিয়েছিলেন।

পদার্থবিজ্ঞানের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ফ্যারাডের ধারণা তাঁর দুই শতাব্দী আগেকার বিজ্ঞানী হাইগেনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থেকে খুব ভিন্ন ছিল না। তাঁদের দুজনেরই এই অভিমত ছিল যে কোনো ঘটনাকে তখনই পুরোপুরি ব্যাখ্যা করা গেছে বলে ধরা হবে, যখন বলবিদ্যার ভাষায় তার প্রকৃতিকে পূর্বেই নির্ধারণ করা যাবে। ফ্যারাডে এরকম সন্দেহ কখনই করেননি যে তাঁর আবিষ্কৃত তড়িৎচুম্বকীয় তথ্যগুলি যান্ত্রিক মতবাদের আলোকে ব্যাখ্যা করা যাবে না। তিনি স্থিতিস্থাপক-ভাবে বিক্ষুব্ধ ইথার মাধ্যমের কথা সঙ্গতভাবেই ভেবে সন্তুষ্ট ছিলেন। সামগ্রিক-ভাবে সকল তড়িৎচুম্বকীয় তথ্যগুলি যান্ত্রিক মতবাদের আলোকে ব্যাখ্যা করা যাবে তাঁর এই দৃঢ়মূল বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত বজায় রইল না। ফ্যারাডে আংশিক ভাবে নিজে একাজে সফল হয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এধরনের প্রচেষ্টাকে সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করতে হল। দেখা গেল তড়িৎচুম্বকীয় মূল তথ্যগুলোর কোন যান্ত্রিক কাঠামো খুঁজে পাওয়াই সম্ভব নয়। এদের সম্বন্ধে নতুন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণের সন্ধান করতে হবে।

এই বিশ্বের সব ঘটনাপ্রবাহ যে যান্ত্রিক নয় এবং প্রকৃতিতে যান্ত্রিকতার আওতার বাইরে বহু ঘটনার অস্তিত্ব থাকতে পারে এই সিদ্ধান্তই ক্রমশঃ সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। এই উপলব্ধিই হয়ত যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর অবসান ঘটাতে পারত। কিন্তু যখন প্রমাণিত হয়ে গেল যান্ত্রিক মতবাদের অন্যতম মূলস্তম্ভ ইথারের প্রকৃত পক্ষে কোনো অস্তিত্ব নেই তখন যান্ত্রিক মতবাদের অবসানের প্রক্রিয়াটি আরও ত্বরান্বিত হয়ে গেল। বিগত শতাব্দীর শেষের দিকে কলাকৌশলের এত উন্নতি হল যে বিজ্ঞানীরা ইথারের অস্তিত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করলেন। এ প্রচেষ্টায় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মাইকেলসন ও মর্লির পরীক্ষা সকলকে বিস্ময়ে হতবাক করে সম্পূর্ণ নেতিবাচক ফল দিল। এই ধারণা করতে সকলে বাধ্য হল যে ইথার বলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই এবং তড়িৎচুম্বকীয় ক্ষেত্রের যান্ত্রিক ব্যাখ্যার জন্য প্রয়োজনীয় স্থিতিস্থাপক মাধ্যমের কথা আর ভাবা সম্ভব নয়।

ফ্যারাডে বেঁচে থাকলে এই ফলাফলে মর্মাহত হতেন। তিনি হয়ত এই প্রশ্নই করতেন যাকে বস্তুনিষ্ঠভাবে ভাবা যায় না সেরূপ ক্ষেত্র বলতে কী বোঝায় বা শূন্যতার সঙ্গে তার পার্থক্যই বা কী? ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্বে সবসময় ক্ষেত্রের সঙ্গে শক্তি সংযুক্ত থাকে। শক্তিপ্রবাহের কোনো মাধ্যম ছাড়া শক্তির প্রকৃত স্বরূপের কথা ভাবাই যায় না। সনাতনী পদার্থবিদ্যাও উপরের প্রশ্নগুলির কোন সদুত্তর

দিতে পারে না। এর সব ধারণা এতদূর যান্ত্রিক যে বস্তুনির্ভর নয় এমন কোন ক্ষেত্রের উপস্থিতির কথা সে ভাবতেই পারে না।

শক্তির প্রত্যেক অংশের সঙ্গে সমতুল ভরের অস্তিত্ব থাকবে এ ধরনের নতুন ধারণার আবির্ভাব ঘটল, যদিও সকলের কাছে তা বিশ্বাসযোগ্য মনে হল না। যদিও এই মতটি ক্ষেত্রের কাল্পনিক চরিত্রটিকে সরিয়ে বাস্তবতা আরোপ করল তবুও এই মতটি সর্বজনগ্রাহ্য হলো না কারণ সনাতনী পদার্থবিদ্যার চিন্তাধারার সঙ্গে এটা খাপ খায় না। সুতরাং এ সময়ে পদার্থবিদ্যাকে কিছুটা বিক্ষুব্ধ ও বিচলিত দেখা গেল। একটি বিরাট পরিবর্তনের আভাস স্পষ্ট হয়ে উঠল। এই পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়াল কারণ পদার্থবিজ্ঞান এমন কতকগুলি ঘটনার সম্মুখীন হল যে ঘটনাগুলিকে গতানুগতিক ধারণার সাহায্যে ব্যাখ্যা করা তো গেলই না, উপরন্তু তাদের জন্যে নতুন চিন্তাধারা ও দৃষ্টিকোণ খুঁজে বার করা প্রয়োজন হল।

ক্রমে পদার্থবিজ্ঞানের মূল নিয়মগুলির একটি তালিকা প্রস্তুত করার প্রয়োজন দেখা দিল। বোঝা গেল এদের মধ্যে কতকগুলি নিয়ম ভ্রান্ত। এই ভ্রান্ত নিয়মগুলোর সংশোধন করার প্রয়োজন হয়ে পড়ল। অবশ্য এ ব্যাপারে বিরোধিতাও অনেক হয়েছে। কারণ যাঁরা নিজেদের সংস্কারমুক্ত ভাবেন, তাঁদের মধ্যেও অনেকেই আসলে পুরাতন বিশ্বাসকে আঁকড়ে থাকতে চান তাঁরা পুরাতন ধারণার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুললে উদাসীন থাকেন। সুতরাং আইনষ্টাইন যখন বললেন কোনো ঘটনাকেই এক সার্বভৌম চরিত্র আরোপ করা যাবে না বা ভিন্ন জায়গায় সংঘটিত দুটি পৃথক ঘটনার যুগপত্তা কখনই চরমভাবে বর্ণনা করা যায় না, সেটা কেবল নির্দেশতন্ত্রের উপর নির্ভর করে, তখন তাঁকে প্রচণ্ড বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

যে দুটি পরিবর্তনের জোয়ার পদার্থবিদ্যার ভিত পর্যন্ত আলোড়িত করেছিল, তাদের মধ্যে আপেক্ষিকতাবাদ (Relativity) একটি। এই মতবাদটি সনাতনী পদার্থবিজ্ঞানে বিরাট এক পরিবর্তন আনল। অবশ্য সনাতনী পদার্থবিদ্যার মূল ধারণাগুলি মোটামুটিভাবে অপরিবর্তিত থেকে গেল। সনাতনী শব্দটি তখনও ব্যবহার করা যেতে পারত, কেননা আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ কেবলমাত্র স্থান-কালের কাঠামোতেই পরিবর্তন এনেছিল।

তারপর এলো দ্বিতীয় পরিবর্তন। এই পরিবর্তন পদার্থবিজ্ঞানের একেবারে মূলে গিয়ে আঘাত করল। প্রাকৃতিক নিয়মগুলি নতুনভাবে বিধিবদ্ধ করার প্রয়োজন দেখা দিল। যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এই দ্বিতীয় পরিবর্তনটি এলো তাতে নতুন করে সবকিছুই ভাবতে হল। এদের মধ্যে কেবলমাত্র একটির কথাই এখানে আলোচিত হবে। এইটি হল প্রকৃতিতে অবিচ্ছিন্নতার অভাব। নতুন ধারণা

অনুযায়ী অণুদের সূক্ষ্মজগতে এমন কতগুলি প্রাথমিক অবস্থা আছে, যাদের আর বিশ্লিষ্ট করা যায় না। এরই ফলে প্রকৃতিতে বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি। ঘটনা-পরম্পরার মধ্যে যে সুনির্দিষ্ট কার্যকারণ সম্বন্ধের কথা মানুষ এতদিন মেনে এসেছে সেই ধারণা লুপ্ত হতে বসল। বর্তমান পর্যবেক্ষণের সাহায্যে পরবর্তী সময়ে কী হবে তা নিশ্চিতভাবে বলতে পারার সম্ভাবনা দূর হল। প্রকৃতিতে পারিসাংখ্যিক নিয়মের অস্তিত্ব অবশ্যাম্ভাবী ধরে নিয়ে আত্মপ্রকাশ করল কোয়াণ্টাম বলবিদ্যা।

পদার্থবিজ্ঞানের আধুনিকতায় উত্তরণ ঃ আপেক্ষিকতাবাদ

২

"সর্বশেষ লব্ধ জ্ঞানালোকে সিদ্ধান্তগুলি প্রায় স্বতঃসিদ্ধ বলে মনে হয় এবং যে কোন বুদ্ধিমান ছাত্র সহজে বুঝতে পারে। কিন্তু প্রারম্ভিক অন্ধকারে অনুসন্ধান, তার আকুল আকাঙ্ক্ষা তার পর্যায়ক্রমিক আশা-নিরাশা এবং অন্তিমে মেঘমুক্ত দিবালোকে প্রবেশ এ সমস্ত তিনিই অনুভব করতে পারেন যাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা আছে।"—আইনস্টাইন

সাধারণ কয়েকটি মন্তব্য

সবাই স্বীকার করবেন যে স্থান ও সময় সম্বন্ধে আমাদের ধারণা বাইরের জগত-সংক্রান্ত অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। যেমন—সূর্য ওঠা ও অস্ত যাওয়া ইত্যাদি। অনেক বক্তব্য আছে যা আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে সত্য। আমরা যে অবস্থার সঙ্গে পরিচিত নয় সেসব ক্ষেত্রে ঐ বক্তব্যগুলি অসঙ্গত বলে মনে হতে পারে। পদার্থবিজ্ঞানের ইতিহাসে এই ধরণের পরিস্থিতি বার বার লক্ষ্য করা গেছে। পৃথিবী তার নিজ অক্ষের চারিপাশে ও সেই সঙ্গে সূর্যের চারিপাশে ঘুরছে একথা আবিষ্কৃত হবার আগে ঠিক এর বিপরীত ধারণাই চালু ছিল। আমরা যখন জানতে পারি যে এই নতুন আবিষ্কারকে সমকালীন বিজ্ঞানীরা স্বাগত জানাননি তখন আমরা সেইসব বিজ্ঞানীদের সংকীর্ণ মনোভাবের নিন্দা করি। আমরা এখন ধারণাটি সহজেই গ্রহণ করতে পারি তার কারণ হলো আমাদের শিক্ষা শুরু হবার পর থেকেই আমরা এই কথা জেনে আসছি। যাচাই করে প্রতিষ্ঠিত করার বহু আগেই কিছু কিছু ব্যাপার সম্বন্ধে কোনো ধারণা আমাদের মনে বদ্ধমূল হয়ে যায়। যেমন গ্যালিলিও বলেছিলেন একটি চলমান বস্তু তার গতি অক্ষুণ্ণ রাখবে। এই ধারণাটি কিন্তু অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলত না। অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে একটি গতিশীল বস্তু ধীরে ধীরে থেমে যাচ্ছে। সুতরাং খুব সঙ্গত কারণেই বিজ্ঞানীরা গ্যালিলিওর বক্তব্যে আপত্তি জানিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে কিছু বিজ্ঞানী গতি সম্বন্ধে কতগুলি বিমূর্ত ধারণার প্রবর্ত্তন করলেন। শেষ পর্যন্ত অনেক দ্বিধার পর গ্যালিলিওর ধারণাটি গৃহীত হল।

আলো একটি সসীম গতিবেগ নিয়ে চলে—এ ঘটনাটি আরেকটি উদাহরণ যা

আমাদের অনুমানের সংগে মেলে না। এমন কি শব্দের গতিবেগও যে সসীম সেটা ভাবতেও আমাদের কষ্ট হয়।

আমাদের চারপাশে দৈনিক যে সব ঘটনা ঘটছে তাদের সম্বন্ধে আমরা নানারকম ধারণা করি, শুধু সে ঘটনা আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির উপর অর্থাৎ চোখ, কানের উপর কিরকম প্রতিক্রিয়া করছে তার ওপর নির্ভর করে। বিদ্যুতের চমকানি দেখার পরে আমরা বাজ পড়ার আওয়াজ শুনতে পাই। উপরের দুটি ক্ষেত্রেই ঘটনা দুটি কিন্তু ঘটে একই সংগে, কিন্তু যেহেতু আলোর গতিবেগ শব্দের চেয়ে বেশী, সেই-জন্যই আমরা আলো আগে দেখি পরে আওয়াজ শুনি। আমরা ভাবি যেন আলো অসীম গতিবেগ নিয়ে চলছে। জ্যোতির্বিদ্যায় তিনশ বছরের অভিজ্ঞতা ও সময় মাপার অতিসূক্ষ্ম পদ্ধতি আমাদের এই সত্য মেনে নিতে বাধ্য করেছে যে আলোর একটি সসীম গতিবেগ আছে।

বাইরের জগতে যে সব ঘটনা ঘটছে তার সম্বন্ধে আমরা বিভিন্ন ধারণা খাড়া করি মূলতঃ—আমাদের ইন্দ্রিয়দের ওপর ভিত্তি করে। ফলে আমাদের অনুমানের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক সত্যের মিল অনেক ক্ষেত্রেই হয় না, কিন্তু সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি দিয়ে বহু পরীক্ষার পর আমরা সত্য মানতে বাধ্য হই। যেমন আলো একটি তরঙ্গ। এটা কিন্তু আমাদের চোখে ধরা পড়ে না। বিভিন্ন ধরণের পরীক্ষার পর আলোর এই চরিত্রটি ধরা পড়েছে।

এইভাবে বিজ্ঞানের যে কোন নতুন আবিষ্কার দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ পুরানো সংস্কারকে পরিহার করতে বাধ্য করে। পদার্থবিজ্ঞানে পূর্বেকার বেশ কিছু ঘটনাকে যান্ত্রিক ধারণার সাহায্যে ব্যাখ্যা করা কিছুটা সহজ।

আপেক্ষিকতাবাদকে গ্রহণ করতে একটু সময় লেগেছিল। এর কারণ হলো আপেক্ষিতাবাদ নামটির মধ্যে একটি দার্শনিক দিক আছে। এই নামটি এই দাবী করে যে সকল সত্যই আপেক্ষিক। এই কথার সত্যতা ক্রমশ পরিস্ফুট হবে। কিছু কিছু বক্তব্য যা আমরা অনুভূতি দিয়ে চরম (Absolute) বলে মনে করি সেগুলি শেষ পর্যন্ত কারণহীন সংস্কার রূপে পরিগণিত হয়।

গতি ও স্থিতি

আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ আসার বহু আগে মানুষ জানত যে দর্শক স্থির থাকুক বা সুসমগতিতে চলমান হোক, কোন ক্ষেত্রেই প্রাকৃতিক নিয়মগুলির, বিশেষতঃ বলবিদ্যার নিয়মগুলির অবয়ব বদলাবে না।

আমরা ভালভাবেই জানি যে কোন ট্রেনের যাত্রীর পক্ষে ট্রেনের গতি বোঝা সম্ভব নয় যদি না লাইনের অমসৃণতার জন্য ট্রেনটি কম্পিত হয় বা ট্রেনটি হঠাৎ

চলতে বা থামতে শুরু করে। যখন আমরা ট্রেনের জানালা দিয়ে বাইরে আরেকটি ট্রেনের দিকে তাকাই তখন প্রায়শই আমরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি এই ভেবে যে কোন ট্রেনটি প্রকৃতপক্ষে চলছে। আমরা যে সব জিনিষ স্থির বলে নিশ্চিত জানি তাদের চোখে পড়লেই এ সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।

আবার যদি কেউ বলে যে সে যে ট্রেনে বসে আছে তা স্থির এবং বাইরের গাছ-পালা বাড়ি ঘর সব ছুটছে তাহলে তার ভ্রান্তি দূর করতে অনেক কষ্ট করতে হবে। চলন্ত গাড়ীর কামরাতে যে কোন যান্ত্রিক (mechanical) পরীক্ষা ট্রেনটি স্থির থাকলে যে ভাবে সম্পন্ন হত ঠিক তেমন ভাবেই হবে। এই ব্যাপারটিকে আরও ব্যাপকভাবে এইভাবে বলা হয় : যে দুটি দর্শক পরস্পরের সাপেক্ষে সুসম আপেক্ষিক গতি নিয়ে চলছে দেখান যায় যে তাদের দুজনের কাছে বলবিদ্যার নিয়মগুলির কোন হেরফের হবে না। এতে বেশ কিছু সুবিধা হয়েছে কেননা আমরা জানি যে পৃথিবীর নিজ অক্ষের চারিপাশে একটি গতি আছে যে গতিবেগে আমরা প্রতিটি মানুষ চলছি। যদি বলবিদ্যার নিয়মগুলি দর্শকের গতির জন্য বদলে যেত তাহলে পৃথিবীতে অবস্থিত দর্শকের কাছে তাদের সরল চেহারাটা আর থাকত না। দেখা যাচ্ছে যে বলবিদ্যার নিয়মগুলির সাহায্যে গতি ও স্থিতির মধ্যে পার্থক্য করা যায় না।

যখন আমরা তড়িৎ অথবা আলোক-বিজ্ঞানে প্রবেশ করব তখন কিন্তু অবস্থাটা এমন থাকবে না। আলো বা তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ শূন্যে নির্দিষ্ট একটি গতিবেগ c নিয়ে চলে, সুতরাং আমরা আশা করব যে যেহেতু আমাদেরও একটি নিজস্ব গতিবেগ আছে সেহেতু আমাদের সাপেক্ষে আলোর গতিবেগ c এর চেয়ে ভিন্ন হবে। আলোর গতিবেগ c যেদিকে সেদিকে আমাদের গতি যদি v হয় তবে আমাদের কাছে আলোর গতিবেগ দাঁড়াবে $c - v$।

আবার যদি আমাদের গতিবেগ v আলোর গতিবেগের বিপরীত দিকে হয় তবে আমাদের সাপেক্ষে আলোর গতিবেগ দাঁড়াবে $c + v$। অবশ্য এই তারতম্য খুবই সামান্য হবে কেননা c এর তুলনায় v খুবই ছোট। তবে পরীক্ষাপদ্ধতি এতই উন্নত যে ওই সামান্য তফাৎটুকু ধরা অসম্ভব নয়।

ইথার প্রবাহ পরীক্ষা

১৮৮৮ সালে আমেরিকার দু'জন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী মাইকেলসন এবং মর্লি একটি বহু-আলোচিত পরীক্ষার সূত্রপাত করেন। তাঁদের এই পরীক্ষা থেকে জানা যায় যে পৃথিবীস্থিত দর্শকের সাপেক্ষে আলো সকলদিকে সমান গতিবেগে চলে। এই

তথ্যটি বিজ্ঞানীদের চমকিত করল কেননা তাঁরা কেউই এই ফলটি প্রত্যাশা করেননি।

তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গরূপে আলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। আলোর তড়িৎ-চুম্বকীয় চরিত্রটি জানার আগে আলোকে অদৃশ্য ইথার মাধ্যমে যান্ত্রিক তরঙ্গ হিসাবে ভাবা হতে। আগে বলা হয়েছে পৃথিবী সকল স্থির নক্ষত্রের সাপেক্ষে ঘুরছে, পৃথিবীকে স্থির বস্তু হিসাবে চিহ্নিত করার কোন উপায় নেই। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন দিকে আলোকবার্তা পাঠালে পৃথিবীর তথা তার ওপরে কোন দর্শক সাপেক্ষে তাদের গতিবেগ ভিন্ন হওয়া উচিত। যদি ইথারের অস্তিত্ব থাকে তাহলে শব্দের গতিবেগের উপর বাতাসের যে প্রভাব, ইথার-মাধ্যমে প্রবাহিত আলোর গতিবেগের উপর পৃথিবীর আবর্তন সেই প্রভাবই সৃষ্টি করবে। বাতাসের দিকে শব্দ প্রবাহিত হলে শব্দের গতিবেগ বেড়ে যায় ও বাতাসের বিপরীত দিকে গেলে শব্দের গতিবেগ কমে যায়। ঠিক সেইভাবে পৃথিবী যেদিকে ঘুরছে সেইদিকে কম এবং তার বিপরীত দিকে আলোর আপেক্ষিক গতিবেগ বেশি হবে। এই দু'য়ের মধ্যে প্রত্যাশিত তফাতের মান যদিও খুব কম তবুও মাইকেলসন ও মর্লির পরীক্ষার যন্ত্রপাতি এর থেকেও ক্ষুদ্রমানের তফাৎ পরিমাপ করতে সক্ষম ছিল। কিন্তু তাদের পরীক্ষায় এ ধরণের তফাৎ নজরে এল না। এতে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ হয়ে গেল পৃথিবীর ওপরে কোন দর্শক সাপেক্ষে আলোর গতিবেগ সবদিকে সমান। পরীক্ষায় দেখা গেল ইথারের অস্তিত্ব নেই।

ইথার ধারণা পরিত্যক্ত হল

মাইকেলসন ও মর্লি ছাড়াও আরো অনেক বিজ্ঞানী অন্যধরণের পরীক্ষা করে ইথার সাপেক্ষে আলোর গতিবেগ জানার চেষ্টা করলেন। তাঁরা প্রত্যেকে নেতিবাচক ফল পেলেন। এই পরিস্থিতির এরকম ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যে, যে জিনিস পর্যবেক্ষণের আওতায় আনা সম্ভব নয় সে জিনিস প্রাকৃতিক ঘটনাস্রোতের সঙ্গে আদৌ সংশ্লিষ্ট নয়। সুতরাং পদার্থবিদ্‌রা খুব সঙ্গতভাবেই দাবি করতে পারেন যে অন্ততঃ তাঁদের কাছে এ ধরনের কোন জিনিসের অস্তিত্ব নেই।

বর্তমান আলোচনায় এটাই সাব্যস্ত হল যে ইথার বলে কোনো জিনিসের অস্তিত্ব নেই এবং এই মাধ্যমের সাপেক্ষে কোনো গতিবেগ নির্ধারণ করতে গেলে সবসময় নেতিবাচক ফল পাওয়া যাবে। অবশ্য এর পূর্বেই আইনস্টাইন ইথারের অস্তিত্ব না ধরেই তার আপেক্ষিকতাবাদের সূত্রগুলি খাড়া করেছিলেন। মাইকেলসন ও মর্লির পরীক্ষা তার এই সূত্রগুলিকে অভ্রান্ত প্রমাণিত করল।

কয়েকটি প্রশ্ন

একজায়গায় স্থির হয়ে আছে এরকম কোন দর্শকের কাছে নিউটনের নিয়মগুলি বা বলবিদ্যার নিয়মগুলি যেমন দেখাবে ঐ দর্শকের সাপেক্ষে সুসম গতিবেগ নিয়ে চলমান দর্শকের কাছেও কিন্তু ঐ নিয়মগুলি একই রকম দেখাবে। তড়িৎচুম্বকীয় তত্ত্বের ক্ষেত্রে এরকম অবস্থায় তার নিয়মগুলি কিন্তু অপরিবর্তিত থাকে না। সুসম গতিবেগে চলমান নির্দেশতন্ত্রে বলবিদ্যার নিয়মগুলি অপরিবর্তিত থাকার সর্তটি গ্যালিলিয় আপেক্ষিকতা বলা হয় (Galelian Relativity)। সুতরাং স্পষ্টতই তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের নিয়মগুলি গ্যালিলিয় আপেক্ষিকতাবাদ মানছে না। বলবিদ্যা ও তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ সংক্রান্ত নিয়মগুলির মধ্যে এই ভিন্নতা পদার্থবিজ্ঞানকে কয়েকটি সম্ভাবনার সম্মুখীন করে দেয়—

(১) বলবিদ্যার মত তড়িৎচুম্বকীয় তত্ত্বকেও গ্যালিলিও আপেক্ষিকতাবাদ মেনে চলতে হবে। বাস্তবে যেহেতু তেমনটি হচ্ছে না সেইজন্য বর্তমান তড়িৎ চুম্বকীয় তত্ত্বের সংশোধন প্রয়োজন।

(২) যদি এই তড়িৎচুম্বকীয় তত্ত্ব নির্ভুল বলে ধরে নেওয়া হয় তবে হয়ত তড়িৎ চুম্বকীয় নিয়মগুলির জন্য আলাদা নির্দেশ তন্ত্র আছে।

(৩) আবার যদি তড়িৎচুম্বকীয় তত্ত্বটি ঠিক বলে ধরে নেওয়া হয় তবে গ্যালিলিও আপেক্ষিকতাবাদ নিয়মটি ঠিক নয় এবং নিউটনের সূত্রগুলির সংশোধন প্রয়োজন।

যদি প্রথম সম্ভাবনাটি ঠিক হতো তাহলে পরীক্ষায় তা ধরা পড়ত। সকল পরীক্ষা এ কথাই প্রতিষ্ঠা করে যে তড়িৎচুম্বকীয় তত্ত্ব নির্ভুল। সুতরাং এই তত্ত্বের নিয়মগুলির সংশোধনের কোন প্রশ্নই ওঠে না। মাইকেলসন মর্লির পরীক্ষা তড়িৎ চুম্বকীয় তত্ত্বের জন্য আলাদা বিশেষ নির্দেশতন্ত্রের কথা সন্দেহাতীত ভাবে বাতিল করে দিল।

আইনস্টাইন তৃতীয় সম্ভবনাটিকে গ্রহণ করলেন। মাইকেলসন মর্লির পরীক্ষা থেকে দেখা গেল যে আলোর গতিবেগ দর্শকের গতিবেগের উপর নির্ভর করে না। গ্যালিলিওর নীতি অনুযায়ী আলোর গতিবেগ চলমান দর্শকের কাছে ভিন্ন হওয়ার কথা—সেহেতু আইনস্টাইন এই সিদ্ধান্তে এলেন যে, যে সুসম গতিবেগে চলমান দর্শকের ক্ষেত্রে নিয়মগুলি গ্যালিলিও যেভাবে দেখিয়েছেন তা পালটাতে হবে।

এই পরিবর্তন আনতে গিয়ে আইনস্টাইন দুটি প্রকল্প খাড়া করলেন—

(১) সুসম গতিতে চলমান বা সকল জাড্যিক (inertial frame of

reference) নির্দেশতন্ত্রের সাপেক্ষে পদার্থবিজ্ঞানের সব নিয়মগুলি অপরিবর্তিত থাকতে হবে।

(২) যে কোন দর্শকের কাছেই আলোর গতিবেগ সব সময় একই থাকবে।

চরম গতিবেগের প্রশ্ন

বস্তুর গতিবেগ কি সবসময় কোনো কিছুর সাপেক্ষে বর্ণনা করতে হবে না তার চরম গতিবেগও পাওয়া সম্ভব ? চরম গতিবেগ হল সেই গতিবেগ যা কোন গতিশীল বস্তুর সাপেক্ষে মাপা হয় নি। যদি কোনো গাড়ির চালক বলে যে তার গাড়ির গতিবেগ ঘণ্টায় পঁচিশ মাইল তখন ধরতে হবে সে তার গতিবেগ কোন দৃষ্টিগোচর জিনিষের সাপেক্ষেই নির্দেশ করছে।

নিউটনের বিশ্বাস ছিল কোনো বস্তুর চরম গতিবেগের প্রশ্নটি তোলা খুবই সংগত। অসীম অনন্ত তাঁর কাছে নিছক কল্পনার নয়। তাঁর মতে এটি স্থির এবং এর একটি বস্তুগ্রাহ্য দিক আছে। কিন্তু এর মধ্যস্থিত বস্তুসকলের উপর এর কোন প্রভাব নেই। এই দৃষ্টিভঙ্গীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে তিনি একটি সাপেক্ষের কথা ভেবেছিলেন যা অনন্তের মাঝে চরমভাবে স্থির হয়ে আছে এবং এই ধরণের নির্দেশতন্ত্রের সাপেক্ষে সকল গতিবেগই চরম গতিবেগ হিসাবে চিহ্নিত হবে।

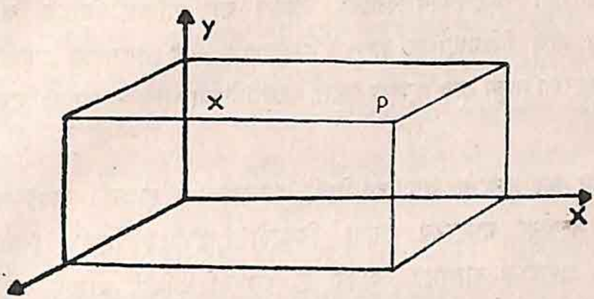
নিউটন তাঁর এই সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পেরেছিলেন তার কারণ হল এমন কিছু গতির উদাহরণ আমাদের সামনে আছে যাদের আপাতদৃষ্টিতে অন্য কারো সাপেক্ষে বর্ণনা করার প্রয়োজন হয় না। যে লোক নাগরদোলায় চড়ছে সে নাগরদোলার কেন্দ্র থেকে বহির্মুখী একটি বল অনুভব করে। এই ধরণের বল তাকে একটি চক্রাকার গতির উপলব্ধি দান করে। লোকটিকে যদি চোখ বেঁধে রাখা হয় তাহলেও তার অনুভূতি ব্যাহত হবে না। তার তখন এই ধারণাই হবে যে চক্রাকার গতির একটা নিজস্ব সার্বভৌম চরিত্র আছে।

সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ অনুযায়ী কিন্তু এটা ঠিক নয়। চক্রাকার গতিকে অন্যান্য গতির মতো কারো সাপেক্ষে বর্ণনা করতে হবে।

চরম গতিবেগের ধারণাকে বাঁচানোর একটাই কেবল উপায় আছে সেটা হল আমাদের চারিদিকে অদৃশ্য কোন স্থির মাধ্যম বেষ্টন করে আছে এরকম চিন্তা করা। যদি সত্যি ইথার থাকত তাহলে চরমগতি সম্ভব হত এবং ইথার সাপেক্ষে যে কোনো বস্তুর গতিই চরমগতি হিসাবে পরিচিত হত।

যখন দেখা গেল কোনো পরীক্ষাই ইথারের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারছে না তখন চরম গতিবেগের ধারণাটিও তার অর্থ হারিয়ে ফেলল। 'বস্তুটি গতিশীল'— একথাটি কোনো চরম গতিবেগ বোঝায় না কেবল দ্বিতীয় একটি বস্তুর সাপেক্ষে

বস্তুটির স্থান পরিবর্তনই নির্দেশ করে। দ্বিতীয় বস্তুটি এক্ষেত্রে নির্দেশক। তিনটি পরস্পর লম্ব সরলরেখাকে স্থানাংক অক্ষ হিসাবে ধরে একটি নির্দেশতন্ত্র



চিত্র—৪

x, y, z এই তিনটি সরলরেখা, শূন্যে অবস্থিত একটি নির্দেশ তন্ত্র। এর সাপেক্ষে যে সব দূরত্ব মাপা হয় তারা যথাক্রমে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা। এই ছবিটি একটি ঘরের কোণ বলে ধরা যেতে পারে। এর উপরে যে কোন বিন্দু P-র দূরত্ব ঐ ঘরটির দুই দেওয়ালের ও মেঝের উপর লম্ব টানলে পাওয়া যাবে। এরাই এই বিন্দুর স্থানাংক।

তৈরি করা যেতে পারে। নির্দেশক দ্বিতীয় বস্তুটি এই নির্দেশতন্ত্রের মূল বিন্দুতে (o) অবস্থিত থাকবে।

আপেক্ষিকতাবাদের নীতি

আপেক্ষিকতাবাদ অনুসারে এটা মেনে নিতে হবে যে প্রত্যেক প্রাকৃতিক নিয়মের সংশ্লিষ্ট বস্তুগুলির স্থান এবং গতিবেগ কোনো সুনির্দিষ্ট স্থানাংক নির্দেশকের সাহায্যে বর্ণনা করতে হবে। এছাড়া প্রাকৃতিক নিয়মের অর্থ সুপরিস্ফুট হতে পারে না।

উদাহরণ স্বরূপ নিউটনের প্রথম গতিসূত্রের কথা ধরা যেতে পারে। এই সূত্র অনুযায়ী কোনো বস্তুর উপর যদি কোনো বল ক্রিয়া না করে তবে বস্তুটি স্থির অবস্থায় থাকবে অথবা কোনো সরলরেখায় নির্দিষ্ট গতিবেগে সচল থাকবে। 'স্থির', ''গতিবেগ'' 'সরলরেখা' প্রভৃতিকে কোন নির্দেশতন্ত্রের সাপেক্ষে বলা হয়েছে তা যদি পরিষ্কারভাবে বলা না হয় তবে সূত্রটির কোনো অর্থই থাকে না। এই সূত্রটি সকল নির্দেশতন্ত্রের সাপেক্ষে সত্য নাও হতে পারে। এটা নিশ্চিত যে এমন নির্দেশ তন্ত্র খুঁজে পাওয়া সম্ভব যাদের সাপেক্ষে নিউটনের প্রথম সূত্র সত্য হবে না। আপেক্ষিকতাবাদ এটাই খুঁজে বার করার চেষ্টা করে যে কি ধরণের নির্দেশ-তন্ত্রের ওপরে এই সূত্রগুলি সত্যতা নির্ভর করবে।

আংশিকভাবে এই সমস্যার সমাধান আগেই করা হয়েছে। শূন্যস্থান বা ইথার নয়, বস্তুরাই নির্দেশতন্ত্র হিসাবে কাজ করতে পারে। সুতরাং পদার্থবিদেরা যে নিয়মগুলো অনুসন্ধান করবেন তাদের কার্যকারিতা নির্ভর করবে সংশ্লিষ্ট বস্তুর সঙ্গে নিয়মগুলির সম্পর্কের উপর। এই ভাবধারার আলোকে প্রাকৃতিক নিয়মগুলো নতুন করে সূত্রবদ্ধ করার প্রচেষ্টাই আপেক্ষিকতাবাদের মূলকথা।

সময়

এইবার সময় সম্বন্ধে আমাদের কিছু আলোচনা প্রয়োজন। আইনস্টাইনের আগে সময় সম্পর্কে মানুষের ধারণা কিছুটা নৈর্ব্যতিক ছিল। বিজ্ঞানের কোনো নিয়ম প্রণয়নের ব্যাপারে সময়ের যে কোনো ভূমিকা থাকতে পারে তো মানুষ চিন্তাই করতো না। সময় চরম এবং অনন্তকাল ধরে বয়ে চলবে এ ধরণের কাব্যিক মনোভাব বিরাজ করত। আইনস্টাইন বললেন যে সময় চরম বলে কিছু হতে পারে না। আইনস্টাইনের ভাষায় "আমি অনেক নিষ্ফল চেষ্টা করেছি কিন্তু শেষে আমার খেয়াল হল যে, সময়ই সন্দেহ ভাজন।" সময়কে সরাসরি পর্যবেক্ষণের আওতায় আনতে হবে। এর অর্থ দাঁড়াবে সময় দর্শকের উপর নির্ভর করবে। স্থানাংকের মতন সময়ও আপেক্ষিক। এতদিন কোন জায়গা চিহ্নিত করতে গিয়ে আমরা তিনটি স্থানাংকের কথাই ভেবেছি এবার তার সংগে যুক্ত হলো সময়। ত্রিমাত্রিক স্থানের বদলে চতুর্মাত্রিক স্থানের ধারণা পদার্থবিজ্ঞানে প্রবেশ করল। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের সূত্রগুলি ও সময়ের আপেক্ষিক চরিত্রের ফলশ্রুতিই হলো লোরেনটজ্ স্থানাংক রূপান্তর। আমরা এতদিন একটি স্থানের কথাই বলে এসেছি এবার তার পরিবর্তে বলা হবে ঘটনা (Event)।

লোরেনটজ্ রূপান্তরের কয়েকটি পরিণতি

লোরেনটজ্ রূপান্তরের সাহায্যে প্রমাণ করা যায় (১) প্রত্যেক দৃঢ় বস্তুর দৈর্ঘ সবচেয়ে বেশী বলে মনে হয় যখন সেটি নিরীক্ষকের সাপেক্ষে স্থির থাকে যখন তা নিরীক্ষকের সাপেক্ষে সচল হয় তখন সেটি আপেক্ষিক বেগ v-এর দিকে $\sqrt{1-v^2/c^2}$: 1 (c=আলোর গতিবেগ) অনুপাতে সঙ্কুচিত বলে মনে হবে। কিন্তু আপেক্ষিক গতিবেগের লম্বের দিকে সঙ্কুচিত হবে না। একে বলা হয় দৈর্ঘ সংকোচন (Length Contraction) (২) প্রত্যেক ঘড়ি সবচেয়ে দ্রুত হারে চলে যখন সেটি নিরীক্ষকের সাপেক্ষে স্থির থাকে। যদি ঘড়িটি v বেগে নিরীক্ষকের সাপেক্ষে গতিশীল হয় তাহলে নিরীক্ষকের কাছে তার চলার হার 1 : $\sqrt{1-v^2/c^2}$ অনুপাতে মন্থর হয়ে যাবে। একে বলা হয় কাল প্রসারণ (Time dilation)।

বাস্তব চিন্তাধারা

নিজস্ব বিশ্বাস ও প্রত্যয় থেকে আইনস্টইন কখনই সরে আসতে চাননি। চরম নির্দেশক কিছু থাকতে পারে এমন কথা তাঁর কাছে অর্থহীন মনে হয়েছিল। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে এই রকম একটি অবস্থা থেকে নিষ্কৃতি পাবার কোনো না কোনো পথ উদ্ভাবিত হবেই। শেষ পর্যন্ত এই সঠিক পথের সন্ধান তিনি পেলেন। কিন্তু এর জন্যে তাঁকে কয়েকটি বলিষ্ঠ অথচ অপ্রচলিত ভাবধারার প্রবর্তন করতে হল। এই সব নতুন ভাবধারার সঙ্গে প্রচলিত চিন্তাধারার মধ্যে অনিবার্যভাবেই সংঘাত দেখা দিল। জ্ঞানতত্ত্বের মধ্যে নতুন ভাবধারা এলো। অবশ্য এ কাজে ম্যাকের প্রকাশিত কয়েকটি মতবাদ তাঁকে যথেষ্ট যাহায্য করেছিল।

ম্যাককে বর্তমান ভৌতচিন্তায় বাস্তবতার জনক বলা যেতে পারে। তিনি ও আরও কয়েকজন বিজ্ঞানী এমন কয়েকটি ধারণার প্রবর্তন করেছিলেন যারা পদার্থ-বিদ্যার অগ্রগতিতে যথেষ্ট সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এদের মতে পদার্থ বিজ্ঞানে যেসব ধারণা প্রকৃত অর্থবহ তাদের সকলকে অন্ততঃ নীতিগত ভাবে পরীক্ষার সাহায্যে যাচাই করা যাবে।

উপরের কথাগুলোর অর্থ হল পদার্থ বিজ্ঞানে যখনই কোনো নিয়মের কথা বলা হবে তখনই তাকে পরীক্ষার আলোকে যাচাই করা সম্ভব হতে হবে। ইথার সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা এর একটি ভালো উদাহরণ। ইথার ধারণায় উৎপত্তিই হয়েছিল নিছক তত্ত্বের স্বার্থে এবং এমন কোনো পরীক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতা ছিল না যার সাহায্যে এই ধারণাকে প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।

প্রচলিত মতের বা ধারণার বিরোধিতা করেই আপেক্ষিকতাবাদের সূচনা। সমস্যার সঠিক সমাধানের জন্যে আইনষ্টাইন এমন সব ধারণার সন্ধান পেলেন যাদের সম্বন্ধে আগে লোকেরা আদৌ কৌতূহলী ছিল না। দুই ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় সংঘটিত দুইটি ঘটনার যুগপত্তার (Simultaniety) ধারণাকে কেন্দ্র করে এই নতুন চিন্তার উদ্ভব।

যুগপত্তার (Simultaniety) আপেক্ষিক চরিত্র

গতানুগতিক চিন্তাধারার বিরুদ্ধে আপেক্ষিকতাবাদের বলিষ্ঠ প্রতিবাদের সামনে কোনো সমালোচনাই দাঁড়াতে পারেনি। আগেই বলা হয়েছে যে আইনস্টাইন পরীক্ষার সাহায্যে যাচাই করা যায় এমন ধারণাই পদার্থবিজ্ঞানের আওতায় রাখতে চেয়েছিলেন। সাধারণ অভিজ্ঞতায় মনে হয় যে একজন নিরীক্ষক O যদি দুটি স্থানে দুটি ঘটনা একসঙ্গে ঘটতে দেখে তবে O নিরীক্ষকের সাপেক্ষে সুসম গতিবেগ নিয়ে চলছে এরকম একজন নিরীক্ষকের O′ কাছেও ঘটনা দুটি একই সঙ্গে ঘটছে বলে মনে

হবে। কিন্তু গণনার সাহায্যে দেখান যায় যে এটা ঠিক নয়। যদি নিরীক্ষক O ঘটনা দুটিকে (x_1 y_1 z_1) এবং (x_2, y_2, z_2,)-তে t সময়ে ঘটতে দেখেন, তাহলে নিরীক্ষক O এর সাপেক্ষে সুসম গতিবেগ v নিয়ে চলমান নিরীক্ষক O′ এর কাছেএকটি ঘটনা (x_1, y_1, z_1, t_1,) অপরটির (x_2, y_2, z_2, t_2,) আগে দেখা ঘটতে দেখা যাবে। সুতরাং নিউটনের চরম সময়ের ধারণার ওপর ভিত্তি করে যুগপত্তার সম্বন্ধে ধারণা পাল্টাতে হবে। যে যুগপত্তা আমরা এতদিন পর্যন্ত চরম বলে জেনেছি আপেক্ষিকতাবাদে তা দর্শকের ওপরে নির্ভরশীল হয়ে যাবে বা আপেক্ষিক হয়ে দাঁড়াবে।

আলোর গতিবেগের ভূমিকা

বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের নীতি অনুযায়ী প্রকৃতিতে সকল গতির উচ্চ সীমা হল আলোর গতিবেগ। প্রকৃতিতে এমন একটি নীতি সবসময় কাজ করে চলেছে যা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় আলোর গতিবেগের চেয়ে আরও বেশি গতিবেগ নিয়ে সংকেত পাঠানোর ব্যাপারটা একেবারে বাতিল করে দিচ্ছে। সংকেতটা যে ভাবেই পাঠানো হোক না কেন। এই তথ্যটিকে ধরে নিয়েই আইনস্টাইন তাঁর আপেক্ষিতাবাদ গড়ে তুলেছিলেন।

নিউটনের বলবিদ্যাতে আলোর গতিবেগের সর্বোচ্চ সীমার কথাটি স্বীকৃত নয়। এমন একটি ধারণা আছে যে ক্রমাগত বলপ্রয়োগের ফলে যে-কোনো বস্তুর পক্ষে যে কোনো গতিবেগ অর্জন করা অসম্ভব নয়। নিউটনের সূত্র অনুযায়ী কোনো বস্তুর গতি সমহারে বৃদ্ধি পায় যতক্ষণ বস্তুটির ওপর প্রযুক্ত বল ক্রিয়া করে। সুতরাং প্রচুর সময় হাতে থাকলে কোনো বস্তুর পক্ষে যে কোন গতিবেগ অর্জন করা অসম্ভব নয়।

আপেক্ষিকতাবাদের নীতি কিন্তু এটা মেনে নিতে পারে না। তাই আপেক্ষিকতাবাদ নিউটনের সূত্রগুলোকে এমনভাবে পরিবর্তিত করল যাতে কম গতিবেগের ক্ষেত্রে তাদের চেহারা অপরিবর্তিত থাকলেও বেশি গতিবেগের ক্ষেত্রে তারা অন্যরূপ নেবে। আপেক্ষিক বলবিদ্যার সাহায্যে আইনস্টাইন উচ্চ গতিসম্পন্ন ইলেকট্রন বা অন্যান্য প্রাথমিক কণাদের গতিবিধির সার্থক বর্ণনা দিতে সফল হলেন। তাদের প্রযোজ্যতা সম্বন্ধে কারুরই কোনো সন্দেহ রইল না।

আপেক্ষিক বলবিদ্যা

নতুন বলবিদ্যায় কয়েকটি নতুন এবং চমকপ্রদ পরিণতির কথা আছে যার জন্যে মানুষ মানসিকভাবে আদৌ প্রস্তুত ছিল না। আপেক্ষিতাবাদের নিয়মের মধ্যে আলোর গতিবেগ c এর আবির্ভাবও খুবই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, কেননা বলবিদ্যার সংগে

আলোর আপাতদৃষ্টিতে কোনো মিল নেই। এর ব্যাখ্যা হল এমন কোন যান্ত্রিক গতি থাকতে পারে না যার গতিবেগ আলোর গতিবেগ c এর থেকেও বেশি হবে। এই সীমা নির্দেশকারী ধ্রুবক c বলবিদ্যার নিয়মের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছে।

এই পর্যন্ত সব ঘটনাগুলোই মোটামুটিভাবে সংগত। এরপর আপেক্ষিকতা এমন কয়েকটি চাঞ্চল্যকর তথ্য পরিবেশন করল যাদের কথা মানুষ কোনো দিনই ভাবতে পারেনি। ধ্রুবক c যাদুদণ্ডের মতো কোনো বস্তুর ভরকে শক্তিতে রূপান্তরিত করে দিতে পারে। নতুন আপেক্ষিক বলবিদ্যার নিয়মাবলী থেকে আইনস্টাইনের বিখ্যাত সেই উপপাদ্যটি প্রমাণ করা যায় যার মূল কথা হল ঃ m ভরের কোন বস্তুর মধ্যে এমন শক্তি E এর অবস্থান আছে যার পরিমাপ হল $E=mc^2$। এর অর্থ হল যে ভর এতদিন জড় হিসাবে পরিচিত ছিল আসলে তা এক অন্তর্নিহিত শক্তির উৎস। এই অন্তর্নিহিত শক্তিকে উপযুক্ত পরিবেশে সক্রিয় করে তোলা যায়। $E=mc^2$ সমীকরণের সাহায্যে ভর এবং শক্তির সমপ্রকৃতির কথা প্রকাশ পায় এবং সেটাই বর্তমান যুগের আণবিক শক্তির মূল কথা।

আপেক্ষিকতাবাদের সকল ফলের মধ্যে সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হল ভরশক্তি সম্পর্কটি। উপরোক্ত সমীকরণের মূলকথাটি হল ঃ কেবলমাত্র ভরের মধ্যে শক্তি অবস্থান করে না; বিপরীতক্রমে কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তিরও সমতুল ভর থাকবে। যদিও ভর ও শক্তির সম্পর্কটির কথা আইনস্টাইনের আগে কিছু কিছু বিজ্ঞানীর মনে হয়েছিল, তবুও আইনস্টাইনের আগে এদের মধ্যেকার প্রকৃত সম্পর্কটি কেউই নির্ণয় করতে পারেন নি। ভর ও শক্তির মধ্যেকার সম্পর্কটি পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করা অনেকদিন পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। কেবল যখন পরমাণু-কেন্দ্রের ভিতরে পরিবর্তন আনা গেল তখনই পরীক্ষার সাহায্যে ভর-শক্তি সম্পর্ক সত্যের আলোকে যাচাই করা সম্ভব হল। সকল পরীক্ষায় ভর থেকে শক্তিতে রূপান্তর আইনস্টাইনের সূত্র অনুযায়ীই হচ্ছে।

সনাতনী পদার্থ বিজ্ঞান অনুসারে ভর বলতে জড়তা ছাড়া আর কিছুই নয়। এরই জন্যে কোনো বস্তু গতিশীল হবার পথে বাধা পায়। এর মতে ভরের পরিমাণ সবসময় ধ্রুবক হবে এবং একে ভাঙা গেলেও বাড়ানো বা কমানো যায় না। ভরের এই পরিবর্তনাতীত রূপের ধারণাটির মূলে আপেক্ষিকতাবাদ আঘাত হানল। শক্তিতে রূপান্তরিত করে ভরের পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি করা আর অসম্ভব রইল না। গতিবেগ যখন আলোর গতিবেগের কাছাকাছি আসবে তখনই এই পরিবর্তনের পরিমাণ বেশি করে প্রতীয়মান হবে।

সকল বস্তুর একটি ধর্ম আছে যা পর্যবেক্ষক সাপেক্ষে তাদের গতিবেগের উপর নির্ভর করে না। এটি হল স্থির অবস্থায় বস্তুটির ভর—স্থিতিভর নামেই যা অধিক

আইনস্টাইনের দৃষ্টি ভঙ্গি যদি যথার্থ হয় তবে এই এলিভেটর একটি নির্দেশতন্ত্র হিসাবে কাজ করতে পারে যার সাপেক্ষে জাড্যতা নিয়মগুলো খাটে। বস্তুত এই এলিভেটরের মধ্যে যদি একটি পড়ন্ত বস্তু নিয়ে পরীক্ষা করা যায় তাহলে দেখা যাবে বস্তুটি কখনই এলিভেটরের ভূমিতে পড়বে না। এলিভেটরের মধ্যেই ঝুলন্ত অবস্থায় থাকবে। বাইরের কোনো পর্যবেক্ষকের কাছে এই ধরণের বস্তুটিকে নিউটনের সূত্রমত g ত্বরণ নিয়ে পড়তে দেখা যাবে। নিজ নিজ পরিবেশে উভয় পর্যবেক্ষকই ঠিকই ভাবছেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে এমন কয়েকটি নির্দেশতন্ত্রকে জাড্য নির্দেশ-তন্ত্র হিসাবে চিহ্নিত করা যাবে যাদের সাপেক্ষে কোনো মুক্ত বস্তুর পড়ন্ত গতি স্থানবিশেষে অন্তর্হিত হচ্ছে।

এইভাবে আপেক্ষিকতাবাদ মাধ্যাকর্ষণের চরিত্রের ওপরে অপ্রত্যাশিতভাবে নতুন আলোকপাত করল। মাধ্যাকর্ষণের সঙ্গে আপেক্ষিকতাবাদের গাণিতিক সম্পর্কগুলি খুবই দুরূহ এবং এদের জন্য আইনস্টাইনকে বিশেষ গাণিতিক পদ্ধতির সহায়তা নিতে হয়েছিল। বহু বৎসরের সাধনার পর তিনি শেষ পর্যন্ত মাধ্যাকর্ষণ ও আপেক্ষিকতাবাদের সংযোগকারী সমীকরণগুলো খুঁজে পেয়েছিলেন। তাঁর তত্ত্বও দুইটি বস্তুর মধ্যে এমন একটি আকর্ষক বলের অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছে যার পরিমাণ প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী বস্তু দুইটি দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক, যতক্ষণ বলের পরিমাণ কম থাকে। এই হিসাবে নিউটনের সূত্র অনুযায়ী গ্রহনক্ষত্রাদি সংক্রান্ত সকল হিসাবেই মোটামুটিভাবে বজায় থাকছে।

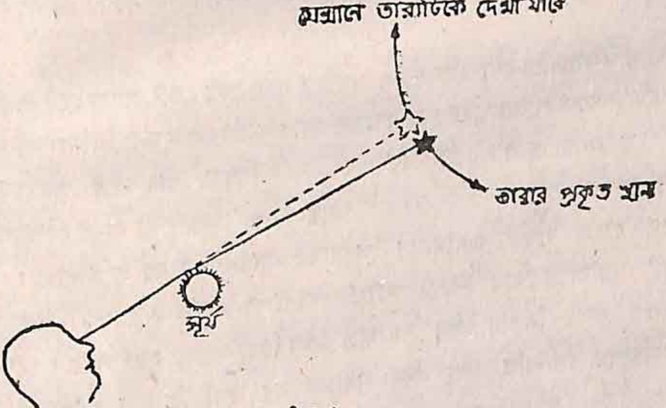
'মোটামুটি' ভাবে কথাটির অর্থ হল এই যে এমন একটি ঘটনা আছে সেখানে সনাতনী পদার্থবিদ্যা এবং আপেক্ষিকতাবাদ সম্পূর্ণ বিপরীত ফল দিচ্ছে। নিউটনের বলবিদ্যা অনুযায়ী একটি গ্রহের (অন্যান্য গ্রহের সামান্য প্রভাব ব্যতিরেকে) কক্ষপথ সবসময় উপবৃত্ত হবে। মঙ্গলগ্রহের ক্ষেত্রে আরেক ধরণের গতির সন্ধান পাওয়া গেছে। অন্যান্য গ্রহদের প্রভাব বাদ দিয়েও দেখা যায় যে মঙ্গল গ্রহের কক্ষপথটিও শূন্যে আবর্তিত হচ্ছে। এই আবর্তনের পরিমাপ অসম্ভব কম এবং ৩০০০০০০ বছরে একটি পূর্ণ আবর্তন হতে পারে। নিউটনের সূত্র থেকে এই ধরণের আবর্তনের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না, কিন্তু আপেক্ষিকতাবাদ সুস্পষ্ট-ভাবেই এই আবর্তনের কথা প্রমাণ করে। এই ধরণের আবর্তনের বাস্তব অস্তিত্বই আপেক্ষিকতাবাদকে পূর্ণ স্বীকৃতি দিচ্ছে।

আলোর ওপরে মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব

আলোর ওপর মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব বোধ করি সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভবিষ্যদ্বাণী। সনাতনী পদার্থবিজ্ঞানে কিন্তু এর কোনো

ব্যাখ্যা নেই। সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ এ ঘটনা অসম্ভব বলে মনে করেনা। এর মতে একটি মুক্ত বস্তু ছুঁড়ে দিলে মাধ্যাকর্ষণের জন্যে সেটি যেভাবে বেঁকে যায় আলোও মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্রের জন্যে সেইভাবে বেঁকে যাবে।

একটি এলিভেটর যদি একটি জাড্য নির্দেশতন্ত্র সাপেক্ষে ত্বরিত গতি নিয়ে উপরের দিকে ওঠে তখন যে অবস্থার সৃষ্টি হবে তার সাহায্যেই ওপরের কথাগুলি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। এলিভেটরের ভিতরে কোনো মুক্ত বস্তুকে থাকলে তাকে নিচের দিকে পড়তে দেখা যাবে। এলিভেটরের গতি একটি আপাত মাধ্যাকর্ষক ক্ষেত্রের সৃষ্টি করছে। এইবার ধরা যাক একটি আলোর রশ্মিগুচ্ছ একটি ছিদ্র দিয়ে ভূমির সঙ্গে সমান্তরালভাবে এলিভেটরের মধ্যে প্রবেশ করছে। এলিভেটরের মধ্যে যে পর্যবেক্ষক থাকবেন তাঁর মনে হবে এলিভেটরের ক্রমবর্ধমান গতির জন্যে আলো যেন চক্রাকারপথে যাচ্ছে। তাঁর মনে হবে মাধ্যাকর্ষক ক্ষেত্রের জন্যেই আলোর রশ্মিগুলো এমনভাবে বেঁকে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে মাধ্যাকর্ষণ ও ত্বরিত গতির একট সাদৃশ্য আছে। মাধ্যাকর্ষীয় ভর (Gravitational mass) ও জাড্যিক ভরের (Inertial mass) এক বলেই এই মিল।



চিত্র ৫

তারাটিকে দেখবার জন্য পর্যবেক্ষককে ভাঙা লাইনের বরাবর তাকাতে হবে। এর কারণ সূর্যের ধার ঘেঁষে যাবার সময় আলোক রশ্মি একটু বেঁকে যায় ফলে সূর্যের সঙ্গে একই সমান্তরাল রেখায় অবস্থিত তারাকে পর্যবেক্ষকের কাছে তারার নিজস্ব জায়গা থেকে একটু বেরিয়ে এসেছে মনে হয়।

উপরের পরীক্ষাটি কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সম্পাদন করা সম্ভব নয়। এর জন্য আইনস্টাইন বিকল্প পরীক্ষার কথা ভেবেছিলেন। দুরূহ পরীক্ষা হলেও কার্যক্ষেত্রে তা সম্পাদন করা সম্ভব হয়েছে। সূর্যের একই দিকে অবস্থিত তারা থেকে যে রশ্মি

পৃথিবীতে এসে পেঁছিচ্ছে তারা সূর্যের তীব্র মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্র অতিক্রম করে আসে। যদি আলোক রশ্মিগুলো সূর্যের দিকে একটু বেঁকে যায় তাহলে তারাদের বাহ্যিক অবস্থানের পরিবর্তন হবে। এই তারাগুলোকে দেখতে হলে পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সময় পর্যবেক্ষণ করতে হবে। পরীক্ষা করে এই ধরণের সরণের (Displacenent) অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে।

আপেক্ষিকতা ও জ্যামিতি

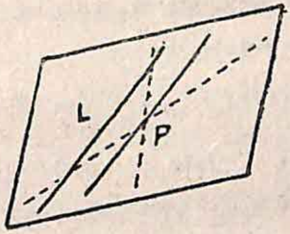
সম্পূর্ণ নতুনভাবে স্থানকাল সম্পর্ক ধারণা প্রবর্তন করলেও আপেক্ষিকতাবাদকে সনাতনী পদার্থ বিজ্ঞানেরই অংশ বলে ধরা হয়। কোয়াণ্টাম মতবাদের মতন সে পৃথিবীর সকল ঘটনাকে বিচ্ছিন্ন মনে করে না। এই পর্যন্ত আপেক্ষিকতাবাদ সনাতনী পদার্থ বিজ্ঞানের মূল কাঠামোর মধ্যে থাকছে।

একটা জায়গায় অবশ্যই আপেক্ষিকতাবাদকে চিরন্তন ভাবধারা থেকে কিছুটা সরে আসতে হয়েছে। নতুন ভাবাদর্শই এই সরে আসার কারণ। এই ভাবাদর্শটিকে জ্যামিতির সাহায্যে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে আপেক্ষিকতাবাদে। এর ফলে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের প্রকৃত চরিত্র সম্বন্ধে এক নব দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে।

আপেক্ষিকতাবাদে জ্যামিতি কাজে লেগেছে বলে কেউ কেউ অবাক হতে পারেন। ব্যাপারটি সম্বন্ধে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল হবার আগে কতগুলো জিনিস পরিষ্কার ভাবে বুঝে নেওয়া ভাল। জ্যামিতি এমন একটা বিজ্ঞান যার সঙ্গে পর্যবেক্ষণের কোনো সম্পর্ক নেই। অন্য কোন কিছুর ওপর নির্ভর না করেই স্বতন্ত্রভাবে একে গড়ে তোলা যায়। জ্যামিতির রূপরেখাও নানান্ রকমের হতে পারে। এই কারণেই জ্যামিতি কোন বিশেষ পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করে না। ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শের ওপর নির্ভর করে জ্যামিতি ভিন্ন ভিন্ন ধরণের হতে পারে। কোনো একটি বিশেষ জ্যামিতি সত্য এবং অন্যান্য সব জ্যামিতি ভুল এ ধরণের কিছু সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়। সাধারণ স্কুলে যে ধরণের জ্যামিতি শেখান হয় সেই ইউক্লিডের জ্যামিতি অনুযায়ী ত্রিভুজের তিনটি কোণের যোগফল ১৮০ ডিগ্রি কিন্তু এমন জ্যামিতিও আছে যেখানে তিনটি কোণের পরিমান ১৮০ ডিগ্রি থেকে বেশি বা কম।

কোন জ্যামিতি কি সিদ্ধান্তে নিয়ে যাবে সেটা নির্ভর করবে কী ধরণের মূল কাঠামো ব্যবহার করা হচ্ছে। ইউক্লিড পাঁচটি মূল বক্তব্যের ওপর দাঁড়িয়ে সুষ্ঠু বিচারে তাঁর পুরো জ্যামিতিকে দাঁড় করিয়েছিলেন। এদের মধ্যে একটি অন্ততঃ স্বতঃসিদ্ধ নয়। একটি সরলরেখা L এর বাইরে একটা বিন্দু P থাকলে P বিন্দু

দিয়ে একটি মাত্রই সরলরেখা টানা যাবে যা L সরলরেখাটিকে ছেদ করবে না। কিন্তু P বিন্দুতে একটি কোণের এমন সীমা কল্পনা করা যেতে পারে যাতে P বিন্দুগামী যে সকল সরলরেখা এই কৌণিক সীমার মধ্যে থাকবে তারা L সরলরেখাটিকে ছেদ করতে পারে না। এই ধারণার ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে অ-ইউক্লিড জ্যামিতি। ইউক্লিডের জ্যামিতি যে স্থানকে সমতল মনে করে অ-ইউক্লিড জ্যামিতি সেই স্থানকে বক্র হিসাবে দেখবে। দুইটি চিন্তাধারার মধ্যে এই হল তফাৎ।



চিত্র—৬

ইউক্লিডের জ্যামিতিতে L রেখার বইরে অবস্থিত যে কোন বিন্দু P দিয়ে কেবল একটা রেখাই টানা যাবে যা L রেখাকে ছেদ করবে না। এই রেখাকে L রেখার সমান্তরাল বলা হয়। P মধ্যে দিয়ে চলে গিয়েছে এরকম আর যে কোন রেখাকে বাড়াল সেটা L কে ছেদ করবে। এই অবস্থাকে চিত্র ৭ এর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।

বক্রতল জ্যামিতিরও দুটো চিন্তাধারা আছে। একটিতে সকল স্থানের বক্রতা সমান ধরা হয়। দ্বিতীয় ধারাটি অনেক বেশি ব্যাপক কেননা এখানে ভিন্ন ভিন্ন বিন্দুতে ভিন্ন ভিন্ন বক্রতা ধরা হয়। আপেক্ষিকতাবাদে এই ধারাটি কাজে লাগানো হয়।

কোনো স্থান সমতল বা বক্র বলতে কি বোঝায় বা এদের মধ্যে যে তফাৎ তা বুঝিয়ে বলা দুরূহ কাজ। ত্রিমাত্রিক স্থানে এসব কথার ব্যবহার কল্পনা করা প্রায় অসম্ভব। প্রকৃত পক্ষে দ্বিমাত্রিক স্থানেই বক্র বা সমতলের কথা ভাবা সম্ভব। দ্বিমাত্রিক স্থানের একটি ধর্ম হল যে যদি কোনো বস্তু তলস্থিত কোন নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে একটি নির্দিষ্ট দিকে যেতে থাকে তবে ঐ নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে বস্তুটির দূরত্ব ক্রমশঃ বাড়তে থাকবে। ঐ বিন্দু থেকে দূরত্বের কোনো উর্ধতন সীমা থাকবে না।

একটি বক্রতলে (যেমন একটি গোলক যার বক্রতা সব জায়গায় সমান) একটি বস্তু চলতে শুরু করলে অবস্থাটা অন্যরকমের হয়। কোনো বস্তু কোন একটি নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে যদি যাত্রা শুরু করে তাহলে প্রথমে মনে হবে সে যেন ঐ

বিন্দুটি থেকে ক্রমশঃ দূরে সরে যাচ্ছে। কিন্তু যতই সে কষ্ট করে সরলরেখায় চলুক না কেন গোলকের অর্ধ পরিসীমা অতিক্রম করার পর শুরুর নির্দিষ্ট বিন্দুটি থেকে তার দূরত্ব কমতে শুরু করবে। যে কোন আবদ্ধ বক্রতলেই এ ব্যাপার ঘটবে।

উপরোক্ত ধারণাগুলিকে ত্রিমাত্রিক ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত করার ব্যাপারে এটাই বলা যেতে পারে যে কোনো স্থানকে সমতল বা বক্রতল বলা যাবে তখন যখন এরা দ্বিমাত্রিক সমতল বা বক্রতলের বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকাশ করবে। একটি গোলাকার স্থানের ধর্ম হল আপনা থেকেই সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়া। এর মানে বক্রতলে একটি রেখাকে আপাত দৃষ্টিতে সরল মনে হলে অনেক দূর পর্যন্ত অনুসরণ করলে শেষ পর্যন্ত প্রারম্ভিক স্থানেই ফিরে আসতে হবে।

কোন্ জ্যামিতি সত্য ?

আগেই বলা হয়েছে যে, জ্যামিতি এমন একটি বিষয় যা কয়েকটি সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করে গড়ে উঠতে পারে। এই সব মূল সিদ্ধান্তের ভিন্নতায় জ্যামিতির চেহারাও বদলাবে। কিন্তু আগে থেকেই বলা সম্ভই নয় যে ইউক্লিড ও অ-ইউক্লিড জ্যামিতির মধ্যে কোন জ্যামিতি বাস্তবে প্রযোজ্য হবে। সঠিক পরিমাপের সাহায্যেই এই প্রশ্নের সমাধান করতে হবে। নমুনা হিসাবে মেপে দেখা যেতে পারে ইউক্লিডের দাবি অনুসারে একটি ত্রিভুজের তিনটি কোণের যোগফল সত্যিই ১৮০° ডিগ্রি কিনা।

পরিমাপের কাজ হাতে নেবার সাথে সাথে একটি অপ্রত্যাশিত অসুবিধার সৃষ্টি হয়। ত্রিভুজের তিনকোণের যোগফল বার করতে গেলেও অসুবিধা দেখা দেয়। একটি ত্রিভুজকে নির্দেশ করতে হলে তিনটি বিন্দু ঠিক করে সরলরেখার সাহায্যে বিন্দুত্রয়কে যোগ করতে হবে। একাজ করার আগে 'সরলরেখা' কী তা পরিষ্কার করে বুঝতে হবে। সরলরেখা সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা তা কিন্তু জ্যামিতির সাহায্যে বিধিবদ্ধ করা হয়নি। সরলরেখার ধারণা একটি মৌল ধারণা যা অন্য কোনো ধারণা থেকে সৃষ্ট বলে ভাবা যাবে না। অনুভূতির সাহায্যেই এর অস্তিত্ব বুঝতে হবে।

সরলরেখার ধারণাটি কল্পনায় থাকা পর্যন্ত কোনো ক্ষতি নেই, কিন্তু সরলরেখা টানতে গেলেই বিপত্তি। একটি স্কেল সরলরেখায় আছে কিনা বোঝা যায় ধারগুলো দেখে। এর অন্তর্নিহিত অর্থ হল আলোক রেখার গতিপথই সরলরেখার সংজ্ঞা ঠিক করছে। কিন্তু কী ভাবে জানা যাবে যে আলোক রশ্মি সরলরেখায় যায়। একটু ভাবলেই দেখা যাবে যে আলোক রশ্মি সরলরেখায় যায় এটা একটা অনুমানমাত্র। সঠিক ভাবে বলতে গেলে অনুমানটি আরোপিত প্রয়োজনীয়তা যার সঙ্গে পরিমাপের সঙ্গতি রয়েছে। আলোক রশ্মির বদলে পর্যবেক্ষক এমন

একটি চলমান বস্তু ব্যবহার করতে পারত যার ওপর কোনো বল ক্রিয়া করছে না এবং যার গতিপথই সরলরেখার স্বরূপ নির্দেশ করছে।

বাস্তব ক্ষেত্রে জ্যামিতির ধারণা ব্যবহারের উদ্দেশ্য শুধু জ্যামিতিকেই আরও ভালোভাবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে তা নয়, পরন্তু এর ব্যবহার এমনভাবে করতে হবে যাতে এর সাহায্যে আমরা প্রাকৃতিক নিয়মগুলোর সরলরূপ দিতে পারি। আলোক রশ্মির গতিপথের সঙ্গে সরলরেখার অভিন্নতা আরোপ করা হলে তার অর্থ হবে ''আলোকরশ্মি সরলরেখায় গমন করে।'' আলোক তত্ত্বের এই নিয়মটিকে পুরোপুরি প্রতিষ্ঠা করা যায় না বা পুরোপুরি অস্বীকারও করা যায় না। এর কারণ হল নিয়মটির মধ্যে কোনো বস্তুগ্রাহ্য দিক নেই। এর একমাত্র কাজ হলো সরলরেখা বলতে কী বোঝায় তা নির্দিষ্ট করা। সুতরাং কেবলমাত্র সংজ্ঞা হিসাবে পরিচিত হওয়ার জন্যেই এই নিয়ম যা অভিজ্ঞতালব্ধ কোনো ব্যতিক্রমের হাত থেকে কোনো ক্রমে রেহাই পেয়েছে।

প্রচলিত কোনো সংজ্ঞাই সম্পূর্ণ সত্য বা মিথ্যা নয়। তাদের বিচার করতে হবে তারা আমাদের কতখানি উদ্দেশ্য সাধন করে তাই দেখে। একটি সংজ্ঞা তখনই খুব প্রয়োজনীয় হবে যখন তার সাহায্যে সরল প্রাকৃতিক নিয়ম তৈরি করা যাবে। আলোক তত্ত্বে যে সংজ্ঞাটির কথা বলা হয়েছে সেই অনুযায়ী জাড্যতা নিয়মের মূল বক্তব্য হল কোনো বস্তুর ওপর বাইরের থেকে বল প্রযুক্ত না হলে বস্তুটি সমগতিতে আলোক রশ্মি যে দিকে যায় সেদিকে যাবে। যেহেতু আলোর গতিপথকে সরলরেখা বলা হয়েছে সেইহেতু বস্তুটিও সুসম গতিতে সরল রেখায়ও চলবে। জাড্যতা নিয়মের এই সরলতাটি কিন্তু মানুষের সৃষ্টি ; কারণ এই নিয়মটির কার্যকারিতা নির্ভর করে আছে 'আলোক রশ্মির গতিপথই সরলরেখা নির্দেশ করবে' এই ধারণার ওপর। উপরের অনুমানটি যে করতেই হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। আলোক রশ্মির গতিপথ বক্র হবে এও অনুমান করা যেতে পারত। তখন অবশ্য জাড্যতা নিয়মটি তার সারল্যটিকে হারাত এবং নতুনভাবে তাকে বিধিবদ্ধ করতে হত।

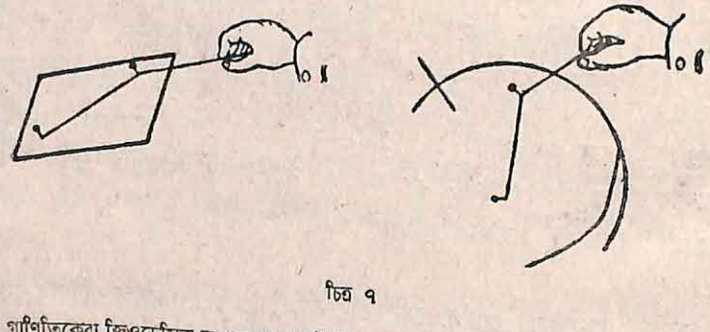
সুবিধা অনুযায়ী জ্যামিতিকে তৈরি করে নিয়ে তার সাহায্যে পরিমাপ সম্ভব হচ্ছে বলেই প্রাকৃতিক নিয়মগুলো এত সরল মনে হচ্ছে। অবশ্য এর মধ্যে প্রকৃতিরও কিছু অবদান আছে। এমনও হতে পারত যে কোনো জ্যামিতির সাহায্যেই প্রাকৃতিক নিয়মের সরলরূপ পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। অবস্থাটা যে এমন হয়নি তার জন্যে বিজ্ঞানের কোনো কৃতিত্ব নেই। এর একমাত্র কারণ প্রকৃতির মধ্যেই এক বৈশিষ্ট্যগত সরলতার অস্তিত্ব আছে, যাকে ব্যবহারযোগ্য জ্যামিতির সাহায্যে গাণিতিক পরিভাষায় বেঁধে ফেলা যায়।

পদার্থ বিজ্ঞানের জ্যামিতিকরণ ও আপেক্ষিকতা

উপরের আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খায় এমন একটি জ্যামিতির সাহায্যেই প্রকৃতির সরল নিয়মগুলো খুঁজে পাওয়া দরকার। সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের উদ্দেশ্য হল এমনই একটি জ্যামিতি খুঁজে বার করা। আগেই দেখান হয়েছে জ্যামিতি কোনো স্থানের (আরও ঠিকভাবে স্থানকালের) বক্রতার উপর নির্ভর করে। সেই কারণে প্রত্যেক স্থান-কাল সংঘটনার বক্রতা জানা দরকার।

সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের মূল নিয়মটি হলো ঃ কোনো স্থান কালের বক্রতা সেই স্থানের বস্তুর ঘনত্বের সঙ্গে সমানুপাতিক হবে। যদি এই ঘনত্বের পরিমাণ শূন্য হয় তবে সেখানকার বক্রতা থাকবে না। এই স্থানের নিকটবর্তী অংশে ইউক্লিড জ্যামিতি ব্যবহার করা চলবে। সুতরাং এক্ষেত্রে এমন একটি নির্দেশক থাকতে পারে যার সাপেক্ষে আলোকরশ্মি বা বাইরের বলমুক্ত কোনো বস্তু সরলরেখা ভ্রমণ করবে। অপর পক্ষে যে স্থানে বস্তু ঘনত্ব শূন্য নয় সে স্থান বক্র হবে এবং সরলরেখার পরিবর্তে গোলক জ্যামিতিতে ব্যবহৃত জিওডেসিক (Geodesic) রেখা বোঝাবে।

এ ধরণের চিন্তা যাঁরা বিজ্ঞানের সঙ্গে সংযুক্ত নয় তাঁদের অবাক করবে। তাঁদের মনে হবে যে যেন কোনো দুরূহ জ্যামিতির মধ্যে ভুলবশতঃ চলে এসেছেন। প্রকৃতপক্ষে পদার্থবিদ্যাকে জ্যামিতির আলোকে বিশ্লেষণ করা ও প্রকৃতির সকল

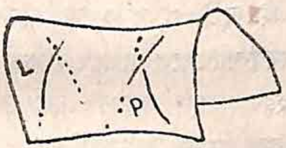


চিত্র ৭

গাণিতিকেরা জিওডেসিক রেখা বলতে দুটি বিন্দুর মধ্যে সবচেয়ে ছোটো রেখাটিকেই বোঝান। যদি এই রেখাটি একটি সমতলে থাকে তবে রেখাটি একটি সরল রেখা হবে। একটি সমতল বোর্ডের ওপর দুটো পিন লাগিয়ে তাদের একটি সুতো দিয়ে যোগ করলেই এই রেখাটি পাওয়া যাবে। কিন্তু সমতলের বদলে যদি একটি বক্রতলে দুটো বিন্দুকে যুক্ত করা যায় তাহলে সরল রেখা পাওয়া যাবে না অর্থাৎ জিওডেসিক লাইন আর সরলরেখা থাকবে না। আপেক্ষিকতা তত্ত্ব অনুযায়ী পার্থিব বস্তুদের গতিপথ বা আলোর গতিপথ সবই বক্র কারণ যে তলে এদের গতিপথগুলো থাকছে সেটাই বক্র।

নিয়মকে জ্যামিতির উপপাদ্যে পর্যবসিত করাই আপেক্ষিকতাবাদের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। এর একটি বিরাট তাৎপর্য আছে। আগেই বলা হয়েছে যে জ্যামিতি এমন-একটি বিজ্ঞান যা অভিজ্ঞতা-নির্ভর নয়। কেবল মাত্র বিশুদ্ধ যুক্তির সাহায্যেই এর সৃষ্টি। যদি পদার্থবিজ্ঞানী প্রকৃতির নিয়মগুলোকে কোনো জ্যামিতির পর্যায়ভূক্ত করে ফেলতে পারেন তাহলে পদার্থবিদ্যা বস্তু-নির্ভরতা ত্যাগ করতে পারে ও প্রাকৃতিক নিয়মগুলো স্বাধীন সত্তা পেতে পারে।

স্বাভাবিক ভাবেই এ ব্যাপারে একটি সীমারেখা আছে। দৃশ্যমান সব কিছুকেই তো আর জ্যামিতির আওতায় আনা যাবে না। তাই যদি যেত তাহলে সব কিছুই জ্যামিতির সাহায্যে বোঝা যেত। বস্তুতঃ বিজ্ঞান দেখতে পেল প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যাপক জ্যামিতিকরণের পরেও আরো কয়েকটি নিয়ম রইল যারা জ্যামিতির আওতার সম্পূর্ণ বাইরে এবং এদের একটি বস্তুগ্রাহ্য রূপ আছে এবং অভিজ্ঞতার উপর একান্তভাবেই নির্ভরশীল।



চিত্র ৮

উপরের আঁকা তলের (P) বিন্দু দিয়ে একটির বেশী জিওডেসিক রেখা টানা যেতে পারে যারা একটি নির্দিষ্ট জিওডেসিক রেখাকে (L) কখনই অতিক্রম করতে পারবে না। এ ধরণের রেখাগুলিকে L সমান্তরাল হিসাবে ভাগ হয়।

আপেক্ষিকতাবাদের তাৎপর্য

প্রশ্ন উঠবে আপেক্ষিকতাবাদ তাহলে পদার্থবিজ্ঞানে কি বিরাট পরিবর্তনের সূচনা করল?

কতকগুলি মৌলিক নিয়ম বার করে পদার্থবিজ্ঞানের ভাণ্ডারকে আরও সমৃদ্ধ করার মধ্যেই কিন্তু আইনস্টাইনের সকল কৃতিত্ব নয়। স্থানকালের আওতায় বিরাট অর্থবহভাবে পদার্থকে সংশিলষ্ট করাই আইনস্টাইনের সবচেয়ে বড়ো কৃতিত্ব। এটা তিনি বুঝেছিলেন যে প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটনের ব্যাপারে পদার্থবিজ্ঞান চরম বস্তুগ্রাহ্যতা কখনই প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না। সুতরাং এমন কোনো তত্ত্ব খাড়া করা সম্ভব নয় যার মধ্যে ব্যক্তিনির্ভর চিন্তা ভাবনা একেবারে নির্মূল হয়ে যাবে। বরং সকল বস্তুকে একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনার সাহায্যে স্থানকালের গণ্ডীর মধ্যে যতটা সম্ভব আনার চেষ্টা করতে হবে আর এই পরিকল্পনা বিজ্ঞানই সৃষ্টি করবে।

সত্যি বলতে কি, এই ধরণের পরিকল্পনা একেবারে যথেচ্ছ হতে পারে না। পরীক্ষালব্ধ ফল দিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে যোগসূত্র প্রতিষ্ঠা করে এই পরিকল্পনার যথার্থ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এতে অবশ্য পরিকল্পনার ব্যক্তিকেন্দ্রিক দিকটি একেবারে বাদ দেওয়া যাচ্ছে না। বিজ্ঞানীরা ইচ্ছে করলেই বিভিন্ন পরিকল্পনা খাড়া করতে পারেন। এর ফলে হয়ত তাঁদের আবিষ্কৃত নিয়মগুলো সরল না হয়ে খুবই কঠিনভাবে আত্মপ্রকাশ করবে। আপেক্ষিকতাবাদ এই মতন পোষণ করে যে চিন্তাশীল মানুষ প্রকৃতি ও নিয়মের মধ্যে যোগসূত্র হিসাবে কাজ করবে। প্রকৃতির পরিকল্পনার মধ্যে যে বিরাট সরলতা আত্মগোপন করে আছে তাকে খুঁজে পাবার অজানা পথটির সন্ধান তাঁর অনুভূতিই দেবে কোনো-না-কোনো একদিন।

আরেকটি বিষয়ের কথা ভাবা দরকার। পরিকল্পনাকে কাজে লাগাতে আপেক্ষিকতাবাদকে স্থান কালের প্রচলিত ধারণাকে পরিত্যাগ করতে হয়েছে। আপেক্ষিকতাবাদের চোখে স্থান ও কালের কোনো পৃথক সত্তা নেই, একটি চতুর্মাত্রিক জগতের মধ্যে এই দুটি পৃথক পৃথক জিনিস পরস্পরের অঙ্গাঙ্গী হয়ে এর মূলগত অর্থ হলো পদার্থবিদ্যা থেকে সাধারণ বুদ্ধির ব্যাপারটা সম্পূর্ণভাবে বিসর্জন দিতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ, আগেই বলা হয়েছে সকল স্থানের একটি বক্রতা আছে যা স্থানীয় বস্তু ঘনত্বের সমানুপাতিক। এই বক্রতা স্থানের বেলায় যেমন প্রযোজ্য সময়ের বেলায় তেমনি প্রযোজ্য। স্থানের বক্রতার ব্যাপারটা বিস্ময়কর হলেও হয়ত ততখানি অকল্পনীয় নয় যতখানি না সময়ের বক্রতা।

আপেক্ষিকতাবাদ পদার্থবিজ্ঞানকে সকল কল্পনার আশ্রয় থেকে মুক্ত করতে চায়। পরবর্তী কালে কোয়াণ্টাম মতবাদ আরও গভীর ও ব্যাপক ভাবে ব্যাপারটি-কে সীমায়িত করতে চেয়েছে। দুটি মতবাদেই প্রাকৃতিক ঘটনাকে কল্পনার সাহায্যে বোঝার চেষ্টাকে অসম্ভব বলে মনে করা হয়েছে। ক্রমে ক্রমে দেখা গেল সাধারণ বুদ্ধিসঞ্জাত ধারণাগুলি অনেক নতুন ও সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণকে সরল নিয়মের সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হল। এই ব্যর্থতার ভগ্নস্তূপেই ভিত রচিত হল নতুন জ্ঞানের, নতুন উপলব্ধির।

———

নতুন পদার্থবিদ্যার সূচনা

৩

"তোমরা দূর থেকে মনে কর যে, আমি পরিতৃপ্তির সঙ্গে আমার বিগত জীবনের কাজের কথা চিন্তা করি। কিন্তু কাছে থেকে সব কিছু অন্য রকম দেখায়। এমন একটি বৈজ্ঞানিক ধারণাও নেই যার সম্বন্ধে আমার দৃঢ় প্রত্যয় আছে যে, সেটি চিরকাল অবিচল থাকবে।"

—আইনস্টাইন

প্লাঙ্কের প্রকল্প

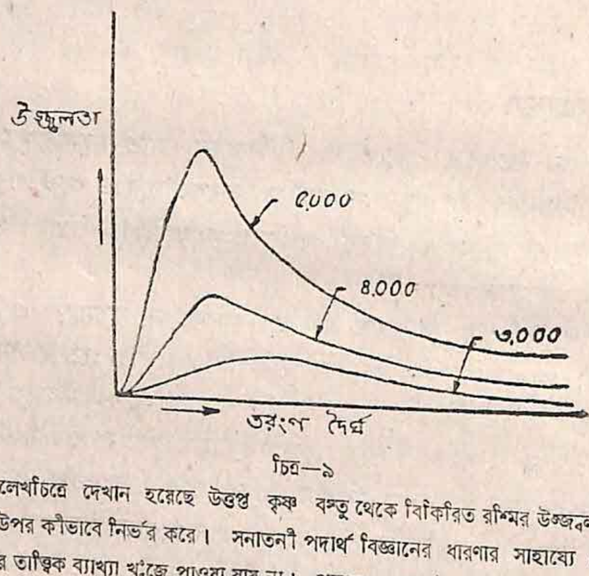
বর্তমান শতাব্দীর শুরুতে পদার্থ বিজ্ঞানের গতি নতুনদিকে মোড় নিল। পদার্থ বিজ্ঞানের এই নতুন পরিবর্তনের তাৎপর্য শুরুতে স্পষ্ট বোঝা যায়নি। প্রকৃতপক্ষে এই পরিবর্তনই পরবর্তী তিনযুগে পদার্থ বিজ্ঞান-চিন্তায় বহু বৈপ্লবিক ভাবধারা প্রবর্তনের পদক্ষেপ।

কোন্ জিনিসকে কেন্দ্র করে এই বিরাট পরিবর্তনের সূচনা? এ কি সত্য যে সনাতনী পদার্থবিদ্যা ভুল প্রমাণিত হয়ে গেল এবং বাধ্য হয়ে বিজ্ঞানীদের নতুন চিন্তাধারার আশ্রয় নিতে হল? তাড়াহুড়ো করে এ ধরণের সিদ্ধান্তে আসা খুব ভালো হবে না। সনাতনী পদার্থ বিজ্ঞান দৃশ্যমান জগত সম্বন্ধে সকল পরীক্ষার ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে এবং সেখানে আজও তার সন্দেহাতীত কার্যকারিতা। স্থাপত্য শিল্পী বা যন্ত্রবিদকে তাঁর কাজের জন্যে কোনো কোয়াণ্টাম মতবাদের বইতে হাত দিতে হবে না। তাঁর কাজের জন্যে প্রচলিত জ্ঞানই যথেষ্ট। যাঁরা অদৃশ্য জগতে মৌলকণাদের নিয়ে গবেষণা করেন, কেবল তাঁদেরই ক্ষেত্রে সনাতনী পদার্থ বিজ্ঞানের চেয়ে ভিন্ন এক পদার্থ বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। এই পদার্থবিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য হল যে এর সকল সমীকরণের মধ্যে একটি সর্বজনীন ধ্রুবকের অস্তিত্ব। এই ধরণের একটি সমীকরণের প্রবর্তক হলেন জার্মান বিজ্ঞানী ম্যাক্স্ প্লাঙ্ক।

একটি উত্তপ্ত কৃষ্ণ বস্তু খণ্ড থেকে বিকীর্ণ তাপ শক্তি বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ওপরে কীভাবে নির্ভর করবে সেটা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্লাঙ্ক এই ধ্রুবকটির সন্ধান পান। আলো বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে বিশ্লেষণ করা যায়। এই যন্ত্রটির

মাধ্যমে সাদা আলো তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অনুযায়ী বিভিন্ন রঙে ভেঙ্গে যায়। এর ফলে যে নমুনার সৃষ্টি হয় তাকে বলা হয় বর্ণালী। সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করতে পারলে এর সাহায্যে আলোর উৎস ও তার অবস্থা সম্বন্ধে অনেক তথ্যই পাওয়া যায়।

ভিন্ন ভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো বর্ণালীর নির্দিষ্ট জায়গা অধিকার করে। উত্তপ্ত কৃষ্ণ বস্তু থেকে অবিচ্ছিন্ন বর্ণালী পাওয়ার অর্থ হল বস্তুটির মধ্য থেকে সকলপ্রকার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোই উৎসারিত হচ্ছে। কিন্তু দেখা গেছে যে বর্ণালীর সকল তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোর তীব্রতা সমান নয়। যদি তীব্রতা বনাম তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের লেখাচিত্র টানা যায় তবে নিচের ছবির মতো কতকগুলি ছবি পাওয়া যায়। সাধারণ চরিত্রটি কিন্তু এদের মোটামুটি ভাবে এক এবং সবচেয়ে উপরের ছবিটি উত্তপ্ত বস্তুর সর্বাপেক্ষা অধিক উষ্ণতা নির্দেশ করে।



চিত্র—৯

উপরের লেখচিত্রে দেখান হয়েছে উত্তপ্ত কৃষ্ণ বস্তু থেকে বিকীরিত রশ্মির উজ্জ্বলতা তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের উপর কীভাবে নির্ভর করে। সনাতনী পদার্থ বিজ্ঞানের ধারণার সাহায্যে এ ধরণের লেখচিত্রের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না। প্লাঙ্কের কোয়ান্টাম প্রকল্পের সাহায্যে সঠিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

প্লাঙ্ক অঙ্কের সাহায্যে লেখচিত্রের এ ধরণের প্রকৃত ব্যাখ্যা করার কাজে ব্রতী হন। আগেকার এ ধরণের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে। সুতরাং প্লাঙ্কের ধারণা হল যে সনাতনী পদার্থ বিজ্ঞানের সাহায্যে একটি মোটামুটি ব্যাখ্যাও খাড়া করা যাবে না। তাঁর সকল চিন্তা এই ধারণাই বদ্ধমূল করল যে বিকিরণের বিচ্ছুরণ (Emisson) এবং শোষণ (Absorption) প্রক্রিয়াগুলি অবিরাম হতে পারে না।

তখন স্বীকৃত ধারণা ছিল যে ইলেকট্রনের কম্পনই আলোক সৃষ্টি করে এবং এই ব্যাপারটি সময়ের সঙ্গে অবিরাম চলতে থাকে। প্লাঙ্ক দেখতে পেলেন যে এই

ধারণা যদি সত্য হয় তবে তার ওপর নির্ভর করে যে ফল আশা করা হচ্ছে তার সঙ্গে পরীক্ষালব্ধ ফলের সম্পূর্ণ মিল পাওয়া যায় না। তিনি লক্ষ্য করলেন পরীক্ষালব্ধ ফলের সঙ্গে তত্ত্ব-লব্ধ ফলের মিলন ঘটাতে গেলে বিকিরণকে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন শক্তিসম্পন্ন কণার সমষ্টি হিসাবে ভাবা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। সকল বস্তুকে আমরা যেমন পরমণুর সমষ্টি হিসাবে ভাবি, এটাও অনেকটা সেরকম। এই নতুন মত অনুযায়ী পরমাণু থেকে আলোর বিচ্ছুরণ একটি সুনির্দিষ্ট অবিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়—কয়েকটি পদক্ষেপে এ ঘটনা ঘটে থাকে। প্রতিবার পরমাণু একটিমাত্র নির্দিষ্ট শক্তিসম্পন্ন আলোককণা বা ফোটন (photon) ছেড়ে দিতে পারে।

অনুরূপভাবে আলোক বস্তু কর্তৃক শোষিত হবার ব্যাপারটাও অবিচ্ছিন্ন নয়—বিচ্ছিন্ন ঘটনার সমষ্টিমাত্র। এখানেও প্রতিবারে বস্তু বাইরের থেকে একটি ফোটন গ্রহণ করে।

তত্ত্বকে প্রকৃত পরীক্ষালব্ধ ফলের সঙ্গে মেলাতে গিয়ে প্লাংক একটি মৌলিক অনুমান করতে বাধ্য হলেন। এই অনুমানের স্বরূপটি হল যে বিকিরণের একটি কণা বা ফোটনের শক্তি সেই বিকিরণের কম্পন-সংখ্যার ওপর নির্ভর করবে। শক্তি ও কম্পন সংখ্যার মধ্যে বিখ্যাত সম্বন্ধ হল—

$$E=hf$$

এখানে E ও f যথাক্রমে ফোটনের শক্তি ও কম্পন-সংখ্যার নির্দেশ করছে। h একটি ধ্রুবক যাকে 'প্লাংকের ধ্রুবক' বলা হয়। এই সূত্রানুসারে স্বল্প তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বা উচ্চ কম্পনসংখ্যা বিশিষ্ট ফোটন অধিক শক্তিসম্পন্ন হবে। রঞ্জন রশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য দৃশ্যমান আলোকরশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের চেয়ে প্রায় ১০০০ গুণ ছোটো। সেই কারণেই রঞ্জন রশ্মির একটি ফোটনের শক্তিও দৃশ্যমান আলোর একটি ফোটনের তুলনায় ১০০০ গুণ বেশি।

১৯০০ সালে প্লাংক তাঁর এই বিপ্লবসৃষ্টিকারী তত্ত্বটিকে প্রকাশ করেন। সেই সময় কেউই আশা করতে পারেন নি যে এই অদ্ভুত তত্ত্ব প্রকৃতি সম্বন্ধে মানুষের ধারণাকে বিরাটভাবে পরিবর্তিত করে দিতে পারে। তাই শুরুতে এই তত্ত্বের ভাগ্যে জুটল কেবলমাত্র অবিশ্বাস। সনাতনী ধারণার পরিপন্থী এই নতুন চিন্তাকে এতই অবিশ্বাস্য মনে হল যে কেউই একে খুব ঐকান্তিক ভাবে গ্রহণ করতে চাইলেন না। আলোর তরঙ্গবাদের মত প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব তখন আর ছিল না। তাই সকলে ভাবলেন আলোর স্বরূপ যদি তরঙ্গই হবে তবে তা কিভাবে অবিভাজ্য কণা বা ফোটনের সমষ্টি হতে পারে। এমন কি স্বয়ং প্লাংকের কাছেও দুই তত্ত্ব পরস্পর বিরোধী মনে হয়েছিল। স্পষ্টতই যে ভাবে নতুন তত্ত্বটি পরিবেশন করা হয়েছিল ঠিক সেই ভাবে তাকে গ্রহণ করতে বিজ্ঞান প্রস্তুত ছিল না। অথচ তত্ত্বটির মধ্যে যে কিছুটা সত্য

আছে সেটাও নজর এড়াতে পারে নি। এক্ষেত্রে ভবিষ্যতের জন্যে অপেক্ষা করাই সব থেকে বুদ্ধিমানের কাজ মনে হয়েছিল এই ভরসায় যে পরে কোনোদিন হয়ত আরো যুক্তিনিষ্ঠ তত্ত্বের সন্ধান মিলবে।

রেখা বর্ণালী (Line specturm)—অণুজগতের সংবাদবাহক

প্লাংকের তত্ত্ব বাদ দিয়ে অন্য কোনো যুক্তিনিষ্ঠ তত্ত্ব খুঁজে পাওয়ার আশা ত্যাগ করতে হল। এর কারণ হল পরমাণু জগত সম্বন্ধে এমন কয়েকটি নতুন তথ্য পাওয়া গেল যারা প্লাংকের মতবাদকেই বিনা ব্যতিক্রমে সমর্থন করল। অদৃশ্য অণুজগতে দৃশ্যমান জগতের নিয়ম খাটে না—সনাতনী পদার্থবিজ্ঞানে সম্পূর্ণ অপরিচিত বিচ্ছিন্নতাই এদের মূলকথা। এই সত্যকটি মেনে নিয়েই নতুন তথ্যগুলির সম্যক ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া সম্ভব হল। পরমাণুর একটি অবস্থা থেকে অবস্থান্তরে যাওয়ার ব্যাপারে বৈশিষ্ট্যগত বাধানিষেধেই বিচ্ছিন্নতার মূলকথা। প্রকৃতি পরমাণুকে কয়েকটি নির্দিষ্ট অবস্থাতেই থাকতে অনুমোদন করে। একটি অবস্থা থেকে সে কেবল নির্ধারিত অন্যসকল অবস্থার যে কোনো একটিতে যেতে পারে বাকি সব অবস্থাকে বাদ দিয়ে।

১৯১৪ সালে জার্মান বিজ্ঞানী ফ্রাংক এবং হারট্‌জ্‌ সুকৌশলে পরমাণু শক্তিস্তরের বিচ্ছিন্নতা প্রমাণ করলেন। তাঁদের পরীক্ষায় উচ্চগতি সম্পন্ন ইলেকট্রন-গুচ্ছ পারদবাষ্প পূর্ণ একটি পাত্রে প্রবেশ করিয়ে নেওয়া হল। ইলেকট্রনগুলি পারদ পরমাণুদের সঙ্গে ধাক্কা খাওয়ার সময় পারদ পরমাণুদের কিছু শক্তি দিয়ে দেয়। পরীক্ষকদ্বয় দেখতে পেলেন যে শক্তির এ ধরণের হস্তান্তর হচ্ছে তখন যখন ইলেকট্রনের শক্তি অণুদের নির্ধারিত দুইটি অবস্থার মধ্যে শক্তির যে পার্থক্য তার সঙ্গে সমান। অন্য শক্তি সমন্বিত ইলেকট্রন ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসবে এবং শক্তির হস্তান্তর ঘটবে না।

অণুদের শক্তির এই যে বিচ্ছিন্নতা এটা আরো ভালোভাবে প্রকাশ পায় পরমাণুদের বর্ণালী মাধ্যমে। আগেই বলা হয়েছে যে কঠিন অবস্থায় বস্তু উত্তপ্ত হলে যে বর্ণালী সৃষ্টি করে তা অবিচ্ছিন্ন হয়। গ্যাসীয় পদার্থকে উচ্চ উষ্ণতায় তাপিত করলে বা তার মধ্যে তড়িৎ ক্ষরণ করলেও বর্ণালীর সৃষ্টি হয়। ধরা যাক কোনো বস্তু গ্যাসীয় অবস্থায় একটি কাঁচের পাত্রে নিম্নচাপে আবদ্ধ রাখা হল। এর মধ্যে উচ্চ বিভবে তড়িৎ পাঠালে আলো পাওয়া যাবে যেমনটি আমরা নিয়ন টিউবে পাই। বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এই আলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে এই ধরণের বর্ণালী উত্তপ্ত বস্তু খণ্ড থেকে নির্গত বর্ণালী থেকে ভিন্ন। রঙের অবিচ্ছিন্ন একটি টুকরো না হয়ে এই বর্ণালী কয়েকটি উজ্জ্বল

রেখার সমষ্টি। সকল অবিচ্ছিন্ন বর্ণালীর যেমন তফাৎ করার মত আলাদা কোন বৈশিষ্ট্য নেই, রেখা বর্ণালীর বেলায় কিন্তু পরমাণুর গঠন অনুযায়ী রেখাগুলি বিন্যস্ত হয়।



চিত্র ১০

একটি মৌলিক বস্তুর উজ্জ্বল রেখা বর্ণালী গ্যাসীয় অবস্থায় এ ধরণের বর্ণালী সৃষ্টি করা হয়। বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় ভিন্ন ভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো আলাদা হয়ে যায়। প্রত্যেকটি তরঙ্গদৈর্ঘ্য আলাদা রেখা হিসাবে প্রতীয়মান হয়। ভিন্ন ভিন্ন মৌলিক পদার্থের রেখা বর্ণালী চেহারাও ভিন্ন ভিন্ন।

প্রত্যেক রাসায়নিক বস্তুর রেখা বর্ণালীর নিজস্ব নমুনা আছে। এইজন্যে রেখা বর্ণালীর সাহায্যে অজানা কোনো বস্তুর উপস্থিতি নির্ণয় করা যেতে পারে। দৃশ্যতঃ অনেকগুলি পরমাণুর সমন্বয়ে যখন একটি কঠিন বস্তু তৈরি হচ্ছে তখন বৈশিষ্ট্যগত রেখা বর্ণালীগুলো মিশে গিয়ে অবিচ্ছিন্ন বর্ণালীর রূপ নিচ্ছে। কেবলমাত্র গ্যাসীয় অবস্থায় ও নিম্নচাপে পরমাণু তার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বর্ণালী উৎপাদন করতে পারে।

রেখা বর্ণালী পরমাণুদের সম্বন্ধে বহু তথ্য উদ্ঘাটন করে এবং তার ফলে তা অনুজগতের সংবাদবাহক হিসাবে কাজ করতে পারে। শব্দতত্ত্বের সঙ্গে একটি তুলনা এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে। একজন দক্ষব্যক্তি অদৃশ্য একটি ঘণ্টাধ্বনি বিশ্লেষণ করে ঘণ্টাটির আকৃতি আয়তন ও কি বস্তু দিয়ে তৈরি তা আন্দাজ করতে পারেন। একটি মাত্র নির্দিষ্ট ঘণ্টাই একটি নির্দিষ্ট শব্দ তৈরি করতে পারে। একই ভাবে একটি পরমাণু থেকে নির্গত বর্ণালীর সাহায্যের পরমাণুর নির্মাণ কৌশল এবং গঠন প্রণালীর সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা সম্ভব। একটি ঘণ্টার চেয়ে একটি পরমাণুর গঠন প্রণালী অবশ্য অনেক বেশি জটিল। তার ওপরে পরমাণু থেকে তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ বের হয় এবং একটি ঘণ্টা থেকে বের হয় শব্দতরঙ্গ যা চরিত্রে সম্পূর্ণভাবে যান্ত্রিক।

সনাতনী তড়িৎচুম্বকীয় তত্ত্ব অনুযায়ী পরমাণুর মধ্যস্থিত ইলেকট্রন সদাকম্পমান এবং তার থেকে কমবেশী তড়িৎচুম্বকীয় ক্ষেত্রের উৎপত্তি। এই ক্ষেত্রই তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের আকারে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সাধারণভাবে এই প্রবহমান তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গই বিকিরণ এবং তরঙ্গের কম্পন-সংখ্যা ইলেকট্রনের কম্পন

সংখ্যার সঙ্গে সমান। কার্যক্ষেত্রে কিন্তু এ ধরণের ব্যাপার ঘটছে না। উদাহরণ স্বরূপ হাইড্রোজেন পরমাণুর কথা ধরা যেতে পারে। হাইড্রোজেনের বর্ণালীতে দেখা গেছে অনেকগুলি উজ্জ্বল আলোকরেখার চমকপ্রদ সন্নিবেশ। এই রেখা সমষ্টির প্রত্যেকটির কম্পন-সংখ্যা আলাদা। অনেক তথ্য সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ করেছে যে হাইড্রোজেন পরমাণুর মধ্যে একটি মাত্র ইলেকট্রন আছে। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই হাইড্রোজেন বর্ণালীর মধ্যে বহু কম্পন-সংখ্যার উপস্থিতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিজ্ঞানকে বিরাট এক পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হল। প্রথমতঃ এটাই বুঝতে কষ্ট হলো কেন রেখা বর্ণালী দেখা যাবে। দ্বিতীয়ত যখন একটি পরমাণু বিকিরণ করে তখন তার পক্ষে কিছুটা শক্তি হারিয়ে ফেলা স্বাভাবিক। সুতরাং বিকিরণের ফলে ক্রমান্বয়ে শক্তি ক্ষয় হতে থাকবে এবং সঙ্গে বিকিরণও ছড়িয়ে পড়বে। এর অর্থ হবে নির্দিষ্ট কম্পনসংখ্যা বিশিষ্ট রেখা বর্ণালীর পরিবর্তে সকল প্রকার কম্পনসংখ্যার প্রতিনিধিত্ব করে এক অবিচ্ছিন্ন বর্ণালীর সৃষ্টি হবে।

হাইড্রোজেনের বর্ণালী

আরেকটি পরীক্ষালব্ধ ফলের বিষয় ভেবে দেখতে হবে। দেখা গেছে যে দৃশ্যতঃ অবিন্যস্ত বর্ণালী রেখাগুলোকে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীতে সাজানো যায়। প্রত্যেক শ্রেণীভুক্ত বর্ণালী রেখার কম্পন সংখ্যাগুলি একটি সরল গাণিতিক সূত্র বা ফরমুলা পালন করে চলে। এই ফরমুলা বেশ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এই ফরমুলার মধ্যস্থিত কোনো একটি রাশির বদলে ১, ২, ৩ ইত্যাদি ক্রমান্বয়ে বসিয়ে গেলে শ্রেণীভুক্ত সকল সকল রেখার কম্পন সংখ্যাগুলি একের পর এক পাওয়া যাবে। কম্পন সংখ্যাগুলো এই ভাবে বার করার সম্ভাব্য উপায়ের কথা সুইডিশ বিজ্ঞানী বামার ১৮৮৫ সালে প্রথম বলেছিলেন। এই সময়টি কোয়ণ্টাম মতবাদ আবির্ভাবের বহু আগে। বামারের ফরমুলার সব থেকে অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো এর মধ্যে পূর্ণ সংখ্যার উপস্থিতি। যে ফরমুলাটি থেকে সকল রেখার কম্পন সংখ্যা f পাওয়া যায় সেটি হল।

$$f = R' \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{m^2}\right)$$

R′ একটি ধ্রুবক। যদি m বদলে ক্রমান্বয়ে 3, 4, 5 ইত্যাদি বসানো যায় তবে হাইড্রোজেন বর্ণালীর দৃশ্যমান বা তার কাছাকাছি অংশের সকল রেখার কম্পন সংখ্যা পাওয়া যায় নির্ভুলভাবে। m=3তে যে কম্পন সংখ্যাটি পাওয়া যায় সেই কম্পন সংখ্যা বিশিষ্ট রেখাটিই সবচেয়ে বড় তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের এবং সেটি থাকবে বর্ণালীর লাল অংশের দিকে। এর পরের রেখাগুলি ক্রমে ক্রমে খুব ঘন

সন্নিবিষ্ট হয়ে আসে এবং m-এর খুব উচ্চমানের জন্যে শ্রেণীসীমার কাছে পৌঁছায়। এই শ্রেণীসীমা দৃশ্যমান বর্ণালীর যে অংশে বেগুনি রং থাকে তার সীমান্তে অবস্থিত।



চিত্র ১১

হাইড্রোজেনের রেখা বর্ণালী বিস্ময়কর অথচ সরল ও নিয়মিত একটি নকশা মেনে চলে। কোয়াণ্টাম মতবাদের প্রথম সাফল্য এল যখন তার সাহায্যে হাইড্রোজেনের রেখা বর্ণালীর প্রত্যেকটি রেখার তরঙ্গদৈর্ঘ্য নির্ণয় করা গেল। বামদিক থেকে দু'তিনটি রেখা বর্ণালীর দৃশ্যমান অংশে থাকে।

এই চমকপ্রদ ফরমুলার প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটনের জন্য বামার সম্ভবতঃ অনেক চিন্তাই করেছিলেন। কিন্তু তিনি কোন তত্ত্বে পৌঁছতে পারেন নি। তাঁকে একটি অভিজ্ঞতালব্ধ ফরমুলা বার করেই ক্ষান্ত থাকতে হল। অবশ্য ফরমুলাটি আশ্চর্যজনকভাবে নির্ভুল ফলদায়ক ছিল। দেখা গেল প্লাঙ্কের প্রকল্পই (যার মূল কথা হল আলো কেবল বিচ্ছিন্নভাবেই বিকিরিত হতে পারে) বামার আবিষ্কৃত ফরমুলার প্রকৃত তত্ত্ব জানার ব্যাপারে ভিত্তিভূমি রচনা করতে পারে। পরমাণু মধ্যস্থিত ইলেকট্রনের শক্তির কতকগুলি নির্দিষ্ট বিচ্ছিন্ন স্তর আছে। অনুমোদিত শক্তির উচ্চস্তর থেকে যখন ইলেকট্রনটি শক্তির নিম্নস্তরে নেবে আসবে তখনই একটি ফোটন নির্গত হবে। দুটি শক্তিস্তরের মধ্যে শক্তির যা তফাৎ সেই পরিমাণ শক্তিই ফোটনের সাথে বেরিয়ে আসবে। শক্তি ও নির্গত আলোকের কম্পন-সংখ্যার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক হবে প্লাঙ্কের প্রকল্প অনুযায়ী $E=hf$.

তাহলে এটা বোঝা সম্ভব হচ্ছে যে কেন বামানের ফরমুলার কম্পন-সংখ্যা দুটি সংখ্যার বিয়োগফল হিসাবে এসেছে। দুটি সংখ্যার বিয়োগফল আসলে ফোটন নির্গমনে যে দুটি শক্তিস্তর অংশ গ্রহণ করছে তাদের মধ্যেকার তফাৎ। অনুমান করা ভুল হবে না যে যদি কোয়াণ্টাম প্রকল্প ঠিক হয় তবে তা কেবল হাইড্রোজেনের বেলাই খাটবে না সকল মৌলিক পদার্থের রেখা বর্ণালীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। অবশ্য বিভিন্ন পদার্থের জন্যে ফরমুলার মধ্যে অবস্থিত রাশি-গুলির একটু রদবদল ঘটতে পারে।

পূর্ণ সংখ্যার তাৎপর্য

গ্রীক দর্শনে পূর্ণসংখ্যা বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। পিথাগোরাস কেবল পূর্ণসংখ্যার কথাই কেবল জানতেন এবং সকল জিনিসকে পূর্ণ সংখ্যার সাহায্যে প্রকাশ করা যায় এই কথার উপর নির্ভর করে তার ব্যক্তিগত দর্শন গড়ে তুলেছিলেন। এরকম একটি চরম মতবাদ গড়ে তোলার পেছনে কারণ হল শব্দতত্ত্বের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ যোগাযোগ। তিনি জানতেন সঙ্গীতের সুরের মধ্যে যে কোন একটি সুর ও তার অষ্টকের কম্পন-সংখ্যার অনুপাত ১ : ২ হবে। এর থেকেই তাঁর ধারণা হয় যে সুসমঞ্জস যে কোন জিনিস এমন কি সুদৃশ্য পৃথিবী পর্যন্ত পূর্ণসংখ্যার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। সে কারণে কোনো জিনিস সম্পূর্ণভাবে সংখ্যার সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যাবে। সমস্ত জিনিসটাই ছিল ব্যক্তিগত ভাবনাচিন্তার উপর নির্ভরশীল। কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি এর মধ্যে ছিল না। সুতরাং পিথাগোরাসের ধারণা কালে কালে অবাস্তব প্রতিপন্ন হয়ে গেল। একথাটি অবশ্য সত্যি যে সকল দুর্বলতা সত্ত্বেও পিথাগোরাসের ধারণাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া অন্যায় হবে। কারণ দেখা যাচ্ছে শেষ পর্যন্ত খানিকটা সকলের অজ্ঞাতসারেই বিজ্ঞান পরমাণুর গঠন প্রণালী ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পূর্ণসংখ্যার দ্বারস্থ হল।

পিথাগোরাসের পর ডেমোক্রিটাস বস্তুসকলের পরমাণুতত্ত্ব আরোপ করলেন। যে মুহূর্তে বোঝা গেল সকল বস্তু শেষ পর্যন্ত অভঙ্গুর কণাদের দিয়ে তৈরি সেই মুহূর্তে গণনা করার একটি ব্যাপার শুরু হয়ে গেল। ফলশ্রুতি হিসাবে ধীর পদক্ষেপে রসায়নের পূর্ণসংখ্যা-নির্ভর ভিত্তি রচিত হল।

বিগত শতাব্দীর শেষভাগে বোলজ্‌ম্যান পদার্থবিজ্ঞানে কতকগুলি ক্ষেত্রের সন্ধান পেলেন যেখানে পূর্ণসংখ্যার ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে গেল। তিনি বস্তুর একটি নির্দিষ্ট অবস্থায় আসার সম্ভাব্যতা ঐ অবস্থা তৈরি করার যতগুলি উপায় সেই সংখ্যার সাপেক্ষে বার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এটি একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হিসাবে স্বীকৃত হয়েছিল কারণ তাপ গতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রের পারিসাংখ্যিক ব্যাখ্যা এর সাহায্যেই পাওয়া গিয়েছিল।

ক্রমে ক্রমে দেখা গেল যে মৌলিক বস্তুর বর্ণালী পূর্ণসংখ্যার ওপর নির্ভর করে। পরোক্ষভাবে পরমাণুর ধারণা থেকেই এই সব তথ্য পাওয়া গেল বস্তুর সামগ্রিক রূপ থেকে নয়। প্লাঙ্কের সূত্র অনুযায়ী ফোটন গ্রহণ ও বর্জনের সাহায্যে পরমাণুর মধ্যে যে পরিবর্তন আসে তা অবিচ্ছিন্ন নয়, তা কেবল বিচ্ছিন্ন অভঙ্গুর ঘটনামাত্র।

বোরের হাইড্রোজেন পরমাণুতত্ত্ব

উপরের আলোচনার আলোকে ডার্চবিজ্ঞানী নিলস্ বোর ১৯১৩ সালে হাইড্রোজেন পরমাণুর ওপর তাঁর তত্ত্বটি প্রকাশ করেন। এই তত্ত্বে কোয়ান্টাম মতবাদ বিশ্বাসযোগ্য সফলতা লাভ করল। বোর সর্বতোভাবে চেষ্টা করেছিলেন সনাতনী পদার্থবিদ্যা থেকে খুব একটা বেশি বিচ্যুত না হতে। ফলে তাঁর তত্ত্বে কল্পনাযোগ্য জিনিসের উপস্থিতি ছিল।

হাউড্রোজেন পরমাণুকে বোর সৌরমণ্ডলীর ছোটো সংস্করণ হিসাবে ভেবেছিলেন। এক্ষেত্রে নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রীন হল সূর্য এবং ইলেকট্রন ভ্রাম্যমান একটি গ্রহ। এধরণের উপমার মধ্যে কষ্টকল্পনার স্থান নেই, কারণ দুটি গ্রহের মধ্যে ও দুটি তড়িতাধানের মধ্যে আকর্ষণের সূত্রের আংকিক রূপটি এক। দুটি ক্ষেত্রে বস্তুদ্বয়ের মধ্যেকার ক্রিয়াশীল বল তাদের মধ্যেকার দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক। এর অর্থ হল ইলেকট্রন তার কেন্দ্রীনের চারিপাশে তেমনি-ভাবেই ঘুরে বেড়াবে যেমনভাবে কেপলারের সূত্রানুযায়ী পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে।

এ পর্যন্ত সকল ধারণাই সনাতনী পদার্থবিদ্যার ওপর নির্ভর করে আছে। এতে বামারের সূত্রে যে পূর্ণসংখ্যার উপস্থিতি দেখা যায় তার সম্বন্ধে কোনো আলোকপাত হচ্ছে না। বোর দেখলেন কোয়াণ্টাম প্রকল্প সনাতনী পদার্থ-বিদ্যা কর্তৃক অনুমোদিত গতির সামগ্রিকতার মধ্যে থেকে কতকগুলি নির্দিষ্ট গতি আলাদা করে নিতে পারে। এদের সঙ্গে ক্রমিক পূর্ণসংখ্যা সংশ্লিষ্ট করা করা যাবে। তিনি আরও বুঝতে পারলেন যে পুরো ব্যাপারটাই কিছু শর্ত মেনে চলছে। বোরের বক্তব্য অনুযায়ী এই সকল শর্তের একটি হল ঃ ইলেকট্রনের সেই সকল কক্ষপথই অনুমোদিত হবে যে কক্ষপথের একটি যান্ত্রিক রাশি তথা "কৌণিক ভরবেগ" প্লাঙ্কের ধ্রুবকের (h) সরল গুণিতক হবে।

এই শর্ত আরোপ করে যে ফল পাওয়া গেল তা আশ্চর্যজনক। দেখা গেল ইলেকট্রন-শক্তির অবস্থা বিচ্ছিন্ন কতকগুলি শক্তিস্তরে প্রকাশ পাচ্ছে। প্রত্যেক স্তরের শক্তি এমন একটি সমীকরণের সাহায্যে লেখা যায় যার মূলে অবয়ব হলো $1/m^2$। শুধু তাই নয় বোর বামারের সূত্রে পওয়া R' এর মানও কতকগুলি বিশ্বজনীন ধ্রুবকের (যেমন তড়িৎ আধান, ইলেকট্রনের ভর এবং প্লাঙ্কের ধ্রুবক h) সাপেক্ষে বার করে ফেললেন। এইভাবে বার করা R' এর মান পরীক্ষালব্ধ R' মানের সঙ্গে এত সুন্দর ভাবে মিলে গেল যে তাতে সমস্ত জিনিসটাকে আকস্মিক বলে উড়িয়ে দেবার অবকাশ রইল না। নীতিগতভাবে বোরের তত্ত্বকে সঠিক বলে ধরে নিতে হল।

সনাতনী পদার্থবিদ্যা অনুযায়ী গতির অসংখ্য রূপ হতে পারে ; কিন্তু প্রকৃতি আসলে এই অসংখ্য রূপ থেকে বিশেষ কয়েকটি গতিই নির্বাচন করে নেয়। যে গতি-অবস্থাগুলো কোনো গাণিতিক সমীকরণে পূর্ণ সংখ্যা বসালেই পাওয়া যায় সেইসব গতি-অবস্থাগুলিই সম্ভব—বোরের তত্ত্বের বোধ হয় এটাই সবচেয়ে বড়ো সিদ্ধান্ত। পরমাণু বিচ্ছিন্ন ভাবে তার অবস্থা পরিবর্তন করতে পারে এবং সেটা সে করে এক স্থিতাবস্থা থেকে আরেক স্থিতাবস্থায় গিয়ে। এই সময়ে যদি পরমাণুর **শক্তিহ্রাস** ঘটে তবে সে হ্রাস-পাওয়া শক্তি এক কোয়াণ্টাম বিকিরণ শক্তিতে বা একটি **ফোটনে** রূপান্তরিত হয়ে যাবে। এই বিকিরণশক্তির কম্পাঙ্ক পাওয়া যাবে $E=hf$ সূত্র থেকে।

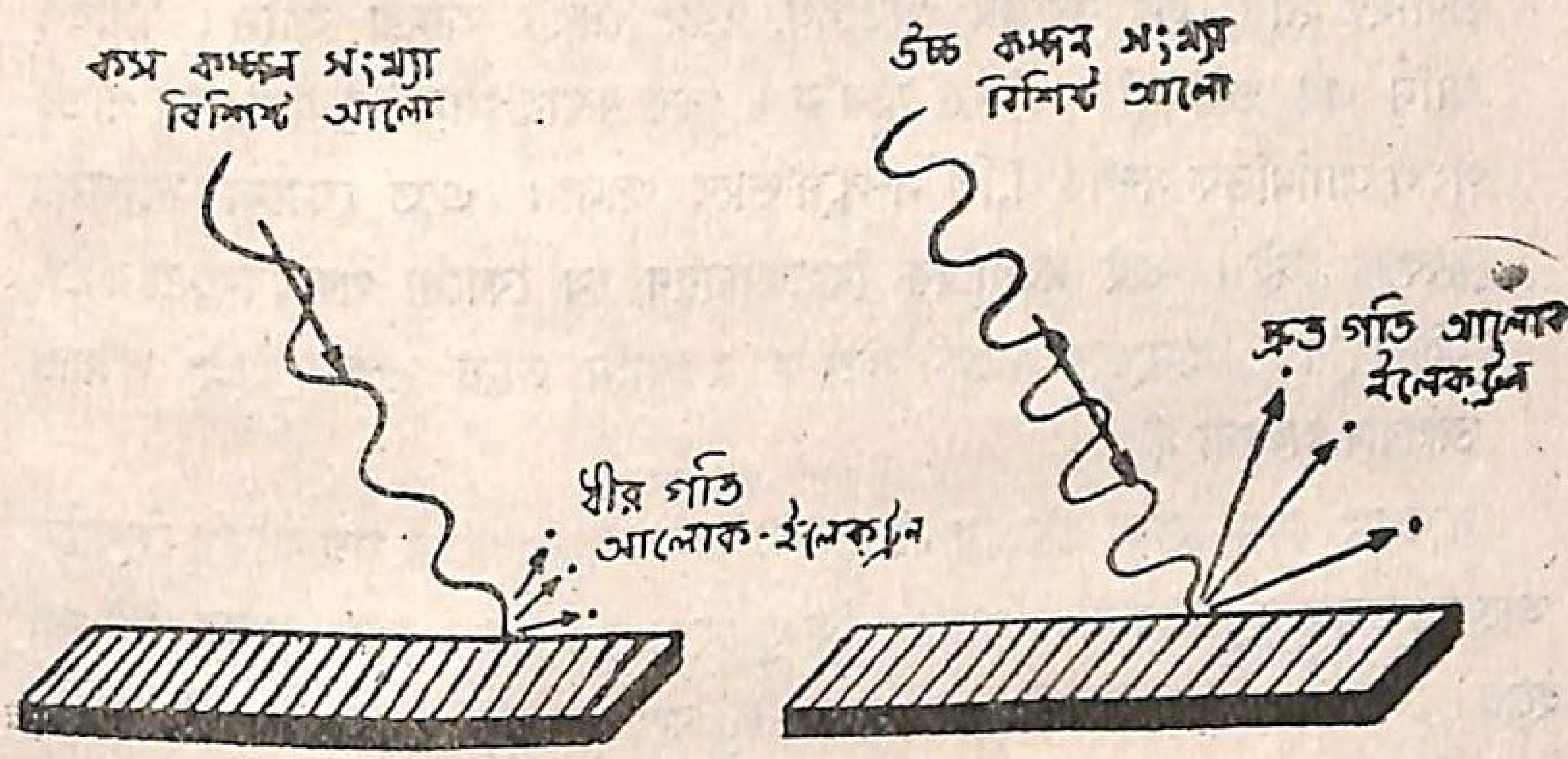
পরমাণু-শক্তির বিচ্ছিন্ন স্তরের অস্তিত্ব সরাসরি পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত করেন ফ্রাংক ও হারট্‌জ। ইলেকট্রনপ্রবাহকে গ্যাসের মধ্যে জোরে প্রবেশ করলে তারা যে সব পরমাণুর সঙ্গে ধাক্কা খায় তাদের শক্তিস্তরের পরিবর্তন ঘটে যদি ইলেকট্রনের শক্তি একটি নির্দিষ্ট মানের হয়। এই নির্দিষ্ট মানের কম হলে ইলেকট্রন ও পরমাণুর মধ্যে স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ ঘটবে ও পরমাণুতে শক্তির অবস্থান্তর ঘটবে না। পরীক্ষালব্ধ ফলটির একটিমাত্র ব্যাখ্যা হতে পারে। গ্যাসের মধ্যে পরমাণুগুলো তাদের সর্বনিম্ন শক্তিস্তর বা ভূমিস্তরে থাকবে। পরের অধিক শক্তিযুক্ত স্তরগুলি বা উত্তেজিত অবস্থাগুলি ভূমিস্তর থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি নিয়ে ওপরে থাকে। সুতরাং পরমাণুকে শক্তি ছাড়তে হলে ইলেকট্রনগুলির শক্তি অন্ততঃ পরমাণুর দুটি শক্তিস্তরের যে তফাৎ তার সমান হতে হবে।

আলোর দ্বৈত চরিত্র

বোর সনাতনী পদার্থবিদ্যার সাহায্যে পরমাণুর বর্ণালী ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হননি। তাঁকে শেষ পর্যন্ত কোয়াণ্টাম প্রকল্পের সাহায্য নিতে হয়েছিল যদিও অবশ্য অতিরিক্ত কোনো অপরিচিত ধারণার দ্বারস্থ হতে হয়নি। এই কারণে তত্ত্বটি সরল বলেই মনে হয়েছিল। হাইড্রোজেনের বর্ণালী ছাড়া আরও কয়েকটি ঘটনা নজরে এল যেখানে আলোর প্রকৃত চরিত্র কী তা নিয়ে আবার নতুন করে প্রশ্ন দেখা দিল।

এই ধরনের ঘটনার মধ্যে অন্যতম হল আলোক তড়িৎ ক্রিয়া (Photo electric effect)। আলোকের প্রভাবে তড়িৎ প্রবাহের সৃষ্টি বর্তমান শতাব্দীর শুরুতে আবিষ্কৃত হয়। ধাতুর পাতের ওপর আলো ফেললে ধাতুর মধ্যস্থিত ইলেকট্রনগুলি মুক্ত হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। বিজ্ঞানের পরিভাষায় এই ভাবে পাওয়া ইলেকট্রনদের আলোক-ইলেকট্রন (Photoelectron) বলা হয়। আলো দিয়ে আলোক-

ইলেকট্রন পাবার মধ্যে সবচেয়ে বিভ্রান্তিসৃষ্টিকারী ব্যাপার হল যে 'আলোক ইলেকট্রনদের' গতিশক্তি প্রত্যাশা অনুযায়ী আলোর তীব্রতার ওপর নির্ভর করে না; কেবলমাত্র আলোর কম্পন-সংখ্যার ওপর নির্ভর করে। আলোর তীব্রতা বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে আলোক ইলেকট্রন বের হবার হার বৃদ্ধি পায় ঠিকই কিন্তু তাদের গতিশক্তির কোন পরিবর্তন হয় না। অধিক গতিসম্পন্ন আলোক-ইলেকট্রন তখনই পাওয়া যাবে যদি আপতিত আলোকের কম্পনসংখ্যা বাড়ানো যায়।



চিত্র—১২

আলোক-তড়িৎ ক্রিয়াতে আলো ধাতু থেকে আলোক-ইলেকট্রন বার করে। কোয়াণ্টাম মতবাদ ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হল কেন এই আলোক ইলেকট্রনের সর্ব্বোচ্চ শক্তি আপতিত আলোক রশ্মির কম্পাংকের ওপর নির্ভর করবে, তার তীব্রতার উপর নয়।

গতানুগতিক চিন্তাধারায় এ ধরনের একটা বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির ব্যাখ্যার চেষ্টা সম্পূর্ণভাবে নিষ্ফল। আইনস্টাইন বুঝতে পারলেন যে এই ব্যাপারে একটি মাত্রই পথ খোলা আছে। তাঁর মতে এটা অনুমান করতেই হবে যে বিকিরণশক্তি চরাচরে অবিচ্ছিন্নভাবে তরঙ্গাকারে ছড়িয়ে নেই। তার জায়গায় বিকিরণশক্তি মানে হল কতকগুলি স্থানীয় আলোককণা বা ফোটন যারা আলোর গতিবেগ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আলোক-তড়িৎ ক্রিয়া তখনই আত্মপ্রকাশ করবে যখন পরমাণু একটি ফোটন দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে তাকে গ্রহণ করে নেবে। ফলে ফোটনের শক্তি পরমাণুর ইলেকট্রনের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে যাবে এবং সে 'আলোক ইলেকট্রন' হিসাবে বাইরে বেরিয়ে আসবে। এখানেই আলোকতত্ত্ব তার বিবর্তনের ক্ষেত্রে একটি বৃত্ত সম্পূর্ণ করল। আলো সর্বপ্রথমে কণার সমষ্টি হিসাবে ভাবা হত। পরে সে ধারণাকে সরিয়ে দিয়ে এলো তরঙ্গবাদ। কালচক্রে কণাবাদ (Corparscular theory) আবার তার দাবি প্রকাশ করল 'আলোক তড়িৎ ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে।

কেবলমাত্র একটাই তফাৎ আছে। নিউটন আলোক কণাদের বস্তুকণা হিসাবে ভেবেছিলেন কিন্তু বর্তমানে আলোককণা বা ফোটনের চরিত্র একেবারে ভিন্ন।

আলোর ফোটনতত্ত্ব কতকগুলি অসুবিধার সৃষ্টি করল। আলোর তরঙ্গবাদের ওপর নির্ভর করে অনেক পরীক্ষালব্ধ ফলকে বাতিল করে দেওয়া সম্ভব নয়। ১৯৮৯ সালে হার্টজ, যিনি প্রথম বেতার তরঙ্গের সৃষ্টি করেছিলেন, বললেন

"ইয়াং এবং ফ্রেনেলের সময় থেকেই আমরা জানি আলো তরঙ্গের আকারে প্রবাহিত হয়। এই তরঙ্গের গতিবেগ, তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আমরা জানি। আরও জানি এই তরঙ্গগুলি চরিত্রে তির্যক। এক কথায় আমাদের এ ধরনের গতির সকল জ্যামিতিক সম্পর্কগুলি সম্পূর্ণভাবে জানা। এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। এই মতবাদের বিরুদ্ধাচারণ যে কোনো পদার্থবিদের কাছে অচিন্তনীয়। মানুষের পক্ষে সত্যকে যতখানি জানা সম্ভব সেই সীমায় তরঙ্গবাদ অলঙ্ঘ্য।"

সুতরাং দেখা গেল যে যেখানে কেবল আলোকপ্রবাহের প্রশ্ন জড়িত সেখানে আলোর তরঙ্গে রূপেই প্রাধান্য পায়। কিন্তু যেখানে আলোর সঙ্গে বস্তুর বিক্রিয়া হচ্ছে সেখানে আলো বিচ্ছিন্ন কতকগুলি কণা-সমষ্টির মতো আচরণ করে। আলোক-তড়িৎ ক্রিয়া এমন একটি ঘটনা যেখানে ধাতুপাতের মধ্যস্থিত পরমাণুরা আলো গ্রহণ করে। এই গ্রহণের ব্যাপারটা অবিচ্ছিন্নভাবে ঘটে না, বরং এককালে একটিমাত্র ফোটন গৃহীত হয়। আগেই বর্ণনা করা হয়েছে যে পরমাণু কর্তৃক আলো বর্জনের ব্যাপারটাও বিচ্ছিন্ন ভাবে হয়ে থাকে।

১৯২৪ সালে আমেরিকার বিজ্ঞানী কম্পটন আলোর ফোটন চরিত্রকে আরও বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার মতো একটি আবিষ্কার করেন। রঞ্জন রশ্মির সম্বন্ধে গবেষণা করতে গিয়ে তিনি এই আবিষ্কারটি করেন। তিনি দেখতে পান যে তিনি তাঁর বিখ্যাত পরীক্ষার ফল সহজেই ব্যাখ্যা করতে পারেন, যদি তিনি অনুমান করেন যে একটি ফোটন পরমাণুস্থিত ইলেকট্রনের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে হ্রাসপ্রাপ্ত শক্তি নিয়ে ফিরে আসে। সাধারণভাবে দেখা যাচ্ছে যে পরমাণুর সঙ্গে আলোর যে কোনো ক্রিয়ার আলো তার তরঙ্গের স্বরূপ পরিত্যাগ করে কণাদের মত ব্যবহার করছে।

বিভ্রান্তির সুরাহা

আলোসংক্রান্ত ঘটনাগুলিকে দুটি পরস্পর-বিরোধী সত্তা আরোপ করা চলে। স্পষ্টতঃ কোনে কোনো ক্ষেত্রে আলো তরঙ্গের মতো ব্যবহার করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কণাদের মতো। যেহেতু আলোর এই দুই চরিত্র একই সময়ে

পরিস্ফুট হতে পারে না, সেইজন্য মনে হতে পারে যে দুটি অনুমানের মধ্যে গ্রহণযোগ্য নয় এমন কিছু আছে। যুক্তি দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে এই বৈপরীত্যের কারণ হল যে দুটি পরস্পরবিরোধী অনুমানই দাবি করে যে তারা আলোর প্রকৃত স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে সক্ষম। পদার্থবিদ্যা আলোকসংক্রান্ত ঘটনাগুলো কী নিয়মে আত্মপ্রকাশ করছে সেগুলো কেবল বর্ণনা করবে। কোনো পদার্থবিদ্যা আলোর স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করতে পারবে না। এই নিয়মগুলো এমন হওয়া উচিত যাতে এদের যাহায্যে আলোকসংক্রান্ত কোন পরীক্ষা করলে তার কী ফল হবে তা আগেই বলে দেওয়া যায় এবং এর বেশি কিছুর প্রয়োজন নেই।

দেখা যাচ্ছে আলোর দুটি ভিন্ন স্বরূপ আছে। এদের মধ্যে কোন স্বরূপটি পরিস্ফুট হবে তা নির্ভর করবে আলো নিয়ে কী ধরনের পরীক্ষা করা হচ্ছে তার ওপর। আলোর প্রবাহই যে সব পরীক্ষার মূল বিচার্য সেখানে আলো তরঙ্গের রূপ নেয়। এটা বলার এই অর্থ নয় আলো কেবলই তরঙ্গ বিশেষ। এর আসল অর্থ হল বস্তু জগতে আলোর প্রবাহের প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্ট কোনো পরিবর্তনের স্থান কাল সম্পর্কটি তরঙ্গের গাণিতিক নিয়মগুলোর সাহায্যে বোঝা যাবে। অপর পক্ষে যে সকল ক্ষেত্রে আলো বস্তুর সঙ্গে বিক্রিয়া করছে সেখানে আলো কণার সমষ্টির মতো ব্যবহার করবে। এরা প্রত্যেক $E=hf$ শক্তি সমন্বিত শক্তিকণা। এখানেও কিন্তু এটা ভাবলে চলবে না যে আলো কেবল ফোটনের সমষ্টি মাত্র। এখানে ধরতে হবে যে এ ধরণের ঘটনা ব্যাখ্যা করতে গেলে গাণিতিক ভাষ্য সুবিধাজনক হবে, যদি আলোককে কণাসমষ্টি হিসাবে ভাবা হয়।

এ ধরনের তারতম্য করা কেবল বিলাসমাত্র নয়—সকল ধারণার নির্ভুল গাণিতিক রূপায়ণের জন্যে এই তারতম্য খুবই দরকার। পরীক্ষার বিষয় বস্তুর উপর নির্ভর করে আলো একবার তরঙ্গ ও আরেকবার কণাসমষ্টি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে—এই সত্যটি বিনা দ্বিধায় মেনে নেওয়াই ভালো। দরজার একদিক লাল ও আরেকদিক সবুজ রঙ থাকলে আমরা সহজেই মানি যে দর্শকের কাজে তাঁর অবস্থানের ওপর নির্ভর করবে দরজার রঙ লাল, কি সবুজ।

ওপরের কথাগুলো আরও খোলাখুলি ভাবে আলোচনা করা যেতে পারে। আলোকসংক্রান্ত সকল ঘটনার একটি অভিন্ন ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব মনে হচ্ছে। এর কারণ এই নয় যে আলো কোনো এক অজ্ঞাত কারণে দুটি পরস্পর বিরোধী চরিত্র আত্মস্থ করে রেখেছে। বরং কারণটা হল যে সনাতনী পদার্থবিদ্যা থেকে নেওয়া পরিচিত ধারণাগুলো আলোকসংক্রান্ত ঘটনাগুলি সামগ্রিকভাবে ব্যাখ্যা করতে অক্ষম। এতে অবশ্য আশ্চর্য হবার কিছু নেই। সনাতনী পদার্থ বিজ্ঞানে সকল ধারণাই দৃশ্যমান বস্তু সকলকে কেন্দ্র করে গড়ে

উঠেছে। এই ধারণাগুলিকেকে কতকগুলি সংজ্ঞার সাহায্যে সুসংবদ্ধ করে দৃশ্যমান সকল ঘটনার পেছনে নিয়মগুলি খুঁজে পাবার চেষ্টা করা হয়েছে সনাতনী পদার্থ বিজ্ঞানে। এই নিয়মগুলো অণুজগতের সকল ঘটনাকে ব্যাখ্যা করতে পারবে এটা আশা করা ঠিক হবে না যেমন করে কারখানার বড়ো বড়ো যন্ত্রপাতি ঘড়ি তৈরির ব্যাপারে কোনো কাজে লাগে না।

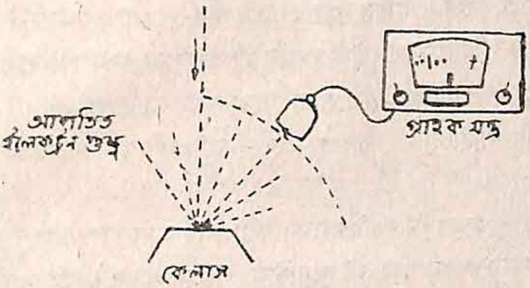
ভৌত ধারণাগুলি তখনই অর্থবহ, যখন তাদের বক্তব্যগুলো পরিমাপের সাহায্যে বর্ণনা করা যাবে। দৃশ্যমান জগতে যেসব ধারণা সংগত, অণুজগতের ক্ষেত্রে তারা সেই সংগতি হারিয়ে ফেলে। এর কারণ হল দৃশ্যমান বস্তুর ক্ষেত্রে যে সকল নিয়মের সাহায্যে কোনো কিছু পরিমাপ করা যায়, অণুজগতের বেলায় সে ধরণের পরিমাপ পদ্ধতিই প্রয়োগ করা যায় না। পরে দেখা যাবে যে সনাতনী পদার্থ-বিজ্ঞানের ধারণাগুলিকে অণুজগতের নতুন পরিমাণ পদ্ধতির সঙ্গে সংগতি রেখে নতুনভাবে সঙ্গায়িত করে কোয়াণ্টাম মতবাদ এগিয়ে গেছে। আলো পরমাণু থেকেই উদ্ভূত হয়, আবার পরমাণুতেই লীন হয়। পরমাণু জগতের এই সকল ঘটনা সনাতনী পদার্থ বিজ্ঞানের ধারণা মেনে চলবে এটা ভাবা ঠিক হবে না। অভিজ্ঞতা থেকে এটাই দেখা যাচ্ছে আলো সম্বন্ধে একক কোনো তত্ত্ব পাওয়া যাবে যাবে না। পদার্থবিদ্যা তার সকল তত্ত্বের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখতে ব্যর্থ। তাকে দুটো ভিন্ন ভিন্ন পথে চলা শুরু করতে হল। পরমাণু জগতের জন্য অন্য ধারণা সৃষ্টি করতে হল। এই নতুন পথ ধরেই যাত্রা শুরু কোয়াণ্টাম বলবিদ্যার (Quantum mechanies) যার কথা পরে আরও জানা যাবে।

বস্তুরও দ্বিচরিত্র

১৯২৭ সালে দুজন আমেরিকান বিজ্ঞানী ডেভিসন ও জারমার একটি তাৎপর্য-পূর্ণ পরীক্ষা করলেন। একটি কেলাসের উপর ইলেকট্রনগুচ্ছ এসে পড়লে কী হয় তাই নিয়ে তাঁরা গবেষণা করেছিলেন। এতে ইলেকট্রনগুলি বিক্ষিপ্ত হচ্ছিল। তারা পরীক্ষা করে দেখছিলেন যে বিভিন্নদিকে কত-সংখ্যক ইলেকট্রন বিক্ষিপ্ত হচ্ছে। বিজ্ঞানীদ্বয়ের কেউই হয়ত ভাবতে পারেননি যে তাঁদের এই পরীক্ষা এক যুগান্তকারী ফল দেবে।

তাঁরা একগুচ্ছ দ্রুতগামী ইলেকট্রন নিকেলের একটি কেলাসের ওপর আপতিত করে দেখছিলেন নিকেল কেলাসের দ্বারা বিক্ষিপ্ত ইলেকট্রনগুলি কীভাবে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। তারা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন যে নিকেল কেলাসটি কতগুলি নির্দিষ্ট দিকে ইলেকট্রনগুচ্ছকে বিক্ষিপ্ত করছে। ঐ কেলাস থেকে রঞ্জনরশ্মি নিক্ষিপ্ত হলে যে দিকে বিক্ষিপ্ত হয়, কেলাস কর্তৃক ইলেকট্রনগুচ্ছের বিক্ষেপও সেই-

দিকেই হচ্ছে। এর মানে কেলাসের সঙ্গে বিক্রিয়ার সময় ইলেকট্রন কণার মতো ব্যবহার না করে তরঙ্গের মতো ব্যবহার করছে।



চিত্র—১৩

ছবিতে ডেভিসন-জারমারের পরীক্ষাটি দেখানো হল। দেখা গেল কেলাসের দিকে ছুঁড়ে দেওয়া ইলেকট্রনগুচ্ছ কতকগুলি নির্দিষ্ট দিকে বিক্ষিপ্ত হচ্ছে। এই ফল ইলেকট্রনের তরঙ্গ চরিত্রের কথাই মনে জাগায়।

রঞ্জনরশ্মির একটি গুচ্ছকে কেলাস থেকে প্রতিফলিত করে বা কেলাসের মধ্যে দিয়ে পাঠিয়ে পরে একটি ফিল্মের ওপর ওপর এনে ফেললে ঐ ফিলমের ওপর কতগুলি সুসমঞ্জস কালো বিন্দু পাওয়া যাবে। এই ধরণের সুসংবদ্ধ কালো বিন্দুর উপস্থিতি কেলাস মধ্যস্থিত পরমাণু দ্বারা প্রতিফলিত বা বিক্ষিপ্ত রশ্মিদের মধ্যে পারস্পরিক ব্যতিচার সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়। এই ধরণের পরীক্ষার কথা সর্বপ্রথম বলেন জার্মান পদার্থবিদ লাওয়ে ১৯১২ সালে। একে রঞ্জনরশ্মির তরঙ্গ চরিত্রের অন্যতম প্রমাণ হিসাবে ধরার কারণ কেবলমাত্র তরঙ্গেরই এ ধরনের ব্যতিচার লক্ষ্য করা যায়।

পরিপূরকতা

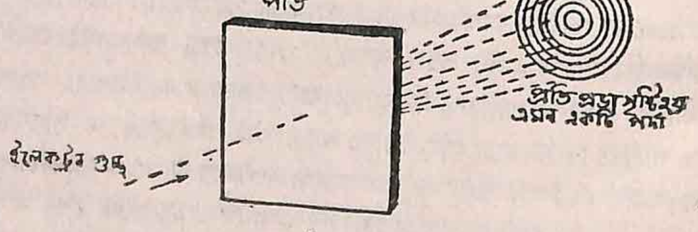
লাওয়ের পরীক্ষা আর ডেভিসন ও জারমারের পরীক্ষায় যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল তাদের মধ্যে একটা তফাৎ আছে। পদার্থবিদেরা রঞ্জনরশ্মির তরঙ্গচরিত্র মেনে নিতে রাজী ছিলেন কিন্তু ইলেকট্রনের নয়। তাঁরা এমন অসংখ্য পরীক্ষার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন যারা অবিংসবাদিত ভাবে এটাই প্রমাণ করে যে ইলেকট্রনরা কণার সমষ্টি। কিন্তু ডেভিসন ও জারমারের পরীক্ষার আলোকে খানিকটা বাধ্য হয়েই তাদের এটা মেনে নিতে হল যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইলেকট্রন কণা হিসাবে ব্যবহার না করে তরঙ্গেরই রূপ পরিগ্রহ করে। আলোর মতন প্রাথমিক কণাদের ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে যে তাদের সকল ধর্ম একটি তত্ত্বের মধ্যেও একত্রিত করা যাচ্ছে না।

ইলেকট্রন কী—কণা না তরঙ্গ ? এর উত্তর হল ইলেকট্রন এমন একটি জিনিস যার সম্বন্ধে মনে মনে কোনো ছবি খাড়া করা যাবে না। ইলেকট্রনের সকল ধর্মকে একটি তত্ত্বের মধ্যে একত্রিত করার চেষ্টা বাদ দিলে এবং কয়েকটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের অভিজ্ঞতাকে সীমাবদ্ধ করলেই ইলেকট্রন সম্পর্কে মনে মনে ছবি আঁকার চেষ্টা চলতে পারে। ইলেকট্রনের ধর্মগুলি তখন বোঝা যাবে হয় তরঙ্গ সত্তার সাহায্যে নতুবা কণা সত্তার সাহায্যে। অবশ্য এটা নির্ভর করবে অনুধাবনের বিষয়গুলোর প্রকৃতির ওপর।

আলো ও বস্তুর দ্বৈত চরিত্র লক্ষ্য করে বোর অসাধারণ ও সুদূরপ্রসারী একটি সূত্র আবিষ্কার করেন এবং এই সূত্রটিকে বলা হয় পরিপূরকতা সূত্র। এই সূত্রের মতে মোটামুটিভাবে যে সব পরীক্ষা ইলেকট্রনের কোন একটি বিশেষ চরিত্রকে পরিস্ফুট করে তার সেই সকল পরীক্ষা অপর পরিপূরক চরিত্রটি প্রকাশে বাধা দেয়। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে তরঙ্গসত্তা আর কণাসত্তা এরা পরস্পর পরিপূরক। এরা কোনো পরীক্ষায় যুগপৎ আত্মপ্রকাশ করবে না। বোর বললেন বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে পাওয়া সকল সাক্ষ্যকে একটিমাত্র ছবিতে বেঁধে ফেলা যাবে না। তাদের পরস্পরকে পরিপূরক হিসাবে ভাবতে হবে। এই দুটি চরিত্র সকলসময়েই পরস্পরকে বিরোধিতা করবে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে কোনো একটি চিত্র প্রাধান্য পাবে আর অপরটি তখন নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে।

তরঙ্গ ও পরিসংখ্যান

কেলাস দ্বারা ইলেকট্রনের বিক্ষেপের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গেলে ইলেকট্রনের তরঙ্গ চরিত্রকে কাজে লাগাতে হবে। অনুমান করতে হবে ইলেকট্রন কেলাসের



চিত্র—১৪
একটি সরু ধাতব পাতের মধ্য দিয়ে যাবার সময় ইলেকট্রন কীভাবে বিক্ষিপ্ত হয় তাই দেখানো হল। বিক্ষিপ্ত ইলেকট্রনগুলো ফিল্মে বা প্রতিপ্রভার সৃষ্টি হয় এমন একটি পর্দায় কতকগুলি নির্দিষ্ট অবয়বের নকশা তৈরি করে।

সঙ্গে ধাক্কা খাওয়ার মুহূর্তে তরঙ্গের রূপ পরিগ্রহ করছে। আবার বিক্ষিপ্ত ইলেকট্রনগুলো একটি প্রতিপ্রভার সৃষ্টি করতে পারে এমন একটি পর্দার ওপরে ফেললে তাদের তরঙ্গ চরিত্রটি বজায় থাকবে না। সেখানে তারা কণার মতোই পর্দার অনুদের সঙ্গে ধাক্কা খায়। এইখানে আবার ইলেকট্রন তরঙ্গ চরিত্র হারিয়ে ফেলেছে এবং তাদের তখন কণা হিসাবে চিন্তা করতে বাধ্য হতে হয়।

যদি ধরে নেওয়া হয় যে ইলেকট্রন তরঙ্গ থেকে কণায় তার স্বরূপ পরিবর্তন করে তবে প্রশ্ন উঠতে পারে কোন স্থানে প্রকৃত পক্ষে এই পরিবর্তনটি ঘটছে। তরঙ্গের চরিত্র থেকে কি এটা ভবিষ্যৎবাণী করা সম্ভব হবে? আগে যে বিক্ষেপ পরীক্ষার কথা বলা হয়েছে তারই একটি বিকল্প পরীক্ষার মধ্যে এই প্রশ্নের সমাধানের পথটি খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। এই বিকল্প পরীক্ষায় একটি মাত্র নিকেল কেলাসের বদলে অনেকগুলি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কেলাস সমষ্টি সাহায্যে নির্মিত একটি সরু পাত ব্যবহার করা হয়। এই পাত থেকে বিক্ষিপ্ত ইলেকট্রনগুলিকে পর্দার ওপরে ফেললে আর কালো বিন্দু পাওয়া যায় না। তার পরিবর্তে ক্রমান্বয়ে সাজানো চক্রাকার অন্ধকার ও আলোকিত অংশ পাওয়া যায়। এই চক্রাকার ও আলোকিত অংশ পাওয়া যায় সূক্ষ্ম কেলাস থেকে বিক্ষিপ্ত তরঙ্গের পারস্পরিক ব্যতিচারের ফলে।

এখন অনুমান করা যাক কেবলমাত্র একটি ইলেকট্রনের সাহায্যে ঐ পরীক্ষাটি করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে চক্রাকার অন্ধকারের কোনো হদিশই পাওয়া যাবে না। এর কারণ হল ইলেকট্রনটি পর্দায় ধাক্কা খাওয়ার সময় তার সকল তরঙ্গসত্তা হারিয়ে ফেলছে এবং একটি কণা হিসাবে ব্যবহার করছে। পাতের মধ্য দিয়ে আরও একটি ইলেকট্রন পাঠিয়ে যদি আবার পরীক্ষাটি করা হয় তবে ইলেকট্রনটি অন্য জায়গায় ঘা খেয়ে আরেকটি চিহ্ন সৃষ্টি করবে। এইভাবে ক্রমান্বয়ে পরীক্ষা করে গেলে পর্দার ওপরে কতকগুলি সুনির্দিষ্ট বিন্দু পাওয়া যাবে।

এই পরীক্ষা থেকে দুটি প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যেতে পারে। প্রথমতঃ, পরীক্ষার অবস্থা থেকে এটা বলা যাবে না পর্দার কোনো স্থানে গিয়ে ইলেকট্রনটি আঘাত করবে। এর অর্থ হল যদিও প্রতিটি পরীক্ষার শুরুতে একই প্রারম্ভিক অবস্থা ফিরিয়ে আনা হচ্ছে তবুও পরীক্ষার ফল বারে বারে ভিন্ন হতে পারে। এটা কার্যকারণ সূত্রের পরিপন্থী। অবশ্য ধরা যেতে পারে যে এই বিভিন্নতা নিছকই দৃষ্টিগত ব্যাপার। ফলের বিভিন্নতা আসলে প্রত্যেকবার একই প্রারম্ভিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার অক্ষমতাই নির্দেশ করে।

আরও তলিয়ে দেখলে অবশ্য এই ব্যাখ্যার সম্বন্ধে সন্দেহ জাগবে। কেননা এই দৃষ্টিভঙ্গী যদি সঠিক হত তাহলে তার অর্থ হত ব্যবর্তনের (Diffraction)

চক্রাকার নকশা উড়ন্ত ইলেকট্রনের যান্ত্রিক অবস্থা হঠাৎ হেরফের হওয়ার দরুণ তৈরি হয়েছে। এই সামান্য হেরফের দেখা সম্ভব নয়। তাহলে এটাই অনুমান করে নিতে হবে যে একটি সুসমঞ্জস নকশার উৎপত্তির মূলে হঠাৎ কিছু হওয়ার একটা ব্যাপার রয়েছে! এটি আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নয়।

আজকের দিনে পদার্থবিদ্‌দের সর্বসম্মত মত হল যে কোনো পাতের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় ইলেকট্রন যে ভিন্ন ভিন্ন বিক্ষেপ অনুভব করে তা প্রাথমিক অবস্থার বিভিন্নতার জন্যে নয়। এখানে আরেক ধরণের ব্যাপার কাজ করছে। এর কথা সনাতনী পদার্থবিজ্ঞানে বলা নেই। সনাতনী পদার্থবিদ্যা যখনই হঠাৎ হওয়ার কথা বলে তখনই তার অর্থ হয় প্রকৃতিকে জানার ব্যাপারে স্বল্পতা-জনিত বিশৃঙ্খলা।

একটি ঘটনাকে হঠাৎ হয়েছে তখনই বলা হবে যখন এই ঘটনার দুর্জ্ঞেয়তার জন্যে এর বিবর্তনের সকল পর্যায় পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে জানা যাচ্ছে না এবং অন্তর্নিহিত কার্যকারণ সম্বন্ধটি সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে যাচ্ছে। কোয়াণ্টাম বলবিদ্যাতে দৈবাৎ হবার যে ব্যাপারটা আছে তা জ্ঞানের স্বল্পতার জন্য ভ্রান্তিমাত্র নয়—এটা প্রকৃতিতে অঙ্গাঙ্গীভাবে আছে। এই ব্যাপারটি পর্যবেক্ষকের দৃষ্টি এড়িয়ে কোনো জিনিসকে সুনিশ্চিতভাবে হবার পথে বাধা দেয়।

এই ধরণের দৈব ব্যাপারে কতকগুলি সীমারেখা আছে। এই অনিশ্চয়তা বা দৈবাৎ হবার ব্যাপারটা যে কোনো ভাবে সংঘটিত হতে পারে না। এরও একটা নির্দিষ্ট সম্ভাব্যতা থাকা দরকার। উদাহরণস্বরূপ যদি বিক্ষেপ পরীক্ষা চালানো হয় ক্রমে ক্রমে একটি করে ইলেকট্রনের সংখ্যা বাড়িয়ে তবে প্রথম প্রথম যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কালবিন্দু পাওয়া যায় সেখানে ক্রমে ক্রমে একটি নির্দিষ্ট ধারা রূপ পরিগ্রহ করতে শুরু করবে। এ ধরণের বিন্দু যে চক্রে খুবই ঘন তাকে বোঝা যাবে আর যে চক্রে বিন্দুর উপস্থিতি খুব বেশি নয় তাকে আর বোঝা যাবে না। স্পষ্টতঃ দৈব ব্যাপারটা একেবারে বাধা বন্ধনহীন নয়—সেখানেও প্রকৃতি-নির্দেশিত একটি পারিসাংখ্যিক নিয়ম আছে। এই নিয়মিত ভাবটি ধরা পড়ে যদি বহুবার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো যায়। এইভাবে বিশৃঙ্খলার মধ্যে একটি বিশেষ ধরণের শৃঙ্খলা আত্মপ্রকাশ করে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে ইলেকট্রন কি কোণে বিক্ষিপ্ত হবে তার একটি নির্দিষ্ট সম্ভাব্যতা আছে। এই ধরণের সম্ভাব্যতা কণা সত্তা আর তরঙ্গসত্তার মধ্যে একটি সম্পর্ক গড়ে তোলে। পর্দার কোনো একটি বিন্দু Pতে ইলেকট্রনের ধাক্কা খাওয়ার সম্ভাব্যতা ঐ স্থানে তরঙ্গ দ্বারা সৃষ্ট চাঞ্চল্যের তীব্রতার ওপর নির্ভর নির্ভর করবে। সুতরাং তরঙ্গ চিত্রের সাহায্যে কিছু ভবিষ্যদ্‌বাণী করা সম্ভব হচ্ছে। যেসব পরীক্ষায় ইলেকট্রন তরঙ্গ থেকে কণার রূপ পরিগ্রহ করে সেই পরীক্ষায় যে স্থানে তরঙ্গ-সৃষ্ট চাঞ্চল্য যত বেশি হবে সেই স্থানেই ইলেকট্রনের পৌঁছাবার সম্ভাবনাও তত বাড়বে।

কোয়ান্টাম বলবিদ্যার যাত্রা শুরু 8

"আমরা খুব অল্প জানি, তবু আশ্চর্য যে, আমরা এত বেশী জানি এবং আরও আশ্চর্যের বিষয় যে, এত অল্প জ্ঞান আমাদের এত বেশী ক্ষমতা দিতে পারে।" —রাসেল

প্রাকৃতিক নিয়মের স্বরূপ

যে সব পরিস্থিতির কথা বলা হল তাদের সনাতনী পদার্থবিজ্ঞানের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। এতে সনাতনী পদার্থবিদ্যা ভুল প্রমাণিত হল না। সনাতনী পদার্থবিজ্ঞান যদি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত হত তাহলে তা এতদিন ধরে তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারতো না। আগেই বলা হয়েছে সনাতনী পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মগুলো মোটামুটিভাবে অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে এই অভিজ্ঞতার উৎস হল দৃশ্যমান জগৎ। এর কার্যকারিতা সম্বন্ধে তখনই কেবল প্রশ্ন উঠছে যখন বিজ্ঞানীরা পরমাণু বা বস্তুর মধ্যস্থিত ক্ষুদ্রতম অংশ নিয়ে অনুসন্ধান শুরু করেছেন।

যে সব জিনিসকে অণুবীক্ষণের সাহায্যে দেখতে হয় তারা দৃশ্যমান বস্তু সকলের ক্ষুদ্রতম সংস্করণ মাত্র একথা ঠিক নয়। ঐসব ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তুদেরও একটা নিজস্ব সত্তা আছে। এদের জন্যে ভিন্ন ধরণের পর্যবেক্ষণ ও পরিমাপ পদ্ধতি দরকার। মৌলিক কণাদের আর ভাঙা সম্ভব নয় বলার অর্থই হল এর ব্যাপ্তির পরিমাপ করা যায় না। এমন কোনো পথ নেই, যার সাহায্যে ইলেকট্রনের আকৃতি কত বড়ো তা বলা যেতে পারে বা জানা যেতে পারে তার গঠনাকৃতিই বা কেমন কারণ, ইলেকট্রনের মধ্যে এমন কোনো দুটি বিন্দু নেই যা আলাদা করা যাবে বা যাদের মধ্যে দূরত্ব মাপা যাবে।

দেখা গেছে মৌলিক কণা সংশ্লিষ্ট কতকগুলি পরীক্ষা আছে যাদের নীতিগতভাবে সম্পাদন করা গেলেও প্রকৃত ক্ষেত্রে তারা একে অপরের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ফলে একই সময়ে কখনই সে সকল পরীক্ষা চালানো সম্ভব নয়। এর কারণ হল পরিমাপের ক্রিয়াটি বস্তুটির অবস্থায় হস্তক্ষেপ করে তার পরিবর্তন আনতে পারে। পরিবর্তনের মান আগে থেকে বলা যাবে না, কেননা পরিমাপ পদ্ধতি ও বস্তুটির প্রতিক্রিয়ার মধ্যে এমন একটি মৌলিক

প্রক্রিয়া সংশ্লিষ্ট আছে যাকে ব্যাখ্যা করা যায় না বা যাকে নিয়ন্ত্রিতও করা যায় না। কোনো ভাবধারাকে কার্যক্ষেত্রে ব্যবহার করার ব্যাপারে একটি সীমারেখা থাকার দরুণই এটা হচ্ছে। এই সত্যই প্রতিফলিত হয়েছে অনিশ্চয়তা সূত্রে।

পরিমাপ করার পদ্ধতির পরিবর্তনের মূল কথা হল কতকগুলি পরিচিত ধারণা তাদের অর্থ হারিয়ে ফেলছে। এদের নতুনভাবে সংজ্ঞা দিতে হবে। এইখানেই পদার্থবিদ্যার পথচলা নতুন এক মোড় নিল। নব নব ভাবনার উন্মেষ ঘটল বিজ্ঞানীদের মনে। বিশেষ কয়েকটি জায়গায় কোয়াণ্টাম পদার্থ-বিজ্ঞানের সাফল্যই কিন্তু সবচেয়ে বড়ো কথা না। এর আসল কৃতিত্ব হল দীর্ঘদিনের দৃঢ়মূল চিন্তা ভাবনার বিরোধিতা করা। কতকগুলো নবলব্ধ পরীক্ষার ফল ব্যাখ্যা করার আশা বিজ্ঞানীরা কোনোদিনই ছাড়তে পারেন না। এর জন্যে পুরানো ধারণা ত্যাগ করতেও তাঁরা প্রস্তুত।

সাধারণ মানুষ মনে করে পদার্থবিজ্ঞানের কাজ হল প্রকৃতিকে সম্যক্‌ভাবে ব্যাখ্যা করা। এই উক্তি ভালো করে পরীক্ষা করা দরকার "প্রাকৃতিক ঘটনা বোঝা গেছে" এই কথাটির তাৎপর্য বোঝার জন্যেই। যদিও এ সম্বন্ধে আগে অনেক কিছু বলা হয়েছে, তবুও এখানে তার স্বল্প পুনরাবৃত্তি অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

কোনো ঘটনাকে পুরোপুরি বোঝা গেছে বলাটা সঙ্গত হবে তখনই, যখন ঘটনা প্রবাহের একটি বিশ্বাসযোগ্য কারণ দেখানো যাবে। কেবল তর্ক করেই প্রকৃতিকে বোঝা যায় না। এমন একটি জগতের কথা ভাবা অসম্ভব নয় যেখানে আমাদের পরিচিত কোনো নিয়মই কার্যকরী নয়।

সুতরাং "বোঝা গেছে" কথাটির কাছে আরও কম দাবি করতে হবে। একটি ঘটনাকে তখনই বোঝা গেছে বলে ধরে নেওয়া হবে যদি দেখানো যায় যে ঘটনাটি ব্যাখ্যা করা গেছে। সুতরাং সকল ভৌত ব্যাখ্যাই হল আলোচ্য ঘটনাটিকে যে কয়টি নিয়মের সাহায্যে বেঁধে ফেলা যায় তার পরিমাণ। এক্ষেত্রে নিয়মগুলোর অস্তিত্ব ধরে নিতে হবে এবং এদের জন্যে আর কোনো প্রশ্ন করা চলবে না। কেন প্রকৃতি একটি নিয়ম মেনে চলে, অন্য নিয়ম কেন মানে না—এসব প্রশ্ন তোলা সঙ্গত হবে না। প্রাকৃতিক নিয়মগুলি ঘটনাকে ব্যাখ্যা করে ঠিকই, কিন্তু নিয়মের কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। প্রাকৃতিক নিয়মের উৎপত্তি তর্কের প্রয়োজনে নয়। এগুলি প্রকৃতিরই সৃষ্টি।

আপনা থেকে নীচে পড়ছে এমন একটি বস্তুর কথা ভাবা যেতে পারে। দেখা গেছে কতখানি নীচে এটি পড়বে তা পড়ার সময়ের বর্গের সমানুপাতিক। কোনো এমন নিয়ম নেই যার থেকে বলা যায় যে ব্যাপারটি অন্যরকম হওয়া সম্ভব নয়।

যে কোনো নিয়ম একান্তভাবে অভিজ্ঞতার ওপর দাঁড়িয়ে। এই কারণে পতনশীল বস্তুর সংশ্লিষ্ট নিয়মগুলো সম্পূর্ণ বোঝা গেছে এটা ধরে নেওয়া সমীচীন হবে না। এমন কোনো সংগত যুক্তি নেই যাতে বলা যায় কেন পতনশীল বস্তু আর অন্য কোনো নিয়ম না মেনে উপরোক্ত নিয়মটাই কেবল মেনে চলবে।

সব প্রাকৃতিক নিয়ম সিদ্ধান্তের ওপর প্রতিষ্ঠিত। প্রাকৃতিক নিয়মের স্বপক্ষে এটাই বলা চলে যে এ পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রেই নিয়মগুলি কার্যকরী হতে দেখা গেছে। বিজ্ঞান প্রকৃতিকে গোঁড়া হিসাবে ভাবে এবং বিশ্বাস করে যে চিরাচরিত রীতি থেকে প্রকৃতি চট করে বিচ্যুত হবে না। এমন কোনো নিশ্চিন্ত প্রতিশ্রুতি দেওয়া যেতে পারে কি যে প্রকৃতি কোনোদিনই তার মন পরিবর্তন করবে না বা কোনো ঘটনা অনন্তকাল ধরে যে নিয়মে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে হঠাৎ করে তা নতুন পথ নেবে না? পরিচিত সকল নিয়ম হয়ত একদিন না একদিন ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে—এই ব্যাপারটা মেনে নেওয়া মানে এই নয় যে প্রকৃতির স্থিরতার উপর আমাদের আস্থা হারিয়ে ফেলা। এটা সব সময় মনে রাখতে হবে যে প্রাকৃতিক নিয়মগুলো তার্কিক প্রয়োজনীয়তা নয় এবং এটাও কখনই বলা যাবে না যে কেন একটি বিশেষ নিয়মই একটি ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

ফরাসী বিজ্ঞানী দ্য ব্রগলি প্রাকৃতিক নিয়মের সংকলনের ব্যাপারটাকে ক্রসওয়ার্ড পাজ্‌লের সঙ্গে তুলনা করে বলেন—

> "আমরা ক্রসওয়ার্ড পাজ্‌লের বেলায় যখন একটি শূন্য ঘরের মুখোমুখি হই তখন আমাদের মন কতকগুলি সূত্রের সাহায্যে তা পরিপূরণের রাস্তা খুঁজতে থাকে। তার মনে এরকম একটা ধারণা হয় যে যেহেতু মানুষই কয়েকটি নিয়মের ওপর ভিত্তি করে পাজ্‌লটি তৈরি করেছে সেই হেতু তার মধ্যে নিয়মগুলো খুঁজে পেতে বেগ পেতে হবে না। যখন কোনো বিজ্ঞানী প্রাকৃতিক ঘটনাসমূহ বোঝাবার চেষ্টা করেন তখন তিনি এই বিশ্বাস নিয়ে শুরু করেন যে, সকল ঘটনাই কতগুলি বুদ্ধিগ্রাহ্য নিয়ম মেনে চলে। একটু চেষ্টা করলেই তাদের বোঝা যাবে। এ ধরনের মনোভাবের অর্থ হল প্রকৃতির যুক্তিনিষ্ঠার ওপর মানুষের অগাধ বিশ্বাস। মানুষের মন যে নিয়মগুলোর কথা ভাবছে বস্তু জগতে তারা প্রযুক্ত হবেই—এ ধরনের একটি প্রত্যয় থেকেই দৃশ্যমান সমচরিত্রের ঘটনার মধ্যে যে সম্বন্ধ বর্তমান থাকে তাকে খুঁজে পাবার চেষ্টা করি।"

কল্পনার প্রশ্ন

প্রাকৃতিক নিয়মগুলি কোনো কোনো শর্ত সব সময় মেনে চলে। নিয়মগুলোকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে এবং তাদের সাহায্যে সঠিকভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করা যাবে। এই ধরণের ভবিষ্যদ্বাণী সকল যন্ত্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে বৈদ্যুতিক আলোর কথা। একটি বিশেষ অবস্থায় একটি বাল্ব কতখানি আলো দেবে সেটা যদি পূর্বেই সঠিকভাবে ভবিষ্যদ্বাণী না করা যায় তাহলে বৈদ্যুতিক আলোর প্রকৃত উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে জুলের সূত্রগুলোই হল প্রাকৃতিক নিয়ম। পরিবাহীর মধ্যে প্রবাহিত তড়িৎ-প্রবাহের শক্তি ও তড়িৎ-প্রবাহ সৃষ্ট তাপের মধ্যেকার সম্বন্ধই হল জুলের সূত্র এবং জুলের সূত্রের সাহায্যেই এ বিষয়ে সকল প্রকার ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব।

কোয়াণ্টাম পদার্থবিদ্যা এই মত পোষণ করে যে প্রাকৃতিক নিয়মের কাছে এটুকুই চাওয়া সংগত হবে যেন তারা সঠিক ভবিষ্যদ্বানী করে। এই ভবিষ্যদ্বাণী করতে গিয়ে কোনো অবস্থার একটি চিত্ররূপ খাড়া করে তুলতে পারা যাচ্ছে কিনা সেটা বিবেচনা করার প্রয়োজন নেই। এই নতুন পদার্থবিদ্যাতে চিত্ররূপ খাড়া করার ব্যাপারটা একেবারেই নেই। মূলতঃ এর মধ্যে বস্তুর বর্তমান অবস্থার সঙ্গে ভবিষ্যত অবস্থার সংযোগ করার জন্যে কতকগুলি গাণিতিক পদ্ধতিই বর্তমান। এ ধরণের নির্দেশপত্রের সাহায্যে পদার্থবিদেরা বস্তু সম্বন্ধে পরীক্ষা নিরীক্ষার ফল আগেই বার করে রাখতে পারবেন। উদাহরণ স্বরূপ, একটি নির্দিষ্ট পরীক্ষায় আলোকরশ্মি তরঙ্গ না কণা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবে, কোয়াণ্টাম পদার্থবিদ্যা তা আগে থেকেই বলে দিতে সক্ষম। ভবিষ্যদ্বাণী করেই কেবল বিজ্ঞান হতে পারে না—এই ধরণের আপত্তি অবশ্য তোলা হয়েছে। এই আপত্তিকারীর মধ্যে আছেন তাঁরা, যাঁদের মতে প্রকৃতিকে বোঝা যাবে তখনই যখন চিত্ররূপের সাহায্যে তা করা সম্ভব হবে।

মানসচক্ষে কল্পনা করার ব্যাপারটাকে সুনির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায় না। যে সকল ধারণার মধ্যে সামান্যতম চিত্ররূপ আছে তারাও কল্পনাযোগ্য হিসেবে চিহ্নিত হবে। সকল ভৌত ধারণার মধ্যে বলবিদ্যার ধারণাগুলিই আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বেশি কাজে লাগে এবং তাই তারা সুপরিচিত। এজন্যে এরকম একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় যে, সে সব ব্যাখ্যাকে পরিষ্কার এবং চিত্রগ্রাহ্য বলা হয় যারা যে কোনো ঘটনাকে পরিচিত গতির ধারণার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করতে পারে। গতিতত্ত্বের সাহায্যে তাপের যান্ত্রিক ব্যাখ্যা কল্পনাযোগ্য বিষয়ের একটি উদাহরণ। ম্যাক্সওয়েলের তড়িৎচুম্বকীয় তত্ত্বটিও কল্পনাযোগ্য

বলা হয়। এর একমাত্র কারণ হল এতে যে সব চিন্তাধারার ব্যবহার করা হয়েছে তারা সকলের পরিচিত, যদিও বলবিদ্যার সঙ্গে তাদের কোনো যোগ নেই। সাধারণভাবে এই বিশ্বাসই চলে আসছে যে একটি তত্ত্বকে কল্পনাযোগ্য তখনই বলা হবে যার সকল ধারণা সনাতনী পদার্থবিজ্ঞান থেকে নেওয়া হবে।

বর্তমানের কোয়াণ্টাম পদার্থবিজ্ঞান নিশ্চিতভাবে চিত্রগ্রাহ্য নয়। এর কারণ হল পরমাণুজগতের প্রতিনিধিত্ব করতে গিয়ে একে এমন সব ধারণার শরণাপন্ন হতে হয় যারা সনাতনী পদার্থবিজ্ঞানে সম্পূর্ণ অপরিচিত ও অর্থহীন। উদাহরণস্বরূপ, কোয়াণ্টাম পদার্থবিজ্ঞান অনুসারে এটা সম্ভব হতে পারে যে কোনো একটি নির্দিষ্ট অবস্থায় কণাটির নির্দিষ্ট সুস্পষ্ট স্থানাঙ্ক নেই। কেবল এই নয় যে কণাটির স্থানাঙ্ক জানা নেই, এর প্রকৃত অর্থ হল স্থানাঙ্ক সাপেক্ষে কণাটির অবস্থা সুস্পষ্ট নয়। এ ধরণের ধারণা আমাদের পরিচিত সকল কিছুর ব্যতিক্রম এবং এক্ষেত্রে বক্তব্যটিকে কল্পনার অযোগ্য বলে ভাবতে হচ্ছে।

আজকের দিনেও কিছু কিছু পদার্থবিদ বা কিছু দার্শনিক আছেন যাঁরা কল্পনা করার ব্যাপারটাকে একই রকম প্রাধান্য দেন এবং নিরাকার বা বিমূর্ত কোন তত্ত্বের (যেমন কোয়াণ্টাম মতবাদ) পক্ষে সম্মতিজ্ঞাপক কিছু বলতে রাজী হন না। তাঁদের বিশ্বাস প্রাকৃতিক ঘটনাকে সত্যি বোঝা যাবে তখন, যখন সব কিছু চিত্ররূপের সাহায্যে কল্পনা করা যাবে। এই মত না মেনে কিছু কিছু বিজ্ঞানী মনে করেন চিত্ররূপের সাহায্যে ব্যাখ্যা চিত্ররূপ বিবর্জিত ব্যাখ্যার চেয়ে অধিক কিছু সাফল্য অর্জন করে না। একমাত্র তফাৎ হল কোনো কল্পনার সাহায্য না নিয়ে প্রাকৃতিক ঘটনা সম্পর্কে যে সব ব্যাখ্যা আছে তাদের নিয়ম তৈরির ব্যাপারে কতকগুলি অপরিচিত ধারণা ব্যবহারের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এর কারণ হল পূর্ববর্তী চিন্তার বিন্যাস নতুন সব পরীক্ষালব্ধ ফলের সামনে একেবারে অকেজো হয়ে যায়। কেবলমাত্র অপরিচিত বলে নতুন ধারণাগুলো পুরোপুরি বাতিল করে দেওয়া শুধু অসঙ্গত নয়, অবৈজ্ঞানিকও বটে। এতে অপরিচিতের সম্বন্ধে চিরদিনের অবিশ্বাসের কাছে আরেকবার নতি স্বীকার করা হবে।

বিখ্যাত বিজ্ঞানী এডিংটন ভৌত চিন্তাধারার নতুনত্বের প্রতি অবিশ্বাস এবং সোনার মূল্য কমে যাওয়ার দরুণ মানুষের উৎকণ্ঠার সঙ্গে সুন্দর একটি উপমা খাড়া করেছেন। তার ভাষায়—

"বলবিদ্যার সুনিশ্চিত নির্ধারণ নীতিগুলো হল ভল্টে জমানো সোনা আর পরিসাংখ্যিক নিয়মগুলো হল কাগজের নোট যাদের কার্যক্ষেত্রে ব্যবহার

করা হয়। সকলেই এই ধারণা আঁকড়ে পড়ে আছেন যে কাগজের নোটগুলোর পেছনে সোনার সহযোগিতা থাকা দরকার। পদার্থবিদ্যা যতই সামনের দিকে এগিয়েছে সোনা তৈরীর ব্যাপারটা কমতে কমতে একেবারে শূন্য হয়ে গেছে। হঠাৎ আমাদের মনে এই প্রশ্নের উদয় হল যে ভল্টে সত্যি সোনা জমা আছে, না তার অস্তিত্ব কাল্পনিক রটনামাত্র। এ গল্পের সবচেয়ে নাটকীয় সমাপ্তি হবে তখনই যখন ভল্ট খুলে দেখা যাবে সত্যি সোনা নেই। আসলে সমাপ্তিটা কিন্তু এতখানি সরল নয়। দেখা যায় ভল্ট খোলার চাবিটি গেছে হারিয়ে এবং কেউই সঠিকভাবে বলতে পারছে না ভল্টে সোনা আছে কী নেই। আমার মনে হয় এটা পরিষ্কার যে পরিণতি যাই হোক না কেন বর্তমান যুগের পদার্থবিদ্যা তার স্বর্ণমান হারিয়ে ফেলেছে।"

শেষ পর্যন্ত বেশির ভাগ পদার্থবিদ চিত্ররূপ ত্যাগ করার ব্যাপারে সম্মত হলেন। এটা ঠিক যে যারা জিনিসটা মানতে পারছেন না তাদেরকে এই ভাবধারা চাপিয়ে দেওয়া ঠিক হবে না। এটা যদি কেউ দাবি করেন যে কোনো ধারণাকে চিত্ররূপের সাহায্যে বোঝা যাওয়া উচিত, তবে সেটা নিতান্তই ব্যক্তিগত বিশ্বাসের আওতায় পড়বে। প্রত্যেক মানুষের সংজ্ঞা ঠিক করার ও নিজস্ব পদ্ধতি প্রকাশের অধিকার আছে। সংজ্ঞা খাড়া করা আর নিশ্চিতভাবে দাবি করা এক জিনিস নয়। চিত্ররূপ খাড়া করার প্রয়োজনীয়তার কথা যিনি কখনই ছাড়তে পারবেন না তার পক্ষে কোয়াণ্টাম মতবাদকে একটি মধ্যবর্তী সমাধান হিসাবে গণ্য করা উচিত হবে এই বিশ্বাস মনে নিয়ে যে এমন দিন হয়ত আসবে যেদিন পরমাণু জগতের সকল কিছু সনাতনী পদার্থবিদ্যার আলোকে ব্যাখ্যা করা যাবে। জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইনও মনে মনে এমনই একটা ধারণা পোষণ করে রেখেছিলেন।

তরঙ্গ বলবিদ্যার পদ্ধতি (Wave mechanics)

আগেই বলা হয়েছে যে বোর নতুন করে পরমাণুজগৎ অনুধাবন করার ব্যাপারে উদ্যোগী হন। তাঁর সবচেয়ে যুগান্তকারী অবদান হলো প্রাকৃতিক ঘটনায় অবিচ্ছিন্নতার অস্তিত্বকে বাতিল করা। সনাতনী পদার্থবিজ্ঞানে এই অবিচ্ছিন্নতা স্বতঃস্ফূর্ত ছিল। তিনি বুঝেছিলেন যে পুরানো ধারণা আঁকড়ে পড়ে থাকলে পরমাণুর চরিত্র বোঝা কষ্টকর হবে।

পরমাণুদের সবচেয়ে চমকপ্রদ বৈশিষ্ট্য হল রেখা বর্ণালী (Line spectrum)। মৌলিক পদার্থের পরমাণু নির্গত বর্ণালীর সকল রেখার স্বতন্ত্র ও নির্দিষ্ট কম্পন সংখ্যা বর্তমান। আগেই বলা হয়েছে বোর এই অনুমান করে সমস্যার সমাধান

করলেন যে ইলেকট্রন কেন্দ্রীনের চারিদিকে ঘুরতে পারে কেবলমাত্র কয়েকটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে। এই অনুমানের অর্থ সনাতনী পদার্থবিজ্ঞানে পরিচিত অসংখ্য কক্ষ-পথের মধ্যে নির্দিষ্ট কয়েকটি কক্ষপথই থাকা সম্ভব। একটি পরমাণু যখন একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথ থেকে অনুমোদিত অপর কোনো কক্ষপথে নেমে আসে তখন রেখা বর্ণালীর একটা রেখা বেরিয়ে আসে। যখনই ব্যাপারটি হয় তখন দুটি অবস্থার মধ্যে শক্তির যে তফাৎ তা আলোয় রূপান্তরিত হয়। এই কারণে আলোর কম্পন সংখ্যা দুটি স্তরের মধ্যে শক্তির তারতম্যের সমানুপাতিক। বোর দেখালেন যে এই অনুমানের সাহায্যে বামার শ্রেণীর সকলরেখাই ব্যাখ্যা করা সম্ভব হচ্ছে। সেই সঙ্গে R' এর মান সঠিকভাবে জানা যাচ্ছে।

বোরের তত্ত্বকে চিত্ররূপ বিসর্জনের ব্যাপারে সামান্যই ভূমিকা নিতে হয়েছিল। এর কারণ হল তত্ত্বটি মোটামুটিভাবে সনাতনী এবং কোয়াণ্টাম ধারণার সংমিশ্রণে গঠিত। কক্ষপথে ইলেকট্রনের গতিবিধি সনাতনী চিন্তা। ইলেকট্রন কেন যে কেবল বিশেষ কয়েকটি কক্ষপথই বেছে নেবে, তার উত্তর আজও পাওয়া যায় না। তাছাড়া ম্যাকস্ওয়েলের তত্ত্বের দাবী অনুযায়ী নির্দিষ্ট কক্ষপথে শক্তিক্ষরণ না করেই চিরস্থায়ী ভাবে ইলেকট্রন কীভাবে বিরাজ করছে তারও কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে না। সবশেষে বেরিয়ে আসা আলোক রশ্মির কম্পাঙ্কের সঙ্গে শক্তির তারতম্যের সমানুপাতের ব্যাপারটাও সনাতনী পদার্থ বিজ্ঞানের পরিভাষায় অবোধ্য।

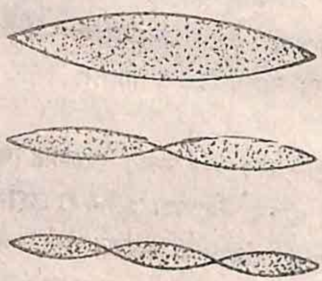
এই ধরণের সব অসুবিধা দূর করার প্রচেষ্টায় কিছুদিন পরে এল তরঙ্গ-বলবিদ্যা। এই নতুন তত্ত্বের উদ্‌গাতা হলেন দ্য ব্রগ্‌লি। ১৯২৪ সালে তাঁর প্রস্তাবিত ধারণাকে আরও পরিবর্ধিত করলেন অস্ট্রিয়ার বিজ্ঞানী শ্রোয়ডিংগার। এঁদের মূল উদ্দেশ্য ছিল সনাতনী ধারার সঙ্গে সংগতি রেখে এমন একটি কার্য-প্রণালী তৈরি করা যার সাহায্যে বোরের তত্ত্বটির যথার্থ প্রমাণ করা যাবে। মনে তাঁদের ক্ষীণ আশা ছিল যে পরমাণুর ক্রিয়াকলাপ বোঝার ব্যাপারে চিত্ররূপ কল্পনা করতে পারার ব্যাপারটিকে তারা বজায় রাখতে পারবেন।

জারমান বিজ্ঞানী হাইজেনবার্গ ভিন্ন পথ অবলম্বন করলেন। কল্পনা করার ব্যাপারটা তিনি শুরুতেই ত্যাগ করলেন। একটি বিকল্প পদ্ধতি তৈরি করলেন যার পরিচয় হল ম্যাট্রিকস্ বলবিদ্যা হিসাবে। পরে অবশ্য দেখা গেছে যে আপাত-দৃষ্টিতে একেবারে ভিন্ন এই তত্ত্ব দুটি একই লক্ষ্যে পৌঁছায়। তবে তাদের বাহ্যিক তফাৎটা এতই প্রকট যে এক সময়ে তাদের দুটি মৌলিকভাবে ভিন্ন তত্ত্ব হিসাবে ভাবা হয়েছিল।

তরঙ্গ বলবিদ্যাতে দ্য ব্রগ্‌লি, শ্রোয়ডিংগার বিচ্ছিন্নতাকে সরাসরি তত্ত্বের মধ্যে

না ঢুকিয়ে পরমাণুর ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলেন। প্রথাগতভাবে তাঁরা আঙ্কিক বর্ণনার জন্যে ডিফারেন্সিয়াল সমীকরণকেই বেছে নিয়েছিলেন। সনাতনী পদার্থবিজ্ঞানের আওতায় থেকেও পরমাণু কীভাবে পূর্ণসংখ্যার দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে সেটা বোঝাই ছিল আসল সমস্যা স্বীকৃত তত্ত্বের মধ্যে কেবলমাত্র কম্পনের বেলাতেই স্থিতাবস্থার সঙ্গে পূর্ণ সংখ্যার সংযোগ রয়েছে। কম্পনশীল বস্তুর ওপরে উপযুক্ত সীমাশর্ত আরোপ করলেই এই সংযোগটি ধরা যায়।

একটি কম্পনশীল তার এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কম্পনশীল তারের গতি একটি ডিফারেন্সিয়াল সমীকরণ মেনে চলে। নীতিগতভাবে এই সমীকরণের অসংখ্য মীমাংসা সম্ভব। কিন্তু একটি তারের দুই প্রান্ত সবসময় বেঁধে রাখলে অবস্থা দাঁড়াবে অন্যরকম। এক্ষেত্রে তারের প্রান্তের গতি সকল সময়ই শূন্য। এই সীমাশর্তের (Boundary condition) জন্যে সম্ভাব্য বহু গাণিতিক মীমাংসার মধ্য থেকে বিশেষ কয়েকটি মীমাংসাই সম্ভব হয়। এই সব মীমাংসা পূর্ণসংখ্যার উপস্থিতিতে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এর অর্থ হল একটি তার স্থিতাবস্থায় কম্পমান থাকলে কয়েকটি নির্দিষ্টসংখ্যক বক্রতাই সমস্ত দৈর্ঘ্য জুড়ে থাকতে পারে।

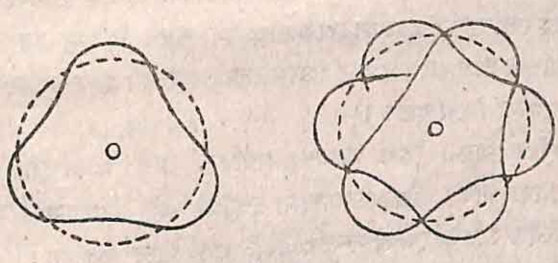


চিত্র ১৫
একটি বেহালার তার যে যে ভাবে কাঁপতে পারে তারই কয়েকটি ভঙ্গিমা দেখানো হল। সংহত অবস্থার তারটি এদের যে-কোনো একটি ভঙ্গিমায় কম্পিত হতে পারে।

দ্য ব্রগ্‌লি যখন বোর অনুমোদিত সুস্থিতস্তরের ব্যাখ্যার চেষ্টা করছিলেন তখন কম্পমান তারের তুলনায় তাঁর মনে এই ভাবের উদয় হল যে পরমাণুর মধ্যে সুস্থিতস্তরের উৎপত্তি তরঙ্গের নিজের সঙ্গে ব্যতিচারের জন্যে হতে পারে। সত্যি বলতে কি কেন্দ্রীনের চারিপাশে ইলেকট্রনের ঘোরার সঙ্গে তরঙ্গের সম্বন্ধ কী তা তখনও পরিস্ফুট ছিল না। ইলেকট্রন ছোট একটি বস্তু না হয়ে তরঙ্গ হতে পারত, কিন্তু সেটা নিতান্তই অবিশ্বাস্য ব্যাপার ছিল। এছাড়া যে মাধ্যম দিয়ে এ ধরণের তরঙ্গ প্রবাহিত হবে তার স্বরূপ কী সেটাও ছিল অজানা। স্বীকার

করতেই হবে যে এই সব বিষয়গুলো খুবই কঠিন ছিল। অচিরেই উত্তর পাওয়া যাবে এ ভরসায় কিন্তু এসব প্রশ্ন দূরে সরিয়ে রাখা যায় নি। যে কোনো ভাবেই হোক নতুন ধারণাটিকে কতদূর পর্যন্ত টেনে নেওয়া যেতে পারে তা অনুসন্ধান করা যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছিল।

এ ধরণের অনুসন্ধানের ফল হল সুদূরপ্রসারী। যদি ইলেকট্রনের কক্ষ পরিক্রমাকে তরঙ্গ হিসাবে প্রকাশ করা যায় তবে একটি পুরাতন ছবির সাহায্যে এঁকে বোঝানো যাবে। এর জন্যে ইলেকট্রনের বৃত্তাকার কক্ষপথের জায়গায় ঢেউখেলানো লাইন টানতে হবে। এই ঢেউখেলানো লাইনকে একটি পূর্ণ বৃত্ত শেষ করেও যদি অস্তিত্ব রক্ষা করতে হয় তবে দুটি সম্ভাবনার কথা মনে আসে। (১) একটি তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বা তার গুণিতক সংখ্যার তরঙ্গই কক্ষপথের পরিধিকে ঘিরে থাকবে। এক্ষেত্রে তরঙ্গগুলি দ্বিতীয়বার পরিধি পরিক্রমা শুরু করার সময় তরঙ্গের গতি প্রথম তরঙ্গের গতি যেদিকে ছিল সেইদিকে থাকবে। এতে তরঙ্গগুলি পরস্পরকে বর্ধিত করবে। (২) প্রথম সম্ভাবনার মতো যদি পূর্ণ কক্ষপথ বিচরণ ক'রে তরঙ্গ প্রারম্ভিক অবস্থার সমদিকে না এসে বিক্ষিপ্তভাবে আসে তাহলে পরিণামে তরঙ্গগুলি পরস্পরকে বিনষ্ট করে একটি নিটোল বৃত্ত রচনা করবে।



চিত্র ১৬

দ্য ব্রগ্‌লি ইলেকট্রনের কক্ষপথকে তরঙ্গের একটি সুস্থিত নকশা হিসাবে ভেবেছিলেন। সেইসব কক্ষপথের অস্তিত্বই থাকবে যার পরিধির চারিপাশে পূর্ণসংখ্যক তরঙ্গদৈর্ঘ্য খাপ খাওয়ানো যাবে। তা না হলে তরঙ্গগুলি একে অপরের পেছনে পড়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত ব্যতিচারের ফলে একে অপরকে বিনষ্ট করে ফেলবে। চিত্রের দ্বিতীয় অংশে সেটাই দেখানো হয়েছে।

দ্য ব্রগ্‌লির পরিকল্পনার মধ্যে পরমাণুর সুস্থিতন্তরের জন্যে একটি তরঙ্গ সত্তা আরোপ করার ধারণাটি ছিল চিন্তার মৌলিকতায় প্রোজ্জ্বল। কক্ষপথগুলি তরঙ্গের পারস্পরিক ব্যতিচারের ফলে সৃষ্ট। আগে যে তারের উদাহরণ দেওয়া হল সেইভাবে নির্দিষ্টসংখ্যক কয়েকটি কক্ষপথের অস্তিত্ব পাওয়া সম্ভব এবং

বামারের ফরমূলার মধ্যে পূর্ণসংখ্যার অস্তিত্বও ব্যাখ্যা করা সম্ভব। এইভাবে সকল পূর্ণসংখ্যার উপস্থিতি নিছক কল্পনায় না থেকে যুক্তির আনুকুল্য লাভ করল। তরঙ্গের আকৃতি বজায় রাখার জন্যে পূর্ণসংখ্যার তরঙ্গদৈর্ঘ্যই কক্ষপথের পরিধি আবেষ্টন করা দরকার এবং সেই কারণেই পূর্ণসংখ্যার উপস্থিতি।

দ্য ব্রগ্‌লির চিন্তাধারার সঙ্গে মেলাতে গেলে ইলেকট্রনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তরঙ্গের দৈর্ঘ্য ও কম্পনসংখ্যার সম্বন্ধে আরও একটি শর্ত আরোপ করা দরকার। যদি প্রশ্ন করা হয় এই রাশিগুলো কার ওপর নির্ভর করবে তার সঙ্গত উত্তর হবে তাদের সঙ্গে ইলেকট্রনের গতিবেগের একটি সম্পর্ক থাকা খুবই সম্ভব। এছাড়া এ ধরণের সম্পর্কের মধ্যে প্লাঙ্কের ধ্রুবক (h) উপস্থিত থাকাও সম্ভব দ্য ব্রগ্‌লি দেখলেন এই সম্পর্কটি নিম্নরূপ হওয়া উচিত :

$$l=\frac{h}{mv} \quad \text{এবং} \quad f=\frac{E}{h}$$

এখানে l হচ্ছে তরঙ্গদৈর্ঘ্য f=কম্পন সংখ্যা m=ইলেকট্রনের ভর, v হল গতিবেগ ও E শক্তি। দ্য ব্রগ্‌লি যখন এই সম্পর্কগুলি বার করেন তখন তাদের পরীক্ষার সাহায্যে পরিমাপ করার সরাসরি কোনো উপায় ছিল না। তিন বছর পরে ডেভিসন ও জারমার, যাদের কথা আগেই বলা হয়েছে, কেলাস থেকে ইলেকট্রন বিক্ষেপ পরীক্ষা থেকে দেখলেন যে কেলাস থেকে তরঙ্গ যে ভাবে বিক্ষিপ্ত হয় ইলেকট্রনও সেইভাবে বিক্ষিপ্ত হচ্ছে এবং এক্ষেত্রে ইলেকট্রনের তরঙ্গদৈর্ঘ্য হওয়া দরকার দ্য ব্রগলি সম্পর্কের সঙ্গে তা মিলে যাচ্ছে।

দ্য ব্রগ্‌লির ধারনা ছিল পরমাণু জগতের সমস্ত ঘটনাগুলি তরঙ্গগতির সহায়তায় বোঝা যাবে। শ্রোয়ডিংগার, দ্য ব্রগ্‌লির এই ধারণাকেই মেনে নিয়ে, তার উপর ভিত্তি করে অণুজগৎ সম্বন্ধে একটি তত্ত্ব খাড়া করলেন। এই তত্ত্বের মূল বৈশিষ্ট্য হল শ্রোয়ডিংগারের বিখ্যাত ডিফারেন্সিয়াল সমীকরণ। তরঙ্গ বলবিদ্যার এই মৌলিক সমীকরণটি সহজেই ব্যবহার করা চলে; কারণ গাণিতিকরা বহুপূর্বেই এই ধরনের সমীকরণের সমাধান বার করে রেখেছিলেন, যদিও তাঁরা জানতেন না যে একদিন পদার্থ বিজ্ঞানে এর উপযোগিতা দেখা দেবে। এই সমীকরণে Ψ (xyz) নামক একটি রাশির উপস্থিতি আছে। এই রাশিটি তরঙ্গ বিস্তার নির্দেশ করে। এর মান নির্ভর করে স্থানাংক xyz এর উপর। এছাড়া আরেকটি রাশি E ও এই সমীকরণে পাওয়া যায় এবং তা পরমাণুর মোট শক্তি নির্দেশ করে। শ্রোয়ডিংগারে সমীকরণের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল কেবল নির্দিষ্ট শক্তি মানের অর্থাৎ E_0, E_1, E_2 ইত্যাদির জন্য তার সমাধান সম্ভব। এর মাণে পরমাণু যার সঙ্গে শ্রোয়ডিংগারের সমীকরণ সংযুক্ত কেবল কয়েকটি নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি-

স্তরে (E_0, E_1) ইত্যাদি থাকতে পারে। পরমাণুর গঠন বৈশিষ্ট্য ওপর শক্তির প্রকৃত মান নির্ভর করবে। যদি এমন একটি পরমাণু হয় যাতে কেবল একটিমাত্র বিচরণশীল ইলেকট্রন আছে, তাহলে E-এর মান কেবলমাত্র কেন্দ্রীনের আকর্ষক বলের ওপর নির্ভর করবে।

হাইড্রোজেন ক্ষেত্রে তরঙ্গ বলবিদ্যা সর্বপ্রথম সাফল্য অর্জন করল। দেখা গেল হাইড্রোজেনের রেখাবর্ণালী ব্যাখ্যা করতে বামার ও বোর যে শক্তিস্তরের কল্পনা করেছিলেন শ্রোয়ডিংগারের সমীকরণের সাহায্যে তাই পাওয়া যাচ্ছে। সুস্থিত স্তরগুলি যাদের বোর তত্ত্বে কিছুটা কৃত্রিমভাবে এবং কষ্টকর অনুমানের সাহায্যে বুঝতে হয়েছিল তাদের স্বাভাবিক ভাবেই তরঙ্গের পারস্পরিক ক্রিয়াজনিত কারণে উদ্ভূত বলে বোঝা যাচ্ছে। একথা স্বীকার্য যে হাইড্রোজেনের জন্য পরিপূর্ণ চিত্রগ্রাহ্য রূপ এতে পাওয়া যাচ্ছে না। বোরের মত শ্রোয়ডিংগারও এটা অনুমান করে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন যে একটি সুস্থিত স্তর থেকে আরেকটি সুস্থিত স্তরে যাওয়ার ব্যাপারটা স্থানকাল সাপেক্ষে বিশ্লেষণ করা যাবে না। এর অর্থই হল সনাতনী পদার্থবিজ্ঞানের আলোকে এদের ব্যাখ্যা করা যাবে না।

তরঙ্গের স্বরূপ বিশ্লেষণ

তরঙ্গ বলবিদ্যা প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে দ্য ব্রগ্লি শ্রোয়ডিংগার পরমাণু বা মৌলিক কণাদের ব্যবহার ব্যাখ্যা করার জন্য সনাতনী বিজ্ঞানের মত চিত্ররূপের সাহায্য নেবার কথা ভেবেছিলেন। তাঁরা দেখলেন যে এটা করার কেবলমাত্র একটিই পথ আছে। বস্তুকণার গতিবিধিকে যেমন ভাবেই হোক তরঙ্গের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে দিতে হবে। এতে অন্ততঃ স্তরের অস্তিত্বটা ব্যাখ্যা করা যাবে। ফলে নতুন একটি প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। দুটো সত্তাই কি প্রকৃত, নাকি একটি সত্তা অন্তর্হিত হলে অপর সত্তাটি আত্মপ্রকাশ করে।

এই প্রশ্নের উত্তর নানাভাবে খুঁজে পাবার চেষ্টা করা যেতে পারে। সবচেয়ে নতুনভাবে ভেবেছিলেন স্বয়ং শ্রোয়ডিংগার। তাঁর মতে তরঙ্গই কণাদের প্রকৃত অবস্থা। এ ধরনের তরঙ্গের উৎপত্তি বহু তরঙ্গের যৌথক্রিয়ার ফল। ধরা যাক্ একটি স্থানে নানান দৈর্ঘ্য-বিশিষ্ট তরঙ্গ পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। ছোট জায়গা জুড়ে সেই তরঙ্গগুলি পরস্পরকে পরিবর্ধিত করবে, বাকি সকল স্থানেই যৌথ ক্রিয়ার ফলে বিনষ্ট হয়ে যাবে। এই পরিবর্ধিত অংশটির সঙ্গে গতি ও শক্তি সংযোজিত থাকবে। ভর শক্তি সূত্র অনুযায়ী এর অর্থ হবে সেই স্বল্প পরিমিত স্থানে ভরের অবস্থান। এর ফলে সেই স্থানে একটি কণা আছে বলে মনে হবে।

ধরা যেতে পারে যে কোনো স্বল্প পরিমিত জায়গায় শক্তি কেন্দ্রীভূত হলে তা কণার রূপ পরিগ্রহ করবে।

এই ভাবে কণাদের অস্তিত্বের কথা ভাবার কতকগুলি অসুবিধাও আছে। তরঙ্গগতি একটি খুবই ক্রিয়াশীল ঘটনা। প্রত্যেক তরঙ্গই নির্দিষ্ট গতিবেগ নিয়ে চলেছে। এর ফলে ব্যতিচারের কাঠামো সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অস্পষ্ট হতে থাকে। যেহেতু কণাদের এমন একটি গঠনশিল্প হিসাবে ভাবতে হবে যার স্থায়িত্ব আছে সেই কারণে বস্তুকণার সঙ্গে তরঙ্গ সংশ্লিষ্ট করাটা অসুবিধাজনক। এই কারণেই অনেক পদার্থ-বিদ্‌দের ধারণা শ্রোয়ডিংগারের কণাদের তরঙ্গ হিসাবে ভাবার নির্দেশটিকে পরিহার করতে হবে।

তরঙ্গ ও পরিসংখ্যান

জার্মানবিজ্ঞানী ম্যাকস্‌বর্ণ এই মতে বিশ্বাস করতেন। তিনি অনুমান করলেন কণারা প্রকৃত এবং তরঙ্গ $\Psi(x,y,z)$ একটি গাণিতিক রাশিমাত্র। তাঁর মত অনুযায়ী $\Psi(x,y,z)$ তরঙ্গের বিস্তারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। x,y,z স্থানাঙ্ক বিশিষ্ট কোনো স্থানে কণাটিকে পাবার সম্ভাব্যতাই এর সাহায্যে পাওয়া যাবে। এইভাবে দেখলে কণা-চরিত্র বজায় রেখে তরঙ্গের একটি ব্যাখ্যা পাওয়া গেল। এই ধরণের ব্যাখ্যাকে ভিত্তি করে হাইসেনবার্গ, বর্ণ, জরডন্ এবং ডিরাক প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা কোয়াণ্টাম পদার্থবিজ্ঞানের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও চিত্তাকর্ষক রূপ দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

যদি এই কণাদের সত্য বলে ধরে নেওয়া হয় তাহলে তরঙ্গের প্রকৃত প্রবাহ ধরার কোনো প্রয়োজন নেই। ভবিষ্যতে পরীক্ষা করলে সম্ভাব্য কী ফল পাওয়া যাবে সে সম্বন্ধে ইঙ্গিত দেবে কণার তরঙ্গ চরিত্রটি, তরঙ্গের বিস্তারই যে কোনো স্থানে এধরনের সম্ভাব্যতার মান নির্ণয় করবে। এক জায়গায় তরঙ্গের বিস্তার যত বেশি হবে, সেই জায়গায় কণাটিকে পাওয়ার সম্ভাব্যতাও তত বাড়বে।

কেলাস দ্বারা ইলেকট্রনের বিক্ষেপ সংক্রান্ত আলোচনায় দেখা গেছে যে পরীক্ষার ফলগুলি এ ধরনের ব্যাখ্যাকে প্রকৃত বলে সাব্যস্ত করে। তরঙ্গ বলবিদ্যার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এর মতে প্রাকৃতিক ঘটনাসমূহের মধ্যে সুনির্দিষ্ট নিশ্চয়তার ধারণা সম্পূর্ণভাবে বাদ দিতে হবে। তরঙ্গ বলবিদ্যা একটি বস্তুর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সুনিশ্চিতভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করার অনুমতি দেয় না। পরবর্তী অনুসন্ধানে কোনো বস্তু বর্তমান অবস্থা ছেড়ে অন্য অবস্থায় যাওয়ার সম্ভাব্যতা কতখানি সেটাই শুধু এই তত্ত্ব থেকে পাওয়া যাবে। এর অর্থ হল নতুন পদার্থ-

বিদ্যায় দৃঢ় ও নিশ্চিত কার্যকারণ পারিসাংখ্যিক নিয়ম দ্বারা প্রতিস্থাপিত হতে হবে।

কার্যকারণ ও পরিসংখ্যান

বর্তমান যুগের পদার্থবিদ্যার ক্রমোন্নতি কার্যকারণ চেতনায় যে মৌলিক পরিবর্তন এনেছিল তার কথা আগেই বলা হয়েছে। কার্যকারণ নীতিকে কোনো মৌলিক ধারণার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী করলে চলবে না। একে এমন একটি শর্ত হিসাবে মানতে হবে যা সত্য বা মিথ্যা প্রমাণিত হতে পারে। এই শর্তটি হল একই পরিবেশে ও একই প্রাথমিক অবস্থা বজায় থাকলে কোনো ঘটনা সব সময় একইভাবে ঘটবে। প্রকৃতি যদি এই ভাবে চলে তাহলে যে কোনো ঘটনার সম্বন্ধেই ভবিষ্যদ্বাণী করা যেতে পারে। পূর্বেকার অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে বলা চলবে কোনো বস্তুর বর্তমান অবস্থা থেকে পরবর্তী অবস্থা কী হবে। কার্যকারণের সংজ্ঞা অন্য কোনো সংজ্ঞার মত সহজ নয়। কার্যকারণের প্রকৃত অর্থ হল যে প্রত্যেক কার্যের সঙ্গে একটি কারণ সংযুক্ত থাকবে। কিন্তু ভৌতভাবে বলতে গেলে এটা কোনো মতেই যুক্তিগ্রাহ্য নয়। একটি ঘটনাকে কখনই একটিমাত্র কারণের সঙ্গে যুক্ত করা যাবে না। প্রকৃত পক্ষে অনেকগুলো কারণেরই ফলশ্রুতি একটি ঘটনা।

ঝড়ের সময় রাস্তায় ভ্রাম্যমাণ পথচারী ঝড়ের আঘাতে ভেঙে পড়া গাছের ডালে আঘাত পেতে পারেন। এই দুর্ঘটনার আশু কারণ হল ঝড় যার জন্যে গাছের ডাল ভেঙে পড়েছে। কিন্তু ঝড়টাই আবার কতকগুলো কারণে সৃষ্ট। এক্ষেত্রে আবহাওয়ার নানারূপ পরিবর্তনই এর মূলে। আবহাওয়ার পরিবর্তনের সঙ্গে আবার কতকগুলি কারণের ক্রমিক পর্যায় আছে। প্রকৃতপক্ষে অনেকগুলি কারণ সম্মিলিতভাবে কাজ করেছে ডাল ভাঙার ক্ষেত্রে।

সুতরাং পদার্থবিজ্ঞানের দিক থেকে কার্যকারণের ব্যাপারটি সাধারণ দর্শনে যে ভাবে প্রতিভাত হয় তার থেকে অনেক বেশি জটিল। একটি ঘটনার জন্যে একটি কারণকেই দায়ী করা যাবে না বরঞ্চ বিশ্বের সমগ্র অতীতের সংগে তা জড়িত। প্রত্যেক কার্যের পিছনে একটি কারণ আছে—এরকম সরল ব্যঞ্জনা না করে একজন পদার্থবিদের উচিত হবে একে প্রকৃতির এমন একটি ধর্ম হিসাবে ভাবা যা আরও ব্যাপক সংজ্ঞার অপেক্ষা রাখে। আরও অর্থবহ ভাবে বলা যেতে পারে প্রকৃতি এমনই যে কোনো বস্তুর বর্তমান অবস্থা জেনে তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা যেতে পারে। এই সংজ্ঞায় মূলগত ভাবটি আগের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে। প্রাথমিক অবস্থা এক থাকলে কোনো বস্তুর পরিবর্তন একই ক্রম অনুসরণ করবে।

দুটি সংজ্ঞাই সনাতনী ও কোয়াণ্টাম পদার্থবিদ্যাতে প্রযোজ্য। আজও একটি ভুল ধারণা আছে যে বর্তমানে পদার্থবিদ্যা কার্যকারণ ব্যাপারটা একেবারে পরিহার করেছে। প্রত্যেক ভৌততত্ত্বের উচিত বর্তমান অবস্থা থেকে ভবিষ্যত জানার সকল উপায় বজায় রাখা। তা না হলে এটা মনে হতে পারে প্রকৃতিতে ঘটনাক্রমে একেবারেই বিশৃঙ্খল। আর বিশৃঙ্খলা থাকলে পদার্থবিজ্ঞান তার অর্থ সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে ফেলবে। কোয়াণ্টাম পদার্থবিদ্যাতেও কার্যকারণ সম্বন্ধ বজায় আছে। সনাতনী পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রের মত এখানেও বর্তমান থেকে ভবিষ্যৎকে জানবার সম্ভাব্যতার কথা বলা হয়েছে।

কোনো বস্তুর অবস্থা বলতে এটাই বোঝায় যে একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তে বস্তুটি কি পরিস্থিতিতে আছে। সনাতনী পদার্থবিদ্যা অনুযায়ী যে সকল জিনিস পরীক্ষার সাহায্যে সুস্পষ্টভাবে নির্ণয় করা যায় তাদের দ্বারাই বস্তুর অবস্থা নিয়ন্ত্রিত হবে। একটিমাত্র কণার দ্বারা তৈরি কোনো বস্তুর ক্ষেত্রে পরিমাপযোগ্য বিষয়গুলো হল স্থানাঙ্ক এবং গতিবেগ তথা ভরবেগ, গতিশক্তি এবং স্থিতিশক্তি ইত্যাদি। বস্তুর যে কোনো অবস্থায় এদের প্রত্যেকটির সুনির্দিষ্ট মান থাকে ফলে এদের সাহায্যে অন্য যে কোনো অবস্থার সম্বন্ধে বর্ণনা দেওয়া সম্ভব হবে। এই হল সনাতনী পদার্থবিদ্যার পদ্ধতি।

কোয়াণ্টাম পদার্থবিদ্যা এই মতবাদকে গ্রহণ করতে পারে না অনিশ্চয়তা সূত্রের জন্য। এই সূত্র অনুযায়ী যেসব জিনিসের কথা বলা হয়েছে তারা একই সঙ্গে এক অবস্থায় কখনই সুনির্দিষ্ট নয়।

অনিশ্চয়তা সূত্র (Uncertainty Principle)

সকল পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিই বস্তুর ওপরে কমবেশি কিছু প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। সুতরাং কোনো বস্তুর ওপরে কোনো পরীক্ষা চালিয়ে যে ফল পাওয়া যাবে সেটা প্রকৃতপক্ষে ঐ বস্তুর প্রাথমিক প্রাকৃতিক অবস্থার উপর পর্যবেক্ষণপদ্ধতির প্রতিক্রিয়া।

এর উদাহরণ খুঁজে বার করা খুব কঠিন কাজ নয়। কোনো বস্তুর অবস্থিতি বার করতে হলে বস্তুটিকে আলোকিত করা দরকার কারণ বস্তুটির থেকে আলো প্রতিফলিত হলে তার অবস্থিতি বোঝা যাবে। বস্তুকণাটির ওপর আলোয় প্রতিফলিত হলে কণাটির প্রাথমিক অবস্থার কিছু পরিবর্তন ঘটবে। আবার কোনো বস্তুর উষ্ণতা মাপতে গেলে তাকে একটি থার্মোমিটারের সংস্পর্শে আনতেই হবে। বস্তুটি এবং থার্মোমিটারটি এক উষ্ণতায় আসবে। একই উষ্ণতায় আসতে গিয়ে তাদের কিছু পরিমাণ তাপ আদান প্রদান করে নিতে হয়। সুতরাং প্রত্যেকটি

ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে পরিমাপ পদ্ধতি বস্তুটির ওপরে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে। এ পর্যন্ত জানা ছিল। মানুষের বিশ্বাস ছিল যে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির উন্নতি সাধন করে এই প্রতিক্রিয়ার মান কমানো যাবে। এই মান শূন্য হলেই আসল প্রকৃতির সন্ধান পাওয়া যাবে।

প্লাঙ্কের সূত্র অনুযায়ী বিকিরণ শক্তি ইচ্ছামতো ক্ষুদ্র পরিমাণে পাওয়া সম্ভব নয়। ক্ষুদ্রতম অংশটি অভঙ্গুর। এর শক্তির পরিমাপ E=hf। এর মানে অন্ততঃ আলো যে সব পরীক্ষায় ব্যবহৃত হয় সেখানে বস্তুটির সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার একটি নিম্নসীমা থাকবে। প্লাঙ্কের আবিষ্কার একটি ব্যাপকতর সিদ্ধান্তের একটি বিশেষ রূপ। ঐ ব্যাপকতর সিদ্ধান্তটি হল যে ঃ মৌলিক কণাদের মধ্যে বা মৌলিক কণার সঙ্গে আলোকের সকল ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার এমন একটি প্রাথমিক পদ্ধতি আছে যাকে স্থানকালের সীমানায় আর খণ্ডিত করা যাবে না। দৃশ্যমান জগতে কোনো বস্তুর প্রাকৃতিক অবস্থার উপর পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির প্রতিক্রিয়া এত কম যে পরীক্ষার ফলাফলের উপর এর প্রভাব বেশি পড়ে না। পরমাণু জগতে প্রবেশ করে দেখা গেল ফল অন্যরকম। পরমাণু জগতে প্রবেশের অন্যতম হাতিয়ার হল বিকিরণ। এই বিকিরণের নিয়ম ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্লাঙ্ক দেখালেন যে এই বিকিরণ-এর শক্তিকে একটা নির্দিষ্ট সীমার নীচে কখনই আনা যায় না। এই সীমানাই একটী ধ্রুবক (h) এর উপর নির্ভরশীল।

সুনিশ্চিত পরিমাপের ব্যাপারে সীমারেখা আরোপ করে প্লাঙ্কের ধ্রুবক (h) সনাতনী পদার্থবিজ্ঞান যে ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে সেই ভিত্তিকেই অপ্রতুল প্রমাণ করল। পরিমাপ পদ্ধতির প্রভাব ইচ্ছেমতো কমান যাবে—এই ধারনাই প্রমাণিত হল। hএর মান বস্তুর অবস্থা পরিবর্তনের নিম্ন সীমারেখা আরোপ করল। এই পরিবর্তন কখনও সুনিশ্চিতভাবে অনুধাবন করা যাবে না। পরিমাপের পর ভৌত রাশিটির অবস্থাও অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। এই অনিশ্চয়তা-সীমানার মান ধ্রুবক (h) দিয়ে নির্ধারিত হবে। অনিশ্চয়তা সূত্রটির প্রবক্তা হলেন হাইজেনবার্গ। এই সূত্রটিকে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার একটি মৌলিক অংশ বলে ধরা হয়। বস্তু সংশ্লিষ্ট কোনো রাশি q এর সঙ্গে সংলগ্ন আরেকটি রাশি p থাকবে। এ ধরণের সংলগ্ন রাশি দুটোকে যুগ্ম রাশি (conjugate variable) বলা হয়। মনে করা যাক q পরিমাপ করার আগে p এর মান সুনির্দিষ্ট ছিল। এখন অনিশ্চয়তা সূত্র বলে, যে q এর পরিমাপ পদ্ধতি p এর মানকে কিছুটা অনিশ্চিত করে দেয় এবং এই অনিশ্চয়তার পরিমাপ হল dp। যদি dq=0 হয় অর্থাৎ q যদি নির্ভুল-ভাবে মাপা যায় তাহলে dpর মান অসীম হবে তখন p এর সম্বন্ধে কোনোরকম মন্তব্যই করা যাবে না। p এর মান আর নির্ণয়যোগ্য থাকবে না।

শেষের অসুবিধা দূর করার জন্যে পদার্থবিদকে q এর সম্পূর্ণ নিশ্চিত মান নির্ণয় করা থেকে বিরত থাকতে হবে। dq পরিমাণ অনিশ্চিত রেখেই তাকে q এর মান নির্ণয় করতে হবে। এক্ষেত্রে dpর একটি সসীম মান থাকবে এবং উভয় অনিশ্চয়তা নিম্নোক্ত সূত্র দিয়ে সংযোজিত হবে,

$$dp\, dq \geqslant h$$

এখানে ⩾ এর অর্থ হল হয় সমান না হয় বড়। এইটাই হল হাইজেনবার্গের বিখ্যাত অনিশ্চয়তা সূত্র। এই সূত্রটি যে কোন দুইটি যুগ্ম রাশির বেলায় প্রযোজ্য হবে।

উদাহরণ স্বরূপ, ইলেকট্রনের স্থানাঙ্ক অর্থাৎ x,y,z নির্ণয় করতে গেলে ইলেকট্রনটিকে আলোকিত করতে হবে। আলোর দ্বৈত চরিত্র বিশ্লেষণ করার সময় দেখা গেছে বিকিরণ যখন কোনো বস্তুকণার সঙ্গে বিক্রিয়া করে তখন সে কতকগুলি কণার সমষ্টি বা ফোটন হিসাবে ব্যবহার করে। সুতরাং আলোর দ্বারা ইলেকট্রনের সঙ্গে ফোটনের সংঘর্ষ হবে। এই সংঘর্ষের দরুণ ইলেকট্রনের গতিবেগ পরিবর্তিত হয়ে যাবে। এই সংঘর্ষের জন্যে অন্ততঃ একটি ফোটনের প্রয়োজন। সুতরাং আলোকিত করায় এমন একটি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় যাকে একটি নির্দিষ্ট সীমারেখার নীচে কখনও নামানো যাবে না। কারণ হল ফোটনের সর্বনিম্ন যে শক্তি আমরা ব্যবহার করতে পারি তা হলো hf, f ব্যবহৃত আলোকের কম্পনসংখ্যা।

এখানে দ্বৈতরাশিদ্বয় p ও q ইলেকট্রদের গতিবেগ ও স্থানাঙ্ক নির্দেশ করে। কাজেই স্থানাঙ্কের নির্ণয়ের ব্যাপারে ইলেকট্রনের গতিবেগ তথা ভরবেগ সংশ্লিষ্ট আছে। সাধারণভাবে মনে হতে পারে ফোটনের সংঘর্ষে ভরবেগের পরিবর্তন গণনা করে নিলেই হয়ত এই অনিশ্চয়তার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। প্রকৃত সত্য কিন্তু এ রকমটি নয়। কারণ ফোটন দ্বারা সৃষ্ট প্রাথমিক গতি কখনই নিশ্চিতভাবে বিশ্লেষণ করা যায় না। সুতরাং q এর পরিমাপ করার পর সব সময়ই ভরবেগ নির্ণয়ের একটি ন্যূনতম অনিশ্চয়তা dp থাকবেই।

অপর পক্ষে p কে নিশ্চিতভাবে পরিমাপ করতে গেলে q অনিশ্চিত হয়ে পড়বে এবং q এর মানে dq অনিশ্চয়তা আরোপ করবে। দুয়ের মধ্যে নির্ভরতা আরও পরিস্ফুট হয় যখন এটা বোঝা যায় যে কণার ভরবেগের অনিশ্চয়তার অর্থই হলো পরে কণাটি কোথায় থাকবে বা কোনদিকে যাবে সে বিষয়ের অনিশ্চয়তা।

অনিশ্চয়তা সূত্রের অর্থ

আগেই বলা হয়েছে যে অনিশ্চয়তা সম্বন্ধ একই সঙ্গে দুটো যুগ্ম রাশির সঠিক পরিমাপের সম্ভাবনা বাতিল করে দিচ্ছে। আলাদাভাবে হয়ত এ ধরনের

পরিমাপ সম্ভব কিন্তু একই সময়ে তাদের সুনিশ্চিত মান কখনই নির্ণয় করা যাবে না। এটা ভাবা ঠিক হবে না যে এই অনিশ্চয়তা পরিমাপ পদ্ধতির কোনো ত্রুটির জন্যে হচ্ছে যে ত্রুটি হয়ত কোনো একদিন পরিহার করা যাবে। আসলে এই অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হচ্ছে প্রকৃতির কোনো এক খামখেয়ালী বৈশিষ্ট্যের জন্যে। এই বৈশিষ্ট্য কোনদিনই একটি প্রাথমিক প্রক্রিয়া বুঝতে দেবে না। এই বৈশিষ্ট্যকেই সাধারণভাবে পরিপূরকতা (Complementary) নীতি হিসাবে বলা হয়েছে।

দেখা যাচ্ছে প্লাঙ্কের ধ্রুবকের তাৎপর্য হল যে এই ধ্রুবকটি দুটো যুগ্ম রাশির সুনিশ্চিত মান নির্ণয়ের ব্যাপারে উচ্চসীমা আরোপ করছে। যদিও এ ধরনের তত্ত্বের সাহায্যে পদার্থের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করা যায় না। এর কারণ হল 'সঠিক' কথাটির যা প্রকৃত অর্থ তা নিয়ে কখনই ব্যবহার হতে পারছে না। 'সঠিক' কথার প্রকৃত অর্থ তখনই পরিস্ফুট হবে যখন আমরা এমন একটি রাশির পরিমাপের কথা বলব যার পর্যবেক্ষণ-নিরপেক্ষ একটি নিশ্চিত মান আছে।

উপরের তত্ত্ব অনুযায়ী ইলেকট্রনকে একই সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট স্থান ও নির্দিষ্ট ভরবেগ আরোপ করা সম্পূর্ণ অর্থহীন। একটি না দেখা ইলেকট্রন একটি কণা নয়, একটি তরঙ্গক্ষেত্র যার মধ্যে কিছু কিছু সম্ভাবনা আত্মগোপন করে আছে। এই সম্ভাবনাগুলোকে যদি পরিমাপের সাহায্যে বাইরে আনা হয় তখনই তাদের আমরা ইলেকট্রনের স্থানাঙ্ক বা গতিবেগ হিসাবে চিহ্নিত করে থাকি। সুতরাং ইলেকট্রনের স্থান ও গতিবেগের কথা পর্যবেক্ষণ ব্যতিরেকে বলা চলে না। এ দুটি জিনিষ পর্যবেক্ষণের ফলেই সৃষ্ট। হাইজেনবার্গের মতে—

'বৈজ্ঞানিক গবেষণার লক্ষ্য আজ আর কেবলমাত্র পরমাণু এবং তাদের সেইসব গতিবিধি যা তত্ত্বের উপরে বা পর্যবেক্ষণের ওপর নির্ভর করে না তাদের ক্ষেত্রে আবদ্ধ নেই। বরং আমরা শুরু থেকেই দেখছি যে প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে এক দেয়া নেয়া খেলায় জড়িয়ে পড়ছি। এর ফলে বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ বিষয় ও বস্তুর মধ্যে যে প্রচলিত বিভেদ আছে তা আমাদের অসুবিধায় ফেলেছে।'

অনিশ্চয়তার সূত্রের সাপেক্ষে এর অর্থ হল এই বিভেদের সঙ্গে পদার্থবিদ্‌দের জ্ঞানের সম্পূর্ণতার কোনো সংযোগ নেই। এটা সত্য নয় যে প্রকৃতিরই এটা একটা নিয়ম, যে নিয়ম একটি কণার স্থান ও গতিবেগ নিশ্চিতভাবে জানার পথে বাধার সৃষ্টি করবে। ল্যান্‌ডে তাঁর কোয়াণ্টাম বলবিদ্যা বইতে বলেন—

'এটা খুবই অবৈজ্ঞানিক হবে যদি ধরে নেওয়া যায় যে একটি নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থান ও গতিবেগ বিশিষ্ট কণা আছে ঠিকই কিন্তু প্রকৃতির এক প্রতিহিংসাপরায়ণ খামখেয়ালীর জন্যে পরীক্ষার সাহায্যে পরিমাপ করা যাচ্ছে না।'

অনিশ্চয়তা সূত্রে অংশ গ্রহণকারী অনিশ্চয়তার পরিমাণ dp এবং dq গুলো কিন্তু q ও p তাদের প্রকৃত মান থেকে কতখানি সরে এসেছে তার পরিমাপ নয়। বরং তারা এটাই বোঝায় যে যুগপৎ d ও p পরিমাপ করলে এই রাশিগুলো dp dq পরিমাণ অংশ জুড়ে অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। সুতরাং d চিহ্নটি ত্রুটি হিসাবে ব্যাখ্যা করতে হবে। এর অর্থ হলো, পরিমাপ পদ্ধতি q, p এর সুস্পষ্ট মান উৎপন্ন করে না, বরং কিছুটা অস্পষ্টতা আরোপ করে।

অস্পষ্ট, অনিশ্চিত ইত্যাদি কথাগুলো যে অর্থে ব্যবহার করা হয় সনাতনী পদার্থবিজ্ঞানে তা উপস্থিত ছিল না। সনাতনী পদার্থবিদ্যায় কোনো ভৌত রাশির চরিত্রগত অনিশ্চয়তা ছিল না—যা ছিল সেটা জ্ঞানের স্বল্পতার জন্যে। অপর দিকে কোয়াণ্টাম পদার্থবিদ্যায় নিশ্চয়তার অভাব অপ্রতুল পর্যবেক্ষণের জন্যে নয়। এর মতে এমন কিছু রাশি আছে যাদের চরিত্রটাই এমন যে তাদের সুনিশ্চিতভাবে গণনা করা যায় না। এইখানে অনিশ্চয়তা সম্বন্ধের মূল তাৎপর্য। কোনো বস্তুর স্থান গতিবেগ ইত্যাদি ভৌতরাশিগুলি নিউটনের বলবিদ্যায় নিশ্চিত-ভাবে সংজ্ঞায়িত কিন্তু কোয়াণ্টাম পদার্থবিদ্যায় নয়। এর ফলে কোনো অবস্থায় দৃশ্যমান বস্তু জগতের অভিজ্ঞতালব্ধ বিশ্বস্ত যান্ত্রিক ধারণাগুলি পরমাণু জগতে এসে তাদের প্রকৃত অর্থ হারিয়ে ফেলে।

এই কথাটি h এর চরিত্রের সম্বন্ধে বিশেষ আলোকপাত করে। বলা যেতে পারে যে কোনো যান্ত্রিক ধারণা পরমাণুজগতের বেলায় খাটাতে গেলে তা কি পরিমাণে অনিশ্চিত হবে, h তারই সূচক। আরেক ভাবেও বলা যাবে ; যে সকল ধারণা দৃশ্যমান জগতে সত্য তাদের যদি পরমাণু জগতে লাগানো যায় তবে তখন তারা অসম্পূর্ণ হয়ে যায়। তখন এই ধারনাগুলি কীভাবে বোঝা যাবে বা ব্যবহার করা যাবে তার জন্যে নতুন তথ্যের প্রয়োজন হয়। হালকাভাবে বলতে গেলে h এই ধরনের একটি তথ্য এবং দৃশ্যমান জগৎ পরমাণু জগতের মধ্যে যে তফাৎ তার পরিমাপ।

কোয়াণ্টাম বলবিদ্যা সুনিশ্চিত পরিমাপের ব্যাপারটাকে অস্বীকার করে, এমন সব রাশিদের অস্তিত্ব কল্পনা করা ছাড়াও নিশ্চিতভাবে চিত্ররূপ খাড়া করার ব্যাপারটা পরিহার করে। উদাহরণ স্বরূপ কোয়াণ্টাম মতবাদ অনুযায়ী একটি কণার এমন অবস্থা সম্ভব যেখানে কণাটির স্থানাঙ্কের নির্দিষ্ট মান নেই এবং তার ফলে নির্দিষ্ট অবস্থিতিও নেই।

কোয়াণ্টাম তত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতারাও এ ধরনেব সিদ্ধান্ত নিয়ে অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলেন। কারণ এতে একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি কণার নির্দিষ্ট অবস্থিতির সম্পর্কে প্রচলিত ধারনাটিকে বাদ দিতে হচ্ছে। একই সময়ে এর অর্থ হবে

কোয়াণ্টাম বলবিদ্যাকে সুনিশ্চিত তত্ত্বে পরিণত করার আশা পরিত্যাগ করা। কারণ সুনিশ্চিত তত্ত্বের মূল কথা হল যে বস্তুর সকল সময়ে সুনিশ্চিতভাবে নির্দেশিত। এই শর্তটি না প্রতিপালিত হলে বর্তমান অবস্থা থেকে ভবিষ্যতকে জানার কোনো সম্ভাবনাই সেই।

এই অবস্থায় কোয়াণ্টাম বলবিদ্যা "অবস্থাকে" নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করতে বাধ্য হল। কারণ পদার্থবিজ্ঞান চিত্ররূপ কল্পনা করার ব্যাপারটা পরিহার করতে পারে। কিন্তু যার সাহায্যে বর্তমান থেকে ভবিষ্যতকে জানা যাবে সেরকম কোনো নীতিকে পরিত্যাগ করতে পারে না। সনাতনী পদার্থবিজ্ঞানের সুনিশ্চিত নির্ধারণের ব্যাপারটা যদি পুরোপুরি নাও থাকে তার অন্ততঃ ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে কিছু বলতেই হবে। দেখানো হয়েছে যে কোয়াণ্টাম বলবিদ্যার মধ্যে একটি প্যারিসাংখ্যিক নিশ্চয়তার ব্যাপার আত্মস্থ হয়ে আছে। তার ফলে কোনো বস্তুর বর্তমান অবস্থা থেকে তার ভবিষ্যতে পর্যায়গুলোর সম্ভাব্যতার সম্বন্ধে কিছু বলা যাবে। এর দ্বারা আমরা এই সিদ্ধান্তে পেঁছাতে পারি যে কোয়াণ্টাম বলবিদ্যার ভিত্তি পরিসংখ্যান তত্ত্বের উপর নির্ভরশীল।

বিভিন্ন ধরণের বল

A pie meson said to a mu
"Dont go with those hyperons. You
have a weak interaction
Feel no strong attraction
And they are strange particles too."

মৌলিক কণারা একে অপরের ওপর কি ধরণের বল প্রয়োগ করে? যখন আমরা প্রতিদিনের দেখা জিনিষের ওপর চোখ ফেরাই তখন দুধরণের বলের সন্ধান পাই। এদের মধ্যে একটি সরাসরি স্পর্শের সাহায্যে ক্রিয়া করে অপরটির প্রভাব কোন মাধ্যম ছাড়াই বহুদূর বিস্তৃত। হাত দিয়ে দরজা খোলা, মাঠের মধ্যে গড়িয়ে যাওয়া একটি বল বা টিনের পাত্রকে আঘাতকারী একটি বুলেট—এসবই একটি বস্তু কর্তৃক অপর বস্তুর ওপর প্রযুক্ত বলের উদাহরণ। অপর দিকে পৃথিবী কর্তৃক একটি আপেলকে আকর্ষণ, তড়িৎগ্রস্ত চিরুণীদ্বারা কাগজের টুকরো আকর্ষণ, একটি চুম্বক কর্তৃক আরেকটি চুম্বককে ঠেলে দেওয়া—এসবই সেই বলের উদাহরণ যেখানে দুটো বস্তুর মধ্যে কোন সংযোগ না থাকলেও বহুদূর পর্যন্ত বল অনুভূত হচ্ছে।

মাধ্যাকর্ষণ জনিত বল

যে কোন দুটি বস্তুর মধ্যে মাধ্যাকর্ষণজনিত বল আকর্ষণীয়। এই বল বস্তু দুটির ভরের গুণফলের সমানুপাতিক ও তাদের মধ্যেকার দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক।

$$\text{অর্থাৎ } F=G\frac{m_1 m_2}{r^2},$$

G একটি বিশ্বজনীন ধ্রুবক। আমরা আশা করতে পারি যে বড় বস্তুদের মতই মৌলিক কণারাও পরস্পরের মধ্যে মাধ্যাকর্ষণ জনিত বল সৃষ্টি করবে। G-এর মান ব্যবহার করে হিলিয়ামে কেন্দ্রীনে দুটি প্রোটনের মধ্যে যা দূরত্ব সেই পরিমান দূরত্বে দুটি প্রোটনের মধ্যে মাধ্যাকর্ষণ জনিত বল কত তা নির্ণয় করতে পারি। এই দূরত্ব হলো $১০^{-১৫}$ মিটার। হিসাবে দাঁড়াচ্ছে দুটি প্রোটনের মধ্যে মাধ্যাকর্ষণ বলের পরিমাণ $১০^{-৩৪}$ নিউটন। এই মান কিন্তু খুবই কম।

তড়িৎ চুম্বকীয় বল

দুটি তড়িতাধানের মধ্যে তড়িৎচুম্বকীয় বল মাধ্যাকর্ষণজনিত বলেরই অনুরূপ। অবশ্য বেশ কিছু দিক দিয়ে তাদের মধ্যে পার্থক্যও আছে। দুটি তড়িতা-ধানের মধ্যেকার আকর্ষক বা বিকর্ষক বল তড়িতাধানের গুণফলের সমানুপাতিকও দূরত্বেরব র্গের ব্যস্তানুপাতিক। স্থির তড়িৎ বিজ্ঞানে এটি কুলম্বের সূত্র হিসাবে পরিচিত। কুলম্বের সূত্রে তড়িতাধানের যা ভূমিকা মাধ্যাকর্ষণের বেলায় ভরের স্থান ঠিক তাই। তড়িতাধান তড়িৎ বলের মান নির্ধারণ করলেও ত্বরণের বিরোধিতা করে না।

তড়িত ও মাধ্যাকর্ষণ বলের মধ্যে কিছু চমকপ্রদ তফাৎ আছে। তড়িতাধানের মান ধনাত্মক, ঋণাত্মক হতে পারে বা তড়িৎশূন্যও হতে পারে। তড়িৎ বলের ক্রিয়ায় দুটি কণা পরস্পরকে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ করতে পারে। মাধ্যাকর্ষণের ক্ষেত্রে সকল কণারা পরস্পরকে কেবল আকর্ষণই করে। একটি চলমান তড়িতা-ধান অপর একটি চলমান তড়িতাধানের সঙ্গে চুম্বক ক্ষেত্রের মাধ্যমে ক্রিয়া করে। দুটি তড়িতাধানের মধ্যে চৌম্বক বল তাদের মধ্যেকার তড়িৎবলের চেয়ে খুব একটা ভিন্ন নয়। যেটুকু তফাৎ চোখে পড়ছে তা হলো পর্যবেক্ষক সাপেক্ষে তড়িতাধানের গতির জন্য স্থির তড়িৎ জনিত বলের আপাত পরিবর্তন মাত্র। একটি পূর্ণাঙ্গ তত্ত্বে তড়িৎ ও চুম্বক ক্রিয়াকে একটি মূল নিয়মের অংশ হিসাবে দেখানো উচিত তা পর্যবেক্ষক সাপেক্ষে যে ভাবেই পরিবর্তিত হোক না কেন। যুগ্মভাবে এদের বলা যাবে তড়িৎচুম্বকীয় বল। পরমাণুর মধ্যে যে বল ইলেকট্রন

ও কেন্দ্রীনকে বেঁধে রেখেছে তাকে আমরা Electro magnatic বা তড়িৎ-চুম্বকীয় বল বলব। বস্তুতঃ পরমাণুস্থিত ইলেকট্রনদের গতিবেগ কম। এই জন্য পরমানুস্থিত বলকে আমরা মোটামুটি ভাবে স্থির তড়িৎ বল হিসাবে চিন্তা করতে পারি। ইলেকট্রনদের নিজেদের মধ্যে বা ইলেকট্রন কেন্দ্রীনের মধ্যে তড়িৎচুম্বকীয় বলের এই বিচিত্র লীলা খেলা পারমাণবিক বর্ণালীর চরিত্র নির্ধারণ করে। ইলেকট্রনও কেন্দ্রীণের মধ্যে মাধ্যাকর্ষণ জনিত বল তড়িৎ বলের চেয়ে ১০৩৬ গুণ ছোট। এইজন্য পরমাণু বা কেন্দ্রীনের গঠণে মাধ্যাকর্ষণে কোন অবদান নেই।

কোয়াণ্টাম ক্ষেত্র তত্ত্বে (Quantum field theory) প্রত্যেক ধরণের বলের জন্য বিশেষ বাহকের কথা ভাবা হয়েছে। তড়িৎচুম্বকীয় ক্ষেত্রের বেলাতে এই বাহকটি হলো ফোটন। একটি প্রোটন একটি ফোটন ছাড়বে আরেকটি প্রোটন ফোটনটি গ্রহণ করবে। এরই ফলে দুটি প্রোটনের মধ্যে তড়িৎচুম্বকীয় বলের সৃষ্টি হবে। এধরণের ফোটনকে অবশ্য আমরা অসদ্ (virtual) ফোটন বলি।

শক্তিশালী কেন্দ্রীন পরিক্রিয়া (strong interaction)

পদার্থবিদেরা জানতেন যে কেন্দ্রীনে প্রোটন ও নিউট্রন আছে। এ জানার পরেও একটা সমস্যা রয়ে গেল। তড়িৎচুম্বকত্ব থেকে আমরা জানি যে দুটি ধনাত্মক তড়িতাধান পরস্পরকে বিকর্ষণ করবে। সুতরাং কেন্দ্রীণের মধ্যে সুস্থিত অবস্থায় অনেকগুলি প্রোটন নিউট্রন থাকছে কি করে। শেষ পর্যন্ত বোঝা গেল যে দুটি প্রোটন বা প্রোটন নিউট্রন খুব কাছাকাছি এলে তাদের মধ্যে শক্তিশালী আকর্ষক বলের সৃষ্টি হয়। একেই বলা হয় কেন্দ্রীন বল। তড়িৎচুম্বকীয় বলের চেয়ে কেন্দ্রীন বল প্রায় একশগুণ বেশী শক্তিশালী। ১০$^{-১৩}$ সেণ্টিমিটার দৈর্ঘ্যের মধ্যে এই আকর্ষক বল ক্রিয়া করে।

পাই মেসন বা পায়ন হলো কেন্দ্রীন বলের বাহক। দুটি কণার মধ্যে পাই মেসন আদান প্রদান করেই তাদের মধ্যে আকর্ষক বলের উদ্ভব হয়।

দুর্বল পরিক্রিয়া (Weak interaction)

তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কারের পর বিটাক্ষরণ (β-decay) বিস্তৃত বিশ্লেষণের দ্বারা সর্বপ্রথম দুর্বল পরিক্রিয়ার অস্তিত্ব জানা যায়। দুর্বল পরিক্রিয়া মৌলিক কণাদের জন্যেই দৃষ্ট হয় এবং এই কণারা সবই লেপটন গোষ্ঠিভুক্ত। দুর্বল বিক্রিয়ার বাহক হচ্ছে ভারী কণা যাবা বোস-সংখ্যায়ন মেনে চলে।

বর্তমানে তড়িৎচুম্বকীয় বল ও দুর্ব্বল পরিক্রিয়াকে এক কাঠামোয় বেঁধে ফেলার চেষ্টা করেই বিজ্ঞানী সালাম নোবেল পুরস্কার পান।

অবস্তুতান্ত্রিক ভৌতজগৎ 5

"Nothing tends so much to the corruption if science as to suffer it to stagnate ; these waters must be thoubled before they can exert their virtues"—Burke

পরমাণু এবং বস্তুর ধারণা

ডেমোক্রিটাস পরমাণুদের অতিসূক্ষ্ম কণা হিসাবে চিন্তা করেছিলেন। আজকের দিনে এই সূক্ষ্মকণাদেরই বলা হয় মৌলিক কণা। মৌলিক কণারা পর্যবেক্ষণে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে জড়বাদী চিন্তাবিদ্দের এটা একটা দৃঢ় প্রত্যয় ছিল। তাঁদের এই বিশ্বাস বিশ্বজনীন দর্শন হিসাবে পরিগণিত হয়েছিল। প্রথম দিকে একটি প্রয়োজনীয় ভিত্তি হিসাবে পদার্থবিজ্ঞানও এই বিশ্বাসকেই অবলম্বন করেছিল। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে, আরেক ধরণের ভৌতরাশি, বলের ক্ষেত্র, কণাদের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করে। ক্ষেত্র সম্বন্ধে এই নতুন আবিষ্কার কিন্তু স্থানকালে কণাদেহ সহজাত অস্তিত্বকে বিলুপ্ত করে দেয় না ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে কণারা যেভাবে ধরা দেয় তাই তাদের আসল রূপ একথারও কোনো হেরফের ঘটায় না।

অপর পক্ষে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার ক্রমোন্নতি বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারায় এক বিরাট ও সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন আনল। বিশেষতঃ দুটো ক্ষেত্রে পদার্থবিদ্যা পরমাণু সম্বন্ধে পুরাতন ধারণা বাতিল করে আরও জটিলভাবে চিন্তা করতে বাধ্য হল। প্রথম ক্ষেত্রটি হল বস্তুর দ্বৈত চরিত্রের স্বীকৃতি। মৌলিক কণাদের রূপ কোনোদিনই পরিবর্তিত হতে পারবে না এরকম ধারণা নাকচ হয়ে গেল। এটাই সাব্যস্ত হল পরীক্ষার শ্রেণী-বিভাগের ওপর নির্ভর করে তারা কখনও বা কণা-চরিত্র কখনও বা তরঙ্গ-চরিত্র দর্শাবে।

দ্বিতীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হল তখন যখন দেখা গেল যে পদার্থের যে সকল ধর্ম সহজাত বলে এতদিন ভাবা হচ্ছিল তারা আসলে সহজাত নয়। অনেক ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির সঙ্গে প্রতিক্রিয়াতে সে সকল ধর্মের উৎপত্তি। এ ধরনের

পরিস্থিতি পদার্থবিজ্ঞানে বাস্তববাদের অবনতি ঘটাল। পর্যবেক্ষণ সকল সময়ই একটি ভৌত পদ্ধতি। একটি কণার স্থানাংক নির্ণয়ের সময় যা চিন্তা করা হয়, তা নিছক কণা নয়। এই পদ্ধতি আগে যে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে তাদের কথাই ভাবা হয়। বলা যেতে পারে যে পরমাণুর প্রতীয়মান কোনো অবস্থার জন্য পর্যবেক্ষকই দায়ী। এ ধরনের ভাবনা চিন্তা সনাতনী পদার্থবিজ্ঞানে সম্পূর্ণ অপরিচিত। সনাতনী পদার্থবিদ্যা পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিজনিত যে কোনো প্রতিক্রিয়া এড়িয়ে যেতে পারে তার কারণ হল দৃশ্যমান বস্তু সকলের ক্ষেত্রে এ ধরনের প্রতিক্রিয়া খুবই সামান্য। অপরদিকে একটি মৌলিক কণা অনেকবেশি স্পর্শকাতর। সে কারণে পর্যবেক্ষণজনিত প্রতিক্রিয়ার তীব্রতা এক্ষেত্রে কোনোমতেই অবহেলা করা যাবে না।

সুতরাং কণাদের আমরা যে ভাবে দেখছি সেটাই তাদের সব পরিচয় নয়। ফলে সনাতনী দর্শনের একটি প্রয়োজনীয় ধারণা নিজস্ব সত্তা সেটা আর কণাদের বেলায় প্রযোজ্য হচ্ছে না। যে ধারনা সকল অভিজ্ঞতার মূলে, যাকে সনাতনী পদার্থবিদ্যা কখনই সমালোচনা করার সাহস পায়নি সেই ধারণাকেই কোয়াণ্টাম পদার্থবিদ্যা একেবারে ত্যাগ করল। বস্তু কোনো জিনিসের এমন একটি গুণ যা জিনিসটির নিজস্বতা প্রদান করে এবং তাতে এক ধরণের স্থায়িত্ব আরোপ করে। কাণ্টের মতে বস্তু হল এমন একটি ধর্ম যা সকল-কিছুর মধ্যেই থাকে ও যার মান সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাড়া-কমা করে না। যেহেতু কাণ্ট পরিমাণের কথা বলেছিলেন সেহেতু বস্তুকে নিশ্চয় পরিমাপযোগ্য বলে ভেবেছিলেন।

অবশ্য সত্যি যে প্রত্যেক বস্তুরই এমন কি কণাদের পর্যন্ত একটা পরিমাপ-যোগ্য এবং অপরিবর্তনীয় ধর্ম আছে এবং সেটা হল তাদের স্থিতিভর। এটা কিন্তু কণাদের পরিচয় বজায় রাখার ব্যাপারে সাহায্য করে না। মৌলিক কণারা পরস্পরকে যুগ্মভাবে বিধ্বংস (Pair annihilation) করে ফেলতে পারে। এ সকল ঘটনায় দুটো কণা আলোক রশ্মিতে পরিণত হয়ে যায়। স্থিতিভর এক্ষেত্রে সমপরিমাণ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায় ঠিকই কিন্তু তখন একে আর বস্তু হিসাবে চিন্তা করা যাবে না। যদিও বা এই আলোকশক্তি পুনরায় কণাদ্বয়ে রূপান্তরিত হয়ে যেতে পারে, তবুও তাদেরকে আর যে কণাদ্বয় অদৃশ্য হয়েছিল তাদের সঙ্গে সনাক্ত করা যাবে না। এর থেকে এটাই সিদ্ধান্ত করতে হবে যে মৌলিক কণাদের মধ্যে এমন কিছু নেই যাকে কাণ্টের ভাবধারার সঙ্গে সংগতি রেখে বস্তু হিসাবে ভাবা যাবে।

পাউলি প্রকল্প

বিশেষ ধরনের পরিসংখ্যানের জন্যে কোনো কোনো কণাদের বেলায় বস্তু সত্তা একেবারে বাতিল হয়ে যায়। ১৯২৪ সালে পাউলি এই ধরনের কণাদের সম্বন্ধে একটি সাধারণ প্রকল্প তৈরি করেন। এই প্রকল্প অনুযায়ী দুটি এক ধরনের কণা কখনই এমন অবস্থাতে থাকতে পারবে না যে অবস্থায় তাদের সংশ্লিষ্ট সকল কোয়ান্টাম পূর্ণসংখ্যাগুলি এক হবে।

পরমাণুর মধ্যে যে ইলেকট্রন সমষ্টি আছে তারা পাউলি প্রকল্প অনুযায়ী সাজানো। মৌলিক পদার্থগুলির পর্যায় ক্রমিক শ্রেণীবিভাগের ছককে পর্যায় সারণী বলে। এই সারণীতে মৌলিক পদার্থদের ক্রমবর্ধমান পারমাণবিক সংখ্যা অনুসারে সাজানোর ব্যাপারে পাউলি প্রকল্প খুবই সার্থক ভূমিকা নিয়েছে। ইলেকট্রনের কক্ষপথের পরিভাষায় এই প্রকল্প অনুযায়ী একটি কক্ষপথে দুই বা ততোধিক ইলেকট্রন থাকতে পারে না।

আগেই বলা হয়েছে যে বিভিন্ন সুস্থিত কক্ষের শক্তি বিভিন্ন। এই কক্ষগুলিকে ইলেকট্রনসেলও (Shell) বলা হয়। কতকগুলি প্রতীক চিহ্ন দ্বারা এগুলিকে চিহ্নিত করা হয়। পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণায় জানা গেছে একটি সেল আসলে কয়েকটি উপসেলের (Subshell) সমষ্টি। বহুতল বাড়ীর বিভিন্ন তলের সঙ্গে যদি ইলেকট্রনের সেলের তুলনা করা যায় তবে তার একটি তলে অবস্থিত ঘরগুলির সঙ্গে উপসেলের তুলনা করা যেতে পারে। কোনো একটি সেলে নির্দিষ্টমানের সর্বোচ্চ ইলেকট্রন সংখ্যা থাকতে পারে এবং সংখ্যাটি নির্ধারিত হবে পাউলি প্রকল্পের সাহায্যে। এই সর্বোচ্চ সংখ্যার কম ইলেকট্রন কোনো একটি সেলে থাকতে পারে কিন্তু এর বেশি ইলেকট্রন থাকতে পারে না। কিভাবে এই সেলগুলি পূর্ণ হচ্ছে তারই ওপরে নির্ভর করবে পর্যায় সারণীতে অন্তর্ভুক্ত সকল মৌলিক পদার্থের রাসায়নিক চরিত্র।

পাউলি প্রকল্পের যে অসীম ক্ষমতা উপরের উদাহরণটি তারই একটি নজির মাত্র। আজ পাউলি প্রকল্প পরমাণুতত্ত্বে একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রয়োগের সকল ক্ষেত্রেই এই প্রকল্পের সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে আর সেইজন্যে এর নির্ভুলতা সম্বন্ধে কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কোনো বস্তুর প্রতিটি কণা তাদের পারস্পরিক ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে কোনো এক অতিপ্রাকৃত উপায়ে ওয়াকিবহাল আছে। কেন না, কোন অবস্থাতে তারা যেতে পারবে না সেটা তারা জানতে পারছে।

স্পষ্টতই এর জন্য একটি কণাকে অন্য সকলের ওপর স্বাভাবিক ভাবে প্রভাব

বিস্তার করতে হচ্ছে। তার ফলেই কণাটি এমন একটি গতি প্রকৃতি অবলম্বন করতে পারছে না যে গতি প্রকৃতি অপর একটি কণা পূর্বেই অবলম্বন করে আছে। কিন্তু প্রশ্ন হল এই প্রভাব বিস্তারের ব্যাপারটা ঘটেছে কিভাবে ?

ধরা যাক, ইলেকট্রন গুচ্ছ একটি ঘর পুরোপুরি অধিকার করে আছে। একটি কোণে কোনো একটি ইলেকট্রনের একটি বিশেষ ধরনের গতি আছে। পাউলি প্রকল্প অনুযায়ী অনুরূপ গতিপ্রকৃতি নিয়ে অপর কোণে আরেকটি ইলেকট্রন থাকতে পারে না। এর তাৎপর্য হল ইলেকট্রনদ্বয় নিজেদের থেকে অনেক দূরে থাকলেও পরস্পরের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হচ্ছে। তা না হলে কেমন করে গতিপ্রকৃতির বিভিন্নতা সৃষ্টি হবে। কিন্তু এই যে প্রভাব বিস্তারের ব্যাপারটি সংঘটিত হচ্ছে সেটা যে কিভাবে কার্যকরী হচ্ছে তা বোঝার সম্ভাব্য কোনো উপায় নেই।

এরই সঙ্গে এমন সব ঘটনা নজরে পড়ছে যা থেকে মনে হতে পারে, ইলেকট্রন, সাধারণভাবে যাদের আমরা বস্তু বলি, সেরকমটি নয়। এরা এক অদ্ভুত ধরনের জিনিস। এদের প্রকৃত চরিত্র কখনই বোঝা যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত যা সেই বিশেষ ধর্মটি যার দ্বারা দুটি ইলেকট্রনের অভিন্ন গতিবিধি অসম্ভব হয়ে যাচ্ছে তাকে খুঁজে পাওয়া যায়। সুতরাং অবশ্যম্ভাবী প্রশ্ন হল, মৌলিক কণা কি এবং বিশেষ করে ইলেকট্রন কী ?

অজড়বস্তু হিসাবে ইলেকট্রন

উপরের প্রশ্নটির উত্তর পাবার আশায় এটা আবার জোর দিয়ে বলা যেতে পারে যে মৌলিক কণাদের ক্ষুদ্র বস্তুখণ্ডের সত্তা আরোপ করা বৈধ হবে না। তাদের সম্বন্ধে যে ধরণের আকৃতির কথা আমরা ভাবি আপাতদৃষ্টিতে তা প্রকৃত মনে হয় শুধুমাত্র এই কারণে যে দৃশ্যমান জগৎ সম্বন্ধে চিত্রখাড়া করার প্রবণতাকে চিন্তাভাবনা না করেই পরমাণু জগতে ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা করি। ভৌত ধারণা তখনই অর্থবহ হয় যখন তাদের পরিমাপের পথটি সুনির্দিষ্ট থাকে। যেহেতু পরিমাপের পথটি দৃশ্যমান জগৎ ও পরমাণুজগতের বেলায় ভিন্ন সেইহেতু এটা সব সময় মনে রাখতে হবে সনাতনী পদার্থবিদ্যা থেকে নেওয়া কোনো একটি ধারনা মৌলিক কণাদের ক্ষেত্রে অব্যবহার্য হয়ে যেতে পারে কারণ যে পরিমাপ পদ্ধতির উপর ধারণাটি নির্ভর করে আছে সে ধরনের পরিমাপ পদ্ধতি কণাদের বেলায় খাটানো যায় না।

বস্তুসত্তা ইলেকট্রনের মধ্যে আরোপ করা যায় কি না বার করার জন্য এদের সম্বন্ধে যে যে রাশি জানা আছে তাদের থেকে শুরু করা দরকার। এটা বোঝা

দরকার ইলেকট্রন এমন একটি জিনিস যকে সোজাসুজি দেখা যায় না এবং যার ধারনা নিতান্তই তত্ত্ব উদ্ভুত। কতকগুলি চাক্ষুষ ঘটনাকে এই বলে ব্যাখ্যা করা যায় যে ঘটনাগুলির মূলে রয়েছে কতকগুলি নির্দিষ্ট স্থিতিভরযুক্ত ও নির্দিষ্ট তড়িতাধানযুক্ত কণাদের উপস্থিতি। এই অনুমানের উপর ভিত্তি করে পদার্থবিদেরা নানা রকমের পরীক্ষা নিরীক্ষার কথা ভেবেছিলেন যাদের সাহায্যে এই কণাদের ভর ও তড়িতাধান পরিমাপ করা যেতে পারে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা থেকে একই ফল পাওয়ার জন্যে ঐ দুটি রাশির সুনির্দিষ্ট মান খাড়া করা গেছে।

পরীক্ষা দ্বারা ইলেকট্রনের অন্যান্য ধর্মও নির্ণয় করা যেতে পারে। সুবিধা-মতো উদ্ভাবিত পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে কণাটিকে বস্তুর সঙ্গে বিক্রিয়া করানো যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ এরা ফটোগ্রাফিক প্লেটকে কালো করে দিতে পারে কিংবা ক্লাউড চেম্বারে যাত্রাপথের চিহ্ন সৃষ্টি করতে পারে। এইভাবে ইলেকট্রনের তাৎ-ক্ষণিক অবস্থিতি নির্ণয় করা যায়।

আগেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে এমন একটি চলরাশি Ψ আছে যা স্থানাঙ্ক x, y, z এর উপর নির্ভর করে। এই Ψ সাহায্যে একটি স্থানে ইলেকট্রনটিকে পাওয়া যাবার সম্ভব্যতা কত তা নির্ণয় করা যাবে। এই Ψ একটি ডিফারেন্সিয়াল সমীকরণ মেনে চলে যে সমীকরণের মধ্যে ইলেকট্রনের ভর এবং তড়িতাধান উপস্থিত থাকে। এর ফলে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে পরিমাপের সাহায্যে ইলেকট্রনের যে যে রাশিগুলি নির্ণয় করা যাবে তাদের সবই Ψ (x, y, z) এর মধ্যে পাওয়া যাবে। ডিরাক আপেক্ষিকতাবাদকে জড়িয়ে Ψ এর একটি সমীকরণ বার করেন যা ডিরাক সমীকরণ নামে পরিচিত। একটি বস্তুর সকল ধর্মের সমগ্রতা এর মধ্যে পাওয়া যায়। একটি গতিপ্রকৃতিসম্পন্ন ইলেকট্রনের একটি আকৃতি আছে যার প্রতিনিধিত্ব করছে Ψ (x, y, z)। এখন প্রশ্ন উঠবে যে এই সমীকরণই কী সব? না কী অদৃষ্ট কোনো পরিবহণ আছে যা Ψ কর্তৃক বর্ণিত সকল ধর্ম বহন করছে। পরের কথাটিই যদি সত্যি হয় তাহলে ইলেকট্রনকে আবার একটি জড়বস্তু হিসাবে ভাবতে হবে এবং সেই অদৃশ্য মাধ্যমেই হবে বস্তুসত্তা। অপর পক্ষে প্রথমটি যদি সত্যি হয়, তবে ইলেকট্রনকে বস্তুহীন মনে করতে হবে।

দুটো সম্ভবনার কোন্‌টা ঠিক তা স্থির করা যাবে পাউলি প্রকল্পের সাহায্যে। যদি ইলেকট্রনের বস্তুসত্তা থাকে তবে পরমাণু একটি নির্দিষ্ট অবস্থায় যে কোনো সংখ্যার ইলেকট্রন রাখতে পারে। তারা একই Ψ দ্বারা বর্ণিত হবে। অপরপক্ষে কণাদের যদি বস্তুসত্তা আরোপ না করা হয় তবে দুই বা ততোধিক ইলেকট্রন একই অবস্থায় থাকতে পারবে না। কারণ এক বা দুই গণনা করতে গেলে এমন একটি কিছু থাকা দরকার যার দ্বারা ইলেকট্রনগুলিকে আলাদা করা যেতে পারে। কিন্তু

এ ধরনের ধর্ম কোনো বস্তুসত্তা না থাকলে পাওয়া যাবে না এবং এক্ষেত্রে একই অবস্থায় বহু ইলেকট্রনের উপস্থিতি সপ্রমাণ করা যাবে না। সুতরাং একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট অবস্থায় একটির বেশি ইলেকট্রন থাকতে পারে না, যেমন করে কোনো লোকের একই সময়ে দুরকম স্বাস্থ্যের অবস্থা থাকতে পারে না।

সুতরাং দেখা গেল, পাউলি প্রকল্প এইটাই দাবি করে যে ইলেকট্রনের কোনো বস্তুসত্তা নেই। কয়েকটি ধর্মেই ইলেকট্রনের প্রকৃত পরিচয় নিহিত। এর বেশি তার কোনো পরিচয় নেই। এর ভেতরে কোনো অভঙ্গুর অংশ নেই যার সাহায্যে এদের পরিচয় বজায় থাকতে পারে এবং যার সঙ্গে সব ধর্ম সংযুক্ত। সুতরাং পদার্থবিদ্ যখনই কোনো ইলেকট্রনের সম্মুখীন হবেন তার পক্ষে এটা অনুমান করা ঠিক হবে না যে এর আগেও ইলেকট্রনটির সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়েছে।

মৌলিক কণাদের জড়বাদের আওতা থেকে বার করার ব্যাপারটা বর্তমান যুগের পদার্থবিজ্ঞানের সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য। এর লক্ষ্য হল বিশ্বজগতের রূপ বর্ণনায় জড়বস্তুকে সরিয়ে তার জায়গায় নানা রূপের বৈচিত্র্য ও প্রাণবন্ত লীলাকেই প্রাধান্য দেওয়া। ভর ও শক্তিকে সমতল প্রমাণ করে আপেক্ষিকতাবাদ এ ব্যাপারে প্রথম পদক্ষেপ করেছে। সত্যি কথা বলতে এতে বস্তুসত্তা সম্পর্কিত ধারণা পুরোপুরি বিসর্জিত হয়নি কেন না ভরের শক্তিতে রূপান্তরিত হওয়ার ব্যাপারটা এই সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেয় না যে শক্তি তার বহনকারী হিসাবে বস্তুসত্তার উপস্থিতি দাবি করতে পারে।

ইলেকট্রন যুগ্মের সৃষ্টি ও বিনষ্টির ব্যাপারটা ইলেকট্রনের বস্তুসত্তার সঙ্গে খাপ খাওয়ানো খুবই কষ্টকর। দুটি কণা যদি মিলিত হয়ে বিকিরণে রূপান্তরিত হয়ে যায় তাহলে কোন জিনিসকে অপরিবর্তনীয় বস্তুসত্তা হিসাবে পড়ে আছে বলে ধরা যাবে? আরেকটি ঘটনা যা ইলেকট্রনের বস্তুসত্তাকে অপ্রমান করে। এটি হলো রেডিওঅ্যাক্টিভ কেন্দ্র থেকে ইলেকট্রনের বহিষ্কার। পরীক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতা এই কথাই বলে যে ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসে কণা হিসাবে থাকতে পারে না এবং কেবলমাত্র বহিষ্কারের সময়ই সৃষ্টি হয় যেমনভাবে পরমাণু থেকে ফোটনের সৃষ্টি হয়।

বস্তুর মধ্যেকার মৌলিক কণাদের জড়বাদের আওতা থেকে বাইরে আনায় পদার্থবিজ্ঞানে ভবিষ্যৎ উন্নতির ক্ষেত্রে প্রভূত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে। স্পষ্টতই যে পদার্থবিজ্ঞান বস্তুতে বিশ্বাস করে না, আঙ্গিকে বিশ্বাস করে তাকে জড়বাদী চিন্তাধারার সঙ্গে একেবারেই খাপ খাওয়ানো যাবে না। আজ এটা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে বৈজ্ঞানিক দর্শনের পরিবর্তনের জন্যে জড়বাদী চিন্তাধারা এক কষ্টকর অবস্থার মুখোমুখি হয়েছে।

ভৌত-বিশ্ব ও জ্ঞানের সীমারেখা ৬

"Human science is an uncertain guess"—Prior.

আবিষ্কারের সীমারেখা

পদার্থবিজ্ঞানে নিত্য নতুন কিছু আবিষ্কারের সংখ্যাধিক্য মানবজীবনে উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিণতিতে পদার্থবিজ্ঞান একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল। ফিসন বোমা একটি শহরকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করতে পারে। এটা কেবল শুরুমাত্র। কয়েক বছরের পর আবিষ্কৃত হল হাইড্রোজেন বোমা যা ধ্বংসের তীব্রতায় অনেক বেশি শক্তিশালী। হাইড্রোজেন বোমাকে আবার অতিক্রম করে গেছে কোবাল্ট বোমা। কোবাল্ট বোমার রেডিও-অ্যাক্টিভ বিকিরণে মানুষের জীবনকে নষ্ট করে দিতে পারে বিষ্ফোরণের অনেকদিন পর পর্যন্ত। এমন নিউট্রন বোমার কথা ভাবা হচ্ছে যার সাহায্যে মানুষ মারা যাবে ঘর বাড়ী নষ্ট না করে। অনেকের কাছেই ভবিষ্যৎ খুব ভীতিজনক মনে হচ্ছে। মনে প্রশ্ন জাগছে যে পদর্থবিদ্যা ও তার এই দানবীয় আবিষ্কারের কি কোন শেষ নেই ?

এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে পদার্থবিজ্ঞানের 'সীমা' কথাটির অর্থ সুস্পষ্ট হওয়ার দরকার। পদার্থবিজ্ঞানের সীমা বলতে যে এর চিন্তা করার সীমা বোঝাতে পারে তা নয়, এর আবিষ্কার করার ক্ষমতার সীমা বোঝাতে পারে। এর অর্থ হল, এটা মেনে নেওয়া যে বোঝা এবং আবিষ্কার করা দুটোর এক অর্থ নয়। বিশুদ্ধ জ্ঞান আর যান্ত্রিক প্রয়োগ বিধির মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই। তারা পরস্পর নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ জ্ঞানের কোনো ভালমন্দ নেই। সে কেবল বৈজ্ঞানিক কৌতূহল মেটায়। এই বৈজ্ঞানিক কৌতূহলই সকল জ্ঞানের অগ্রগতির মূলকথা।

বিজ্ঞানীরা যে কষ্ট করে পরীক্ষা করেন, ক্লান্তিকর গণনা কার্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখেন সে শুধু অজানাকে খুঁজে বের করার জন্যে। তাঁর লক্ষ্যে যদি তিনি পৌঁছাতে পারেন তবে তিনি ধরে নেবেন তাঁর সমস্যার সমাধান হয়েছে। এই লব্ধ জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ তাঁকে ততটা উদ্দীপিত করে না এবং ব্যাপারটা তিনি যন্ত্রবিদের কাছে ছেড়ে দেন।

বিখ্যাত বৃটিশ পদার্থবিদ স্যার থম্পসন বলেন—

"আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি বিজ্ঞানীদের বেশির ভাগ অংশ নতুন ওষুধ বা টেলিভিসন যুদ্ধাস্ত্র বানাতে ইচ্ছুক নন। যদিও এসবই প্রয়োজনীয় তবুও তাঁদের মূল লক্ষ্য মানুষের জ্ঞানের সীমা বাড়ানো। সব আবিষ্কারই কতকগুলো তথ্যের উপর নির্ভরশীল। এই সব তথ্যের পুরোপুরি সদ্ব্যবহারের উপরেই দাঁড়িয়ে আছে আবিষ্কারের সাফল্যের চাবিকাঠি। যেই মুহূর্তে এই সব তথ্য প্রযুক্ত হয় তখনই তারা তাদের নিরপেক্ষ চরিত্রটা হারিয়ে ফেলে। তথ্যটিকে কাজে লাগিয়ে ধ্বংসাত্মক বা গঠনমূলক জিনিস আবিষ্কৃত হল কিনা তার ওপর নির্ভর করবে তথ্যটি ভাল কি মন্দ। উদাহরণ স্বরূপ এটম বোমার কথা ধরা যেতে পারে। হ্যান আবিষ্কার করেছিলেন যে ইউরেনিয়াম পরমাণু নিউট্রন দিয়ে আঘাত করলে সে দুটো ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় এবং সেই দু-টুক্রো অসম্ভব শক্তি নিয়ে ছড়িয়ে পড়ে। হ্যানের এই আবিষ্কারের ওপরেই দাঁড়িয়ে আছে এটম বোমার সৃষ্টি রহস্য। ইউরেনিয়াম নিউক্লিয়াস দুটুকরো হয়ে ভেঙ্গে যাবার সময় অতিরিক্ত নিউট্রন বার করে দেয় এবং সেই নিউট্রন ইউরেনিয়াম নিউক্লিয়াসের ভাঙ্গা অংশগুলি আবার খণ্ডিত করে। এই ধরণের খণ্ডন ক্রিয়ায় সৃষ্টি হয় শৃঙ্খল প্রতিক্রিয়া বা চেইন রিয়াকসন। হ্যানের আবিষ্কারের মধ্যে কিন্তু ভয় পাবার মত কিছু নেই।"

এইবার শুরু হল যন্ত্রবিদের ভূমিকা। তাঁরা ভাবতে শুরু করলেন কিভাবে এই তথ্যকে কাজে লাগানো যেতে পারে। এই ভাবনা চিন্তার ফলশ্রুতি হল পরমাণু বোমা, যা যে কোনো রাসায়নিক বোমার চেয়ে হাজারগুণ শক্তিশালী। অনেকদিন বাদে যন্ত্রবিদেরা ভাবতে শুরু করলেন নিউক্লিয়াসের মধ্যে বিরাজমান এই যে বিরাট শক্তিসম্ভার তাকে কিভাবে শান্তিপূর্ণভাবে ব্যবহার করা যায়। শান্তিপূর্ণভাবে করার চেয়ে পরমাণুর মধ্যেকার শক্তিকে যুদ্ধাস্ত্র বানাবার কাজই মানুষকে বেশি আকৃষ্ট করেছিল। এর ফলে এই মরণাস্ত্র প্রতিহত করার জন্যে তাকে নতুন নতুন সম্ভাবনার কথা ভাবতে হয়েছে। এই প্রশ্ন স্বাভাবিক যে আনবিক যুদ্ধাস্ত্রের কি কোনো শেষ নেই—আরও মারাত্মক যুদ্ধাস্ত্র কী ভবিষ্যতে হতে পারে?

দুর্ভাগ্যবশত্য এই প্রশ্নের উত্তর হল : না, কোনো সীমনো নেই। যে কোনো আবিষ্কারের ফলই নীতিগত ভাবে আরও ভাল হবার অপেক্ষা রাখে। এর কারণ হল প্রতিনিয়তই ব্যবহারিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে নিত্য নতুন সংযুক্তি হচ্ছে। এই বিস্তৃত জ্ঞানের সাহায্য নিয়ে এমন পদ্ধতি সৃষ্টি করা যেতে পারে যা মূল আবিষ্কারের চেয়েও আরও ফলপ্রসূ হবে। এর কারণ হল নতুন জ্ঞানের সংযোজন পদ্ধতির কার্যকারিতা বাড়িয়ে দেয়।

হাইড্রোজেন বোমা পরমাণু বোমার চেয়ে অনেক বেশি কার্যকরী। এর কারণ হল ইউরেনিয়াম নিউক্লিয়াসের বিভাজন প্রক্রিয়া ছাড়াও এখানে আরেকটি তথ্যের ব্যবহার করা হয়। এই তথ্যটি হল অধিক উষ্ণতায় হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস সংযুক্ত হয়ে হিলিয়াম নিউক্লিয়াস তৈরী করে এবং এর ফলে প্রচণ্ড শক্তি নির্গত হয়। বোমার কার্য প্রণালী সুরু হয় ইউরেনিয়াম নিউক্লিয়াসের বিভাজন দিয়ে। এতে যে তাপের উদ্ভব হয় তাতে সংলগ্ন হাইড্রোজেনের স্তর হিলিয়ামে পরিণত হয়ে যায়।

এইভাবে হাইড্রোজেন বোমা দুইটি তথ্যকে একত্রিত করে কার্যকারিতা অনেক বেশি বাড়িয়ে দেয়। এটা নিশ্চয় সম্ভব হতে পারে যে ভবিষ্যতে হাইড্রোজেন বোমা আরও সক্রিয় হবে। পরমাণুর নিউক্লিয়াস সম্বন্ধে যতই নতুন নতুন তথ্য জানা যাবে, ততই তাদের বোমার কার্যকারিতা বাড়াবার কাজে লাগানো হবে। সুতরাং এই ধরণের সমরাস্ত্র তৈরী করার পথ শেষ হয়ে গেছে এ আশা করার কোনো সংগত কারণ নেই।

জানার সীমানা

আরেকটি সম্ভাবনার কথা নিজে থেকেই মনে আসে। মৌলিক আবিষ্কারেরও নিশ্চয় একটা সীমানা আছে। এটা ভাবা যেতে পারে যে এমন একদিন আসবে যেদিন পদার্থবিদ তাঁর জানবার ক্ষমতার শেষ সীমায় এসে দাঁড়াবেন। দেখতে পাবেন এক অনতিক্রমনীয় বাধার সৃষ্টি হয়েছে তাঁর সামনে যে বাধাকে অতিক্রম করে নতুন কিছু জানার ক্ষমতা তাঁর আর নেই। দুটো কারণে এটা হতে পারে। প্রথমতঃ প্রকৃতিই হয়তো কিছু তথ্য প্রকাশ হতে দেবে না। দ্বিতীয়তঃ সকল ধারণা এমন একটি জটিল চরিত্র ধারণ করবে যে মানুষের বোঝার ক্ষমতা তার নাগাল পাবে না। দুটো হওয়াই সম্ভব। এমনটি হতে পারে যে প্রকৃতির এমন কিছু লুকানো আছে যাকে সে মানুষের কাছে কোনদিনই উন্মোচিত করতে চাইবে না। এ জিনিষ সম্ভব হতে পারে যে জানা ত্রিমাত্রিক স্থানের জায়গায় চতুর্থ কোনো মাত্রা বিশেষ কোনো স্থানে থাকতে পারে যেখানে বিজ্ঞানীরা কখনই পৌঁছাতে পারবে না। এছাড়া মানুষের বোঝার ক্ষমতা নিঃসন্দেহে সীমিত এবং তা প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ বোঝার পক্ষে যথোপযুক্ত নাও হতে পারে। নীতিগতভাবে এটা স্বীকার করতেই হবে যে ভৌতজ্ঞান এমন একটি বাধার সম্মুখীন হতে পারে যাকে কোনদিনই অতিক্রম করা যাবে না বিজ্ঞানের অনেক অগ্রগতি সত্ত্বেও।

এখানে এটা পরিষ্কার করে নেওয়া ভাল যে যে ধরণের জ্ঞানের, সীমারেখা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে তা হচ্ছে ভৌতজ্ঞান। অন্য কোনো জ্ঞানের কথা এখানে বলা হচ্ছে না। এটা কিন্তু খুব তুচ্ছ তফাৎ নয়। পদার্থবিজ্ঞান জ্ঞানসমুদ্রের সামান্য অংশ

নিয়েই চর্চা করে। এই অংশে কেবল অচেতন বস্তুই আছে। সচেতন বা আধ্যাত্মিক জগতের সকল অভিজ্ঞতা পদার্থবিজ্ঞান ছাড়া অন্য বিজ্ঞানের আওতায় আসবে। তাই বহু জিনিসই পদার্থবিজ্ঞান এড়িয়ে যায় এবং তার কারণ হল পদার্থবিজ্ঞানের পরীক্ষা পদ্ধতি সে সব জায়গায় কাজে লাগানো যায় না। সুতরাং এটা সব সময় মনে রাখতে হবে যে জ্ঞানের কথা এখানে বলা হচ্ছে এবং যার সীমার কথা আলোচিত হচ্ছে তা কেবলই ভৌতরাশির সংশ্লিষ্ট।

ভৌতজ্ঞানের স্বরূপ

যে ধরণের অনুসন্ধানের কথা ভাবা হচ্ছে তাতে ভৌতজ্ঞানের স্বরূপ কেমন হবে সেটা পরিষ্কার বলে নেওয়া ভাল। পদার্থবিজ্ঞানের জ্ঞানের সকল তথ্যই পরীক্ষার ওপর নির্ভর করে। এ ব্যাপারে সেই সব অনুসন্ধানই অর্থবহ হবে যেখানে পরিমাপ করার উপায় আছে। এটা আগেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে প্রাকৃতিক নিয়মের যথোপযুক্ত প্রণয়নই পদার্থবিজ্ঞানের লক্ষ্য এবং এ ধরণের নিয়ম সকল সময়ই দুটি পরিমাপযোগ্য রাশির মধ্যে সম্পর্ক নির্দেশ করে। শক্তি সংরক্ষণ নীতির করাই ধরা যেতে পারে। শক্তি একটি সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত জিনিস এবং যে কোনো স্বয়ংসম্পূর্ণ জিনিসের শক্তি নির্ধারণ করা যেতে পারে। শক্তি সংরক্ষণ নীতি অনুসারে কোনো বস্তুর সমগ্র শক্তি অপরিবর্তিত থাকে, বস্তুটির যাই পরিবর্তন হোক না কেন। এই নীতিকে যাচাই করতে হলে শক্তিমাপার একটি পথ চাই। এ ধরণের পরিমাপ পদ্ধতি শক্তির সংজ্ঞার সঙ্গে সংগতি রেখে হওয়া উচিত।

সুতরাং প্রকৃতির নিয়ম সব সময় পরিমাপযোগ্য রাশি নিয়ে সৃষ্ট। এই রাশিগুলো বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কী ভাবে পরিবর্তিত হবে সেটা বোঝানই নিয়মের মূল লক্ষ্য। এ ধরণের নিয়মের অস্তিত্ব খুঁজে পেলেই ধরা যাবে যে প্রকৃতিকে বোঝা গেছে। এর জন্যে অন্য কোনো ব্যাখ্যা দাবী করা যাবে না। এর ওপরে বলা যেতে পারে প্রাকৃতিক নিয়মগুলো কেবল তর্কের প্রয়োজনে উদ্ভূত হয়নি। অভিজ্ঞতার মধ্যেই এদের প্রাণ প্রতিষ্ঠা এবং সেই কারণে অবশ্যই এদের একটা পারিসাংখ্যিক ভিত্তি থাকবে।

জ্ঞানের সীমা

এই ধারণাগুলো মনে রেখে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সীমানা সম্বন্ধে কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করা যেতে পারে। একটি সম্ভাবনার কথা এতে মনে আসে। প্রাকৃতিক নিয়ম আবিষ্কারের ক্ষেত্রে একটি সীমারেখা টানা যেতে পারে তখনই, যখন দেখা যাবে পর্যবেক্ষণের ফলে ক্রমাগতই অনিয়মিত ঘটনার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এটা

হয়ত ভাবা যেতে পারে ঠিকই কিন্তু এ ধরণের অবস্থার কথা খুব গভীর ভাবে চিন্তা না করা ভালো। কারণ এ ধরণের অবস্থার ফলে পদার্থবিজ্ঞান তার কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলবে। পদার্থ বিজ্ঞানকে এটা ধরেই এগোতে হবে যে প্রকৃতিতে সর্বত্র নিয়মের রাজত্ব চলছে।

অনিয়মিত ঘটনার কথা বাদ দিলে আর একটি পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে, যা দ্বারা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সীমায়িত হয়ে যেতে পারে। ধরা যাক নিয়মের অস্তিত্ব ঠিকই আছে, কিন্তু কয়েকটি বিশেষ পরিস্থিতির শিকার হয়ে তারা কতকগুলি প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ করতে পারছে না এবং তার ফলে তাদের আর সংগত জ্ঞানের অংশ হিসাবে ভাবা যাচ্ছে না। এ ব্যাপারটি এমন একটি পরিস্থিতির মুখোমুখি করে, যার সম্বন্ধে বহু পরস্পরবিরোধী মত আছে।

আগেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে প্রাকৃতিক নিয়মের যথার্থ তখনই থাকবে যখন তার সাহায্যে কোন ভবিষ্যদ্বাণী করা যাবে। এ ব্যাপারে কোন মতবিরোধ নেই। যে নিয়ম ভবিষ্যৎ বলতে পারে না তার কোন অস্তিত্ব নেই। সুতরাং ভবিষ্যদ্বানী করার ব্যাপারে ক্ষমতাই প্রাকৃতিক নিয়মের আসল পরিচয়। এই দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী আসল প্রাকৃতিক নিয়ম সেটাই হবে যে কোন চিন্তনীয় পরীক্ষার ফলাফল বৈজ্ঞানিকদের আগে থেকেই একটা মোটামুটি ধারণা দিতে পারবে।

উদাহরণস্বরূপ আগেই বলা হয়েছে যে আলোর দুটি চরিত্র আছে। তরঙ্গ চরিত্র ও কণা চরিত্র। কি ধরণের পরীক্ষা চালানো হচ্ছে তার উপর নির্ভর করে আলো তার কোন চরিত্র দর্শাবে। কোয়াণ্টাম বলবিদ্যা এই দ্বৈতচরিত্র মেনে নিতে পেরেছিল এমন একটি নিয়মের সাহায্যে যা একটি পরীক্ষায় আলোর কোন চরিত্রটি প্রাধান্য লাভ করবে তা বলে দিতে পারে। অবশ্য সত্য যে এই নিয়মটীকে সনাতনী পদার্থ বিজ্ঞানের সাধারণ পরিভাষায় বাঁধা যাবে না। কেবলমাত্র অপরিচিত ধারণার সাপেক্ষেই এদের বর্ণনা দেওয়া যাবে এবং সেই কারণে একে কল্পনার অযোগ্য মনে করা হয়।

একটা অনুমান করা যদি ঠিক হয় যে একটি নিয়মের একমাত্র কাজ হবে ভবিষ্যৎকে জানিয়ে দেওয়া তাহলে এবং এটা যদি মেনে নিতে হয় যে এর চিত্রগ্রাহ্য রূপ থাকল বা না থাকল তাতে কিছু আসে যায় না তাহলে ভৌতজ্ঞানের প্রগতির সামনে কোন বাধার উপস্থিতি চিন্তা করা কষ্টকর। সবচেয়ে খারাপ যেটা হতে পারে সেটা হল সংশ্লিষ্ট নিয়মগুলি ক্রমশ জটিল হয়ে উঠলো এবং তাদের জন্য এমন গাণিতিক জ্ঞানের প্রয়োজন হল যাহা বর্তমান জ্ঞানের বাইরে এবং তার ফলে নিয়ম প্রণয়ন করা গেল না।

এ ধরণের অবস্থাতে পদার্থবিদ কিছু সুবিধা সৃষ্টি করে নিতে পারেন।

সম্পূর্ণভাবে জ্ঞাত প্রাথমিক অবস্থা থেকে শুরু করে তিনি বহুসংখ্যক পরীক্ষা চালাতে পারেন। এবং প্রতিবারেই তাকে খুব সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষালব্ধ ফলগুলি নথিভুক্ত করতে হবে। এ ধরণের বিস্তারিত নথিপত্র থেকে ঐ বস্তুর সংক্রান্ত অন্যান্য সকল পরীক্ষা কী পথ নেবে তার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন। অনেকসময় একটি বেতার-কেন্দ্র থেকে যখন বার্তা প্রেরণ করা হয় তখনই সেই বার্তা আরেকটি বার্তা প্রেরণকারী বেতারকেন্দ্র দ্বারা আটকানো হয়। যে বার্তার সাহায্যে প্রথম বার্তাটিকে আটকানো হচ্ছে সেটা যদি বিরাম নিয়ে আসে তাহলে প্রথম বার্তার অংশ বিশেষই আটকা পড়বে এবং তাতেও প্রথম বার্তাটি অবোধগম্য হয়ে পড়বে। এ সত্ত্বেও প্রথম বার্তাটি উদ্ধার করার কিছু কিছু রাস্তা আছে। এজন্য প্রথম বার্তা প্রেরণকারী কেন্দ্রকে বারে বারেই বার্তাটিকে পাঠাতে হবে। এর ফলে প্রতিবার ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় আটকা পড়বে। বার্তার পুনরাবৃত্তি যদি বেশি বার করা যায়, তবে শেষ পর্যন্ত আটকে পড়া সত্ত্বেও পুরো বার্তাটি উদ্ধার করা যাবে। কার্যকারণের মতই এটা আরেকটি উদাহরণ যেখানে একটি সম্বন্ধ তৈরী করা যাচ্ছে পরিসংখ্যানের সহায়তায়।

সুতরাং এই সিদ্ধান্তই আমরা করতে পারি যে ভৌতবিজ্ঞানের কোনো সীমানা নেই, যদি আমরা ধরে নিই প্রাকৃতিক নিয়মের প্রয়োজনীয়তাই হল সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করা।

কল্পনীয় জ্ঞানের সীমা

প্রাকৃতিক নিয়ম কেবল ভবিষ্যতের তথ্য যোগাবে এ ধারণার কোনো বিকল্প আছে কি? আগেই বলা হয়েছে যে কিছু কিছু দার্শনিক ও পদার্থবিদ আছেন যাঁরা একথা মানতেই চান না যে কেবল ভবিষ্যৎ জানার জনাই প্রাকৃতিক নিয়মের অস্তিত্ব। কল্পনীয় ধারণার সাপেক্ষে বর্ণনা-যোগ্য হলেই নিয়মের উপযোগিতা —এই মতই পোষণ করেন তাঁরা। এখানে কল্পনীয় ধারণা বলতে সনাতনী পদার্থবিজ্ঞানে যা ব্যবহার করা হয় তাই-ই।

এই পরিস্থিতিতে জ্ঞানের সীমার প্রশ্নটি একটু অন্য অর্থ পরিগ্রহ করে। কল্পনীয় ধারণার যারা প্রবক্তা, তারা কোয়াণ্টাম বলবিদ্যাকে প্রকৃত জ্ঞান হিসেবে মানেন না, বরং তাকে অন্তবর্তী সমাধান হিসাবে গণ্য করেন। এই মত অনুযায়ী আলোর দ্বৈত চরিত্রের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে তখনই, যখন সনাতনী পদার্থবিজ্ঞানের ধারণার সাহায্যে পর্যবেক্ষিত সবকিছু ব্যাখ্যা করা যাবে। এক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সীমা থাকবে কি থাকবে না নির্ভর করবে এ ধরণের নিয়ম প্রণয়ন করা যাবে কি না তার ওপর।

আজকের দিনে কেউই নিশ্চিত করে বলতে পারে না যে এটা সম্ভব কি না। এখন যতই অসম্ভব মনে হোক, একদিন হয়ত আসবে যেদিন প্রকৃতির মধ্যে সব কিছুর কল্পনীয় ব্যাখ্যা খুঁজে পেতে অসুবিধা হবে না। সেক্ষেত্রে কল্পনীয় জ্ঞানেরও কোনো সীমা থাকবে না। মনে হয় কল্পনীয় হবার শর্তটি এমন একটি স্বপ্নের মত যা কোনোদিন বাস্তবায়িত হবে না। এতে যিনি কল্পনাগ্রাহ্য প্রাকৃতিক নিয়মের অস্তিত্ব দাবী করেন তাঁকে তাঁর জ্ঞানের সীমানা সম্পর্কে সচেতন হতে হবে কারণ তাঁর জ্ঞান নিয়ে পরমাণু জগতে প্রবেশাধিকার নষ্ট হয়ে যাবে। এর অর্থ হলো সম্ভবতঃ এমন কিছু জিনিস আছে, যাদের কল্পনাযোগ্য ধারণার সাহায্যে ব্যাখ্যা করাই যাবে না।

'তুমি কি পরম জানা জেনেছ ?
সীমাহীন কুয়াশায় কতকিছু আসে যায়
কাকে তুমি শেষ বলে মেনেছ ?'

পরিশিষ্ট

ক্রমবিকাশের কয়েকজন নায়ক

ফ্যারাডে মাইকেল (১৭৯১—১৮৬৭)—পরীক্ষামূলক গবেষণায় অসাধারণ প্রতিভাধর বিজ্ঞানী। ১৭৯১ সালে নেউংটনে এক কর্মকার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সপরিবারে লণ্ডনে বসবাস করতে আসেন। তাঁর শৈশব অত্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যে কাটে। চোদ্দ বছর বয়সে তিনি এক দোকানে বই বাঁধানো ও বিক্রির কাজে শিক্ষানবীশরূপে যোগ দেন। এই সময় বিজ্ঞানের কয়েকটি বই পাঠ করে ও মাঝে মাঝে বিজ্ঞান বিষয়ে বক্তৃতা শুনে ফ্যারাডের মধ্যে ঔৎসুক্যের উদয় হয়। ১৮১২ সালে তিনি হামফ্রি ডেভির কয়েকটি বক্তৃতা শুনে লিপিবদ্ধ করেন ও তা ডেভির কাছে পাঠিয়ে দেন। সন্তুষ্ট ডেভি রয়াল সোসাইটির গবেষণাগারে নিজের সাহায্যকারী হিসাবে তাঁকে নিযুক্ত করেন। ১৮১৬ সালে ফ্যারাডে স্বাধীনভাবে গবেষণার কাজ শুরু করেন। এই সময়ে তাঁর প্রধান আকর্ষণ ছিল রসায়ন। ১৮২১ সালে তিনি তড়িৎচুম্বক বিষয়ে গবেষণা শুরু করেন এবং একাধিক গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের জন্য বিপুল খ্যাতি অর্জন করেন। ১৮৩১ সালে তাঁর শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার 'তড়িৎ-চৌম্বক আবেশের নিয়ম' (Law of Electromagnetic Induction) রয়াল সোসাইটিতে ঘোষণা করেন এই আবিষ্কার শিল্প ক্ষেত্রে তড়িৎযুগের সূচনা করে। এই নিয়ম থেকে ডাইনামো তৈরী করে প্রচুর পরিমাণে তড়িৎ প্রবাহ সৃষ্টি করা সম্ভব। ১৮৩৩ সালে ফ্যারাডে রসায়নের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ফ্যারাডের বহু আবিষ্কারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—তরলের তড়িদ্‌বিশ্লেষণের নিয়ম, ফ্যারাডে এফেক্ট, ক্লোরিন গ্যাসকে তরলে রূপান্তর করা বেনজিন আবিষ্কার ইত্যাদি। ব্যক্তিগত জীবনে ফ্যারাডে অত্যন্ত সরল উদারহৃদয় ও গভীর ধর্মভাবাপন্ন মানুষ ছিলেন। ১৮৬৭ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। অনেকের মতে তাত্ত্বিক গবেষণায় নিউটনের যে স্থান, পরীক্ষা-সংক্রান্ত গবেষণায় ফ্যারাডের সেই স্থান।

রামফোর্ড বেঞ্জামিন (১৭৫৩—১৮১৪)—১৭৫৩ সালে আমেরিকায় জন্মগ্রহণ করেন। অবসর সময়ে তিনি চিকিৎসাশাস্ত্র ও পদার্থবিদ্যা পধ্যায়ন করতেন। তাঁর চাকুরী জীবন কাটে লণ্ডনে। তাপবিদ্যাতে বহু আবিষ্কারের জন্য তিনি বিখ্যাত। রয়াল সোসাইটি তাঁর স্মরণে রামফোর্ড পদক চালু করেন। ২১শে আগস্ট ১৮১৪ সালে তার মৃত্যু হয়।

জ্‌ল জেমস প্রেসকট (১৮১৮—১৮৮৯)—ব্রিটিশ বিজ্ঞানী। তিনি ডালটনের অধীনে শিক্ষালাভ করেন। শারিরীক ভাবে তিনি পটু না হওয়ায় তাঁকে বাড়িতে বসেই গবেষণা করতে হত। তড়িৎ বিজ্ঞানেই তাঁর গবেষণা শুরু। তিনি আবিষ্কার করেন যে তড়িৎ প্রবাহের ফলে পরিবাহীতে তাপ উৎপন্ন হবে। উৎপন্ন তাপের পরিমাণও তিনি আবিষ্কার করেন। তাপ ও শক্তির সমতুল্যতা তিনিই প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৮৯ সালের ১১ই অক্টোবর তাঁর মৃত্যু হয়।

হারটজ হেনরিখ রুডলফ (১৮৫৭—৯৪)—জার্মান পদার্থবিদ। ১৮৫৭ সালে ২২শে ফেব্রুয়ারী হামবুর্গে তাঁর জন্ম। বেতারে সংবাদ প্রেরণের ক্ষেত্রে তাঁর আবিষ্কৃত হারট জিয়াণ তরঙ্গ তাঁকে খ্যাতি দিয়েছে। বার্লিনে তিনি হেলমোটজের সহকারী ছিলেন। ১৮৮৫ সালে তিনি অধ্যাপক নিযুক্ত হন ও তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। তাঁর গবেষণা বিশেষ সমাদর লাভ করেছিল। ম্যাকস্‌ওয়েলের সমকালীন বিজ্ঞানী হিসাবে তিনি যথেষ্ট সম্মানিত ছিলেন। ১৮৯০ সালে ১লা জানুয়ারীতে তাঁর মৃত্যু হয়।

কণাদ—বৈশেষিক দর্শনের প্রবর্তক মহর্ষি। এর জীবনবৃত্ত সম্পর্কে প্রামাণিক কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে পদার্থতত্ত্ব বিশ্লেষণের প্রথম প্রয়াসের দিক দিয়ে কণাদ দর্শনের মূল্য অপরিসীম। প্রাক্ পরীক্ষণ স্তরেও যে বৈজ্ঞানিক সত্য কল্পনা করা যায় কণাদের **পরমাণুবাদ** তাঁর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

টলেমি—খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে আলেকজান্দ্রিয়া নগরে টলেমি তাঁর জীবন অতিবাহিত করেন। তিনি একাধারে গণিত জ্যোতির্বিদ্যা ভূগোল এবং সংগীতে পারদর্শী ছিলেন। তিনি পৃথিবীর যে ভৌগোলিক বিবরণ লিখেছিলেন প্রায় তেরশ বছর পর্যন্ত তাই পণ্ডিত সমাজে প্রামাণিক বলে গণ্য ছিল। টলেমি ভারতের যে ভৌগোলিক বিবরণ রচনা করেন তাতে বহু নদনদী, পর্বত, নগরী ও বন্দরের উল্লেখ আছে। তিনি তাদের অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশও বিবৃত করেছেন। ভূকেন্দ্রিক বিশ্বতত্ত্বের প্রবর্তকরূপে টলেমি বিখ্যাত।

কোপার্নিকাস নিকোলাউস (১৪৭৩—১৫৪৩)—অন্ধ বিশ্বাসের বদলে নতুন করে প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে যে কয়েকজন বিজ্ঞানসাধক ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন কোপার্নিকাস তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর জন্ম পোলাণ্ডের থর্ন সহরে। উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন প্রথমে ক্র্যাকাও বিশ্ববিদ্যালয়ে, পরে গণিত, চিকিৎসা ও আইন শাস্ত্র অধ্যায়ন করেন ইতালির একাধিক বিশ্ব-বিদ্যালয়ে। রোম বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি গণিতের অধ্যাপক ছিলেন। শেষ বয়সে তিনি ধর্মযাজকতা গ্রহণ করেন। কোপার্নিকাস তাঁর গবেষণার ফল ১৫৩১ সালের

মধ্যে লিপিবদ্ধ করেন। মুদ্রিত বই যখন কোপার্নিকাসের হাতে আসে তখন তিনি মৃত্যু শয্যায়। সাময়িকভাবে কিছুটা বিভ্রান্তিকর হলেও কোপার্নিকাস-বাদের বৈপ্লবিক তাৎপর্য দীর্ঘদিন অনুভূত ছিল না। রক্ষণশীল ধর্মযাজক সম্প্রদায় তাঁর তত্ত্বকে ধর্মবিরুদ্ধ বলে ঘোষণা করেন আর বিজ্ঞান সাধকেরা একেই বিজ্ঞানের অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে বিবেচনা করেন।

নিউটন আইজ্যাক (১৬৪২—১৭২৭)—ইংরেজ পদার্থবিজ্ঞানী ও গণিত বিশারদ্। ১৬৪২ সালে ২৫শে ডিসেম্বর এক কৃষিজীবি পরিবারে নিউটন জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের কিছু পূর্বে তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। ১৬৬১ সালে তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। শৈশব ও কৈশোরে লেখাপড়ায় নিউটনের অসাধারণ প্রতিভার স্ফুরণ দেখা যায় নি। ১৬৬৫ সালে তিনি বি, এ, উপাধি লাভ করেন। সেই বৎসরই প্লেগ মহামারীর প্রকোপে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যায় ও নিউটন তার গ্রামে ফিরে দুবছর নিজের পড়ায় মনোনিবেশ করেন। এই সময়ই তাঁর উদ্ভাবনী শক্তি চূড়ান্ত বিকাশ লাভ করে। ১৬৬৭ সালে নিউটন কেমব্রিজে ফেরেন ও ট্রিনিটি কলেজের ফেলো নির্বাচিত হন। ১৭০৩ সাল থেকে আমৃত্যু রয়্যাল সোসাইটির সভাপতি ছিলেন। গণিতশাস্ত্রে নিউটনের প্রধান অবদানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বাইনোমিয়াল থিয়োরেম (দ্বিপদ উপপাদ্য) ডিফারেন্সিয়াল ও ইন্টিগ্র্যাল ক্যালকুলাস (অন্তরকলন ও সমাফলন) এবং ক্যালকুলাস তত্ত্বের প্রধানসূত্র। পদার্থবিদ্যায় তাঁর প্রধান অবদান বলবিদ্যা, মহাকর্ষতত্ত্ব ও আলোকতত্ত্ব। নিউটনের বলবিদ্যাকে সমগ্র বিজ্ঞানের ভিত্তি বলা চলে। মহাকর্ষ ও বলবিদ্যা বিষয়ে তাঁর গবেষণার ফলাফল বিখ্যাত principia গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। নিউটনের অপর গ্রন্থ 'আলোকবিদ্যা' ১৭০৪ সালে প্রকাশিত হয়। আলোকবিদ্যায় তাঁর বর্ণালী সংক্রান্ত গবেষণা প্রতিফলন নির্ভর দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গ্যালিলিও গ্যালিলাই (১৫৬৪—১৬৪২) ইতালীয় জ্যোতির্বিদ। তাঁর পিতার ইচ্ছা ছিল যে তিনি চিকিৎসক হন। কিন্তু স্বাভাবিক প্রবণতায় তিনি পদার্থবিজ্ঞান পাঠ করতে সুরু করেন। মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে তিনি অংকশাস্ত্রের অধ্যাপক হন। তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানে ব্যবহারেরর জন্য টেলিস্কোপ তৈরী করেন। গ্রহদের সম্বন্ধে গ্যালিলিওর মতবাদ ধর্মীয় লোকেদের মনে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। পদার্থবিজ্ঞান যে মূলত পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান এই সত্যটি প্রতিষ্ঠা করেন গ্যালিলিও।

ডেমোক্রিটাস (খ্রীষ্টপূর্ব ৪৬০—৩৫৭)—গ্রীক দার্শনিক। আধুনিক পদার্থবিদ্ ও রসায়ন বিদেরা যে পরমাণু তত্ত্বের কথা বলেন তার সূত্রপাত করে-

ছিলেন ডেমোক্রিটাস। যে পরমাণুদের কথা তিনি বলেছিলেন তাদের গঠন, ওজন সবই আলাদা। তাঁর মতে পরমাণুরা পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে ঘূর্ণায়মান গতির সৃষ্টি করে। জীবন সম্বন্ধে ডেমোক্রিটাস বড়ই আশাবাদী ছিলেন। এজন্য লোকে তাঁকে হাস্যময় দার্শনিক বলত।

কেপলার জোহান (১৫৭১—১৬৩০) জার্মান জ্যোতির্বিদ। তাঁর জ্ঞানবত্তার জন্য মাত্র তেইশ বছর বয়সে বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৬০০ সালে তিনি বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ টাইকো ব্রাহের সংগে সংযুক্ত হন। সমকালীন বিজ্ঞানীদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখ যোগ্য ব্যক্তিত্ব কেপলার বহু অসুস্থতা, ক্ষতি ও অত্যাচারের মুখোমুখি হয়েছেন। তাঁর আবিষ্কৃত গ্রহদের নিয়মগুলি তার নামের সঙ্গে সংযুক্ত।

মাইকেলসন এ্যালবার্ট আব্রাহাম (১৮৫২—১৯৩১)। মাইকেলসনের জন্ম জার্মানীতে কিন্তু পরে স্থায়ীভাবে আমেরিকায় বসবাস করেন। প্রথমে তিনি নৌবাহিনীতে চাকুরী নেন। পরে তিনি ওহিও বিশ্ববিদ্যালয় ও ১৮৯২ সালে চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান নিযুক্ত হন। এইখানেই তিনি সূক্ষ্মভাবে আলোর গতিবেগ মাপার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। মাইকেলসন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সাপেক্ষে এক মিটারের দৈর্ঘ্য নিরূপন করেন। অধ্যাপক মর্লির সহযোগিতায় তিনি ইথারের অস্তিত্ব অপ্রমাণ করেন। তাঁদের এই আবিষ্কার আপেক্ষিকতাবাদের ভিত্তি রচনা করল। কাজের স্বীকৃতি হিসাবে তিনি ১৯০৭ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

মর্লে এডওয়ার্ড (১৮৩৮—১৯২৩) আমেরিকান পদার্থবিদ্। অধ্যাপক মাইকেলকনের সংগে তার কাজ পদার্থবিজ্ঞানে এক বিশেষ অধ্যায়ের সূচনা করেছিল।

ম্যাকস্ওয়েল জেমস ক্লার্ক (১৮৩১—৭৯) প্রসিদ্ধ ইংরেজ পদার্থবিজ্ঞানী। এডিনবোয় জন্ম। ১৮৫৪ সালে তিনি দ্বিতীয় র‍্যাংলার এবং স্মিথ পুরস্কার লাভ করেন। ১৮৬০ সালে লণ্ডনের কিংস কলেজে পদার্থবিদ্যা ও জ্যোতিষের প্রধান অধ্যাপক এবং ১৮৭১ সালে কেমব্রিজে একস্পেরিমণ্টাল ফিজিক্স-এর অধ্যাপক হন্। তাঁর তত্ত্বাবধানে সেখানে ক্যাভেণ্ডিশ ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি শনিবলয়ের স্থায়িত্ব' প্রবন্ধ লিখে এডামস্ পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর লেখা 'তাপতত্ত্ব' ও 'পদার্থগতি' বই দুটি সুপরিচিত। কিন্তু তাঁর জীবনের প্রধান কাজ "ট্রিটিজ অন ইলেকট্রিসিটি' গ্রন্থটি। এটি তড়িৎ চুম্বক বিজ্ঞানে আলোড়ন সৃষ্টি করে।

এ্যারিস্টটল (৩৮৪—৩২২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)—গ্রীক দার্শনিক। ম্যাসিডোনিয়ার তাঁর জন্ম। এ্যারিষ্টটলের পিতা ছিলেন চিকিৎসক। খ্রীষ্টপূর্ব ৩৬৭ সালে তিনি এথেন্সে যান ও প্লুটোর সংগে সতেরো বছর অতিবাহিত করেন। খ্রীষ্টপূর্ব ৩৪৩ সালে তিনি ম্যাসিডোনিয়ার সম্রাটের পুত্রের শিক্ষক নিযুক্ত হন। এ্যারিষ্টটলের চিন্তাধারায় প্লেটোর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ছিল।

এলেমবারট্ ডি (১৭১৭—৮৩)—ফরাসী গণিতবিদ্। ফরাসীভাষায় রচিত এনসাইকোপেডিয়ার তিনি সম্পাদক ছিলেন। গতিবিদ্যাতে তাঁর রচিত নিয়মগুলি এলেনবারট্ সূত্র নামে পরিচিত। এলেনবারট্ বিশ্বাস করতেন যে আমরা সকল ঘটনা ব্যাখ্যা করতেই কেবল পারি কেন তারা ঘটে তা জানতে পারি না। দার্শনিক ভলটেয়ারের সংগে তাঁর নিবিড় যোগাযোগ ছিল বিজ্ঞানের উৎপত্তি ও শ্রেণীবিভাগ নিয়ে তিনি বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করেন।

ফ্রেনেল অ্যাসষ্টিন জিন (১৭৮৮—১৮২৭)—ফরাসী পদার্থবিদ্। ১৭৮৮ সালে ১০ই মে তাঁর জন্ম হয়। পেশায় তিনি ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার। পরে তিনি আলো ও আলোর তরঙ্গবাদের ওপর গবেষণা করেন তিনি ইয়াং এর পরীক্ষার গাণিতিক ব্যাখ্যা দেন ও বাই প্রিসম্ পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। আলোর ব্যাতিচার নিয়ে তিনি অনেক গবেষণা করেন।

পাউলি উলফ্‌গ্যানো (১৯০০—১৯৫৮)—অষ্ট্রিয়ান পদার্থবিদ্। ভিয়েনাতে ১৯০০ সালে ২৫ শে এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২১ সালে তিনি গোটিংজেনে সহকারী পদার্থবিদ্ নিযুক্ত হন। ১৯২২ সালে বোরের ছাত্র হিসাবে কোপেন হাগেনে যান। হামবুর্গ ও জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার পর তিনি আমেরিকাতে প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। পরমাণুর গঠন সম্বন্ধে গবেষণার জন্য ১৯৪৫ সালে তাঁদের নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

মেয়ার ভিকটর (১৮৪৮—১৮৯৭)—জার্মান রসায়নবিদ্। বার্লিন ও হাইডেল বার্গে তিনি শিক্ষালাভ করেন। ১৮৭২ সালে জুরিখ পলিটেকনিকে রসায়নের অধ্যাপক হন। তাপবিজ্ঞানে তাঁর অনেক অবদান। তিনিই সর্বপ্রথম উচ্চতাপ-মাত্রায় বাষ্পঘনত্বের পরিমাণ নির্ধারণ করেন।

হাইসেনবার্গ ওয়ার্নার (১৯০১ সালে জন্মগ্রহণ করেন)—জার্মান পদার্থ-বিজ্ঞানী। মিউনিক ও গটিংগেনে শিক্ষালাভ করেন ও ১৯২৭ সালে, পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক হন। কোয়াণ্টাম বলবিদ্যায় তাঁর প্রবর্তিত পদ্ধতিটি 'Matrix Mechanics' নামে পরিচিত। অনিশ্চয়তা সূত্র তিনিই প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন। পরমাণু সংক্রান্ত গবেষণায় তাঁর অবদান বিরাট। ১৯৩২ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

বোলজম্যান লুডউইগ (১৮৪৪—১৯০৬)—ভিয়েনাতে জন্মগ্রহণ করেন। ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করে তিনি ১৮৬৬ সালে ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন। পরিসংখ্যান বলবিদ্যা ও গ্যাসের অনুগতিতত্ত্বে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। কৃষ্ণবস্তু থেকে নির্গত বর্ণালীর তাত্ত্বিক গবেষণায়ও তাঁর যথেষ্ট অবদান আছে।

ফের্মি এনরিকো (১৯০১—১৯৫৪)—রোম শহরে জন্মগ্রহণ করেন। "Atomic pile" এর প্রথম নির্মাণের কৃতিত্ব তাঁর। তিনি ম্যাকস্ বরণের সংগে একসঙ্গে কাজ করেন। ১৯২৭ সালে তিনি রোম বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক হন। কোয়াণ্টাম পরিসংখ্যান, বিটাক্ষয় ও নিউট্রিনো সংক্রান্ত গবেষণা তাঁকে জগদ্বিখ্যাত করেছে। ১৯৩৮ সালে কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। ফের্মির শেষ জীবন মোটামুটি ভাবে আমেরিকা যুক্ত রাষ্ট্রেই অতিবাহিত হয়।

ইউক্লিড—খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০ সাল নাগাদ আলেকজান্দ্রিয়াতে জম্ম গ্রহণ করেন ইউক্লিড সম্ভবত এথেন্স সহরে শিক্ষালাভ করেন। "Elements" নামে যে পুস্তক তিনি রচনা করেন তার সম্পূর্ণ ভাগ হয়ত তাঁর নিজস্ব না। তবে বেশ কিছু প্রমাণ তাঁর আবিষ্কৃত। জ্যামিতির সনাতনীরূপ তাঁর হাতেই সৃষ্ট।

হেলমোটজ্ হারনাম (১৮২১—১৮৯৪)—জার্মানীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যা ও শারীরবিদ্যায় তাঁর অবদান চিরস্মরণীয়। শব্দবিজ্ঞান ও মানুষের শরীরের সংগে তার সম্পর্কের ওপর তিনি বহু গবেষণা করেন। তিনিই প্রথম দেখান যে দেহের স্নায়ুর মধ্য দিয়ে কোন সংকেত শব্দের গতিবেগের এক দশামাংশ গতি নিয়ে চলে।

গেলম্যান মারি—আমেরিকান পদার্থবিদ্। ১৯২৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। "weak interaction, strong interaction" "dispersion relation" "Symmetries প্রভৃতি নানা বিষয়ে তাঁর গবেষণা। তাঁর জাজের স্বীকৃতি স্বরূপ নোবেল পুরস্কার পান।

ডিরাক পল—১৯০২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ব্রিটিশ তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্। কোয়াণ্টাম বলবিদ্যায় আপেক্ষিকতা বাদের প্রবর্তন তিনিই সর্বপ্রথম করেন। কোয়াণ্টাম বলবিদ্যায় তাঁর অবদানের জন্য ১৯৩৩ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৭৫ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

শ্রোয়েডিংগার আরউইন (১৮৮৭—১৯৬১)—ভিয়েনাতে জন্মগ্রহণ করেন কোয়াণ্টাম বলবিদ্যার উগ্যাতা। তাঁর সমীকরণটি "Schro'dinger Equation" নামে বিখ্যাত। এই সমীকরণের সাহায্যে ইলেকট্রন ও অন্যান্য কণাদের ক্রিয়া-কলাপ অনুধাবণ করা যায়। ১৯৩৩ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

পিথা গোরাস (খ্রীষ্টপূর্ব ৫৭২—৪৯৭)—গ্রীক দেশে জন্ম। তিনি ছিলেন কৃতী পদার্থবিদ্, গণিতবিদ্ ও জ্যোতিবিদ।

লাওয়ে ভন ম্যাকস্ (১৮৭৯—১৯৬০)—জার্মান বিজ্ঞানী কেলাস দ্বারা রঞ্জন রশ্মির ব্যবর্তন ও কেলাসের গঠনাকৃতি সম্বন্ধে গবেষণার জন্য ১৯১৪ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

ফ্র্যাংক জেমস—জার্মান পদার্থবিদ্। ১৮৫২ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পরমাণুর সংগে ইলেকট্রনের সংঘর্ষ ঘটলে কি প্রতিক্রিয়া হয় তা নিয়ে গবেষণা করেন। পরমাণুর মধ্যে যে সুস্থিত শক্তিস্তর থাকে তাঁর পরীক্ষার সাহায্যেই তা প্রমাণিত হয়। ১৯২৫ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

হারটজ গুসটাভ (১৮৮৭—১৯৪০)—ইনিও জার্মান বিজ্ঞানী। জেমস্ ফ্র্যাংকের সহযোগিতা তিনি পরমাণুর মধ্যে শক্তিস্তরের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। যুথ ভাবে ইনিও ১৯২৫ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

কম্পটন আর্থার হোলির—জন্ম ১৮৯২ সালে আমেরিকায়। তাঁর আবিষ্কৃত নিয়মটি কম্পটন এফেকট নামে পরিচিত। তাঁর এই আবিষ্কার কোয়ান্টাম মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করে। ১৯২৭ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

ডেভিসন ক্লিনটন (১৮৮১—১৯৫৮)—আমেরিকান বিজ্ঞানী। ইলেকট্রনের তরঙ্গ চরিত্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তাঁর অবদান সর্বজন স্বীকৃত। কেলাস দ্বারা ইলেকট্রনের ব্যবর্তনের সাহায্যে তিনি ইলেকট্রনের তরঙ্গ চরিত্র প্রতিষ্ঠা করেন। এ ব্যাপারে তাঁর সহযোগী ছিলেন বিজ্ঞানী জারমার। ১৯৩৭ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

দ্য ব্রগলি লুইস—১৮৯২ সালে ফ্রান্সে জন্মগ্রহণ করেন। ইলেকট্রনের তরঙ্গ সত্তার কথা তিনিই প্রথম বলেন। প্রকৃত পক্ষে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার তিনি অন্যতম পথিকৃত ১৯২৯ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার পান।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু—১৮৯৪ সালে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলে তিনি পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপকরূপে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। ১৯২৪ সালে বোস সংখ্যায়ন উদ্ভাবন করেন। জার্মান পত্রিকায় সেই গবেষণা পত্র প্রকাশিত হয়। ঐ বছরেই তিনি ইউরোপে যান ও প্যারিসে মাদাম কুরীর গবেষণাগারে গবেষণা করেন। ১৯২৫ সালে বার্লিনে আইন স্টাইনের সংগে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তাঁর উদ্ভাবিত তত্ত্বটি পরবর্তী কালে বোস আইনস্টাইন পরিসংখ্যান নামে পরিচিত হয়। ১৯৫৮ সালে লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটির ফেলো (F.R.S.) নির্বাচিত হন। ১৯৭৪ সালে ৪ঠা ফেব্রুয়ারীতে তার মৃত্যু হয়।

বর্ন ম্যাকস্ (১৮৮২—১৯৭০)—জার্মান পদার্থবিদ্। কোয়াণ্টাম বলবিদ্যা ও তরঙ্গ বলবিদ্যাতে অবদানের জন্য ১৯৫৪ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

এডিংটন আর্থার স্ট্যানলি (১৮৮২—১৯৪৪) ব্রিটিশ জ্যোতির্বিদ ও দার্শনিক। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষা লাভ করেন। তিনি গ্রীন উইচের রয়াল অবসারভেটারির সংগে যুক্ত ছিলেন। তিনি পরে F.R.S. হন। পরে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হন। নক্ষত্রের গতিবিধি সংক্রান্ত গবেষণায় তাঁর অবদান অসামান্য। আপেক্ষিকতাবাদে তাঁর বিশেষ পারদর্শিতা ছিল।

বামার জার্মান বিজ্ঞানী। ১৮৮৫ সালে তাঁর প্রকাশিত নিবন্ধ থেকেই বর্ণালীর শ্রেণীবিভাগের ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়। বামার যে আবিষ্কার করেছিলেন বোরের তত্ত্বের সংগে তা সম্পূর্ণভাবে মিলে যায়।

হাইগেন ক্রিশ্চিয়ান ১৬২৯—৯৫)—১৪ই এপ্রিল ১৬২৯ সালে নেদারল্যাণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন একাধারে কবি সঙ্গীতজ্ঞ ও রাজনীতিবিদ্। ছোটবেলা থেকেই হাইগেন বিজ্ঞান ও গণিতে বিশেষ কৃতিত্ব দেখান। সময়ের দিক দিয়ে হাইগেন নিউটনের সমসাময়িক ছিলেন এবং নিউটনের সঙ্গে সখ্যতা ছিল। তিনি বেশ কিছুদিন ফ্রান্সে অতিবাহিত করেন। এই সময়েই তিনি তাঁর বিখ্যাত 'Treaties on light' বইটি রচনা করেন। বইটি ১৬৯৪ সালে প্রকাশিত হয়।

হাইগেন আলোর তরঙ্গবাদের প্রবক্তা। তাঁর মতবাদের সাহায্যে তিনি আলোর প্রতিফলন, প্রতিসরণ ও ব্যবর্তন ব্যাখ্যা করেছিলেন। হাইগেন সর্বপ্রথম দোলন ঘড়ি আবিষ্কার করেন। ১৬৯৫ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

বোর নীলস্—১৮৮৫ সালের ৭ই অক্টোবর কোপেনহাগেন সহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা কোপেনহাগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে শরীরবিদ্যায় অধ্যাপক ছিলেন বোর খুব অল্প বয়সেই পদার্থবিজ্ঞানে বিশেষ কৃতিত্ব দেখান। পৃষ্ঠটান (surfacetension) সম্পর্কে প্রামাণিক কাজের জন্য বাইশ বছর বয়সে সোনার পদক লাভ করেন। ১৯১১ সালে পি এইচ ডি ডিগ্রি পাবার পর তিনি স্যার জে, জে থমসনের অধীনে কাজ করার জন্য ইংল্যাণ্ডের কেমব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে যান। তিনি বাদার ফোর্ডের সঙ্গেও কাজ করেন। ১৯১৩ সালে বোর তাঁর পরমাণু গঠন তত্ত্ব প্রকাশ করেন। পরমাণু সম্বন্ধে বোরের তত্ত্বে কালক্রমে অনেক পরিবর্তন এসেছে ঠিকই কিন্তু তাঁর প্রথম কাজের সূত্র ধরে রসায়ন ও পরমাণু সম্বন্ধে বহু তথ্য জানা গিয়েছে। কয়েকজন মুষ্টিমেয় বিজ্ঞানী ছাড়া বোরতত্ত্বের তাৎপর্য অনেকেই অনুধাবন করতে পারেন নি।

দীর্ঘ নয় বছর অপেক্ষা করার পর ১৯২২ সালে তিনি পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পান।

বোরের সম্বন্ধে আইনস্টাইনের উক্তি স্মরণীয়—

"No body knows how the standing our knowledge about the atom would be without him. Personally, Bohr is one of the most amieable colleagues I have met. He utters his opinions like one who is perpetually groping, never like one who believes himself to be in the possession of definite truth."

জার্মানদের হাত থেকে পালিয়ে বোর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান ১৯৪০ সালে যুদ্ধের শেষে আবার কোপনহাগেনেই ফিরে আসেন। ১৯৬২ সালের ২০শে নভেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়।

প্লাঙ্ক ম্যাকস্—১৮৫৮ সালে ডেনমার্কের কিয়েল শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মৃত্যু হয় জার্মানীতে ১৯৪৭ সালে। প্লাঙ্ক মিউনিক ও বার্লিনে বিখ্যাত পদার্থবিদ্ হেলমোট্জও কারচফের কাছে শিক্ষালাভ করেন। কোয়োণ্টাম তত্ত্বের উদ্গাতা হিসাবে প্লাঙ্ককে মানুষ চিরদিন স্মরণ করবে। কৃষ্ণ বস্তু থেকে নির্গত বিকিরণের চরিত্র ব্যাখ্যা করার জন্য প্লাঙ্ক তাঁর বিখ্যাত প্রকল্পটি খাড়া করেন। তাঁর মতে আলো প্রকৃত পক্ষে শক্তি সমন্বিত কণা সমষ্টি। এই শক্তি সম্পন্ন কণাদের বলা হয় ফোটন। ১৯০৫ সালে আইনস্টাইন প্লাঙ্কের প্রকল্পকে কাজে লাগিয়ে "আলোক-তড়িৎ ক্রিয়া" বিশ্লেষণ করেন। প্লাঙ্ক তাপবিদ্যা ও আলোকবিদ্যা সংক্রান্ত গবেষণায় জীবন কাটান। ১৮৮৯ সালে তিনি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। প্লাঙ্কের শেষ জীবন বিষাদময় ছিল। তিনি খুব ভাল পিয়ানোবাদক ছিলেন। ১৯০০ সালে প্রকল্প দেওয়ার আঠারো বছর পরে পদার্থবিজ্ঞানে তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়।

আইনস্টাইন অ্যালবার্ট (১৮৭৯—১৯৫৫)—জার্মানীর অন্তর্গত উলম শহরে জন্মগ্রহণ করেন। জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ ঘটে। ১৯০৫ সালে ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে চাকরী করবার সময় আলোর উদ্ভব এবং পরিণতি সম্বন্ধে এক মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। সেই বছরেই "Electro dynamics of moving bodies" নামে প্রবন্ধে আইনস্টাইন যে নতুন তত্ত্ব প্রকাশ করেন তাকে অবলম্বন করেই আপেক্ষিকতাবাদের সৃষ্টি হয়। ১৯১৪ থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপনা করেন। ১৯২১

সালে তাঁকে নোবেল পুরস্কার দ্বারা সম্মানিত করা হয়। ১৯৩৩ সালে জার্মানিতে নাৎসী অধিকার কালে ইহুদী বলে আইন্স্টাইনকে দেশত্যাগ করতে হয়। আমেরিকাতে আশ্রয় গ্রহণ করে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি প্রিনস্টনে অবস্থিত ইনস্টিটিউট ফর এ্যাডভান্স্ড স্টাডি নামক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। সেখানকার বাগানে যে জায়গায় আইনস্টাইন রোজ পদচারণা করতেন তা আজও আইনস্টাইনস্ ওয়াক নামে পরিচিত।

১৯৩৯ সালে যখন রুজভেল্ট আমেরিকায় রাষ্ট্রপতি ছিলেন তখন যুদ্ধাস্ত্রে পারমাণবিক শক্তির প্রয়োগের সম্বন্ধে আইনস্টাইন তাঁকে পরামর্শ দেন। বিজ্ঞানের উৎকর্ষের দ্বারা যাঁরা আজ পারমাণবিক শক্তির প্রয়োগ সম্ভব করে তুলেছেন তাঁদের মধ্যে আইনস্টাইনের নাম অগ্রগণ্য। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে এই শক্তিকে যাতে শুভ উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা যায় সেইজন্য তিনি বিশেষ ভাবে চেষ্টা করেছিলেন। রাজনৈতিক আদর্শ হিসাবে আইনস্টাইন বিশ্বাস করতেন যে বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের পক্ষে এক শাসনের অধিভুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর ভারতবর্ষের প্রতি আইনস্টাইনের শ্রদ্ধা ছিল। উচ্চতর গণিতের বিশেষ ক্ষেত্রে অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নাম আইনস্টাইনের নামের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত হয়ে আছে।

ম্যাক আর্নেষ্ট (১৮৩৬—১৯১৬)—অষ্ট্রিয়ায় জন্ম। বিখ্যাত দার্শনিক। ১৮৮০ সালে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "Science of mechanics" প্রকাশিত হয়।

———

আরও পড়ার জন্য :—

1. The Laws of Nature—R.E. Peierls.
2. One Two and Infinity—G. Gammow.
3. Einstein and Philosophical problems in 20th century Physics—Progress Publisher Moscow.
4. The Special and General Theory—A. Einstein : A. popular Exposition.
5. Physics in the Twentieth Century—V.F. Weisskopf.
6. The nature of Elementary Particles—W. Heisenrgrg—Physics Today Vol 29, 1976
7. The Evolution of Physics—A. Einstein and L. Infeld.
8. The Restless Universe—Max Born
9. Matter and Light, The New Physics—L. de. Broglie
10. The Commonsense of the Exact Science—W. K. Clifford
11. The Rise of New Physics—L. d'Abro
12. Founations of Physics—R.B. Lindsay, and H. Margenau

বিজ্ঞান জগতে পদার্থবিজ্ঞানের একটি বিশেষ স্থান আছে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনে এর অবদান অনস্বীকার্য। কেবলমাত্র ব্যবহারিক ক্ষেত্রেই নয় মনোজগতেও এর প্রভাব বড় কম নয়। নিউটন, গ্যালিলিও, আইনস্টাইন, হাইজেনবার্গ, শ্রেডিংগারের মত রথী মহারথী বিজ্ঞানীদের প্রতিভার যাদুস্পর্শে পদার্থবিজ্ঞানের এক চমকপ্রদ উত্তরণ ঘটেছে। এই উত্তরণ অবশ্য স্বল্পকালের মধ্যে ঘটেনি। দীর্ঘকাল ধরে নামী অনামী বিজ্ঞানীদের সাধনায় পদার্থবিজ্ঞানের ভাবধারা নদীর স্রোতের মত বারে বারে বাঁক নিয়েছে। সনাতনী পদার্থবিজ্ঞান থেকে আধুনিক কোয়াণ্টাম মতবাদ পর্যন্ত দীর্ঘ এই পথপরিক্রমায় পদার্থবিজ্ঞান এইরকম বহু ভাবধারার উত্থান পতনের স্বাক্ষী। এই সব বিচিত্র ভাবধারার স্বরূপগুলি সাধারণ মানুষের কাছে প্রাঞ্জল করে বলা হলো, প্রকৃতির মধ্যে যে রহস্য আত্মগোপন করে আছে তাকে বোঝার জন্য বিজ্ঞানীরা কি ভাবেন তারই এক সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত পাঠকের কাছে তুলে ধরা হলো।

লেখক ডঃ শংকর সেনগুপ্ত দীর্ঘকাল শিক্ষকতা ও গবেষণা নিয়ে ব্যাপৃত। বর্তমানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞানের রীডার। পদার্থবিজ্ঞানে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি প্রাপ্ত। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গবাসী কলেজ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিকস্, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি নানা বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সংগে সময় সময় যুক্ত ছিলেন। গবেষণা ও শিক্ষকতা ছাড়া উনি বাঙলা ভাষায় বিজ্ঞান রচনায় ব্রতী। এঁর লেখা আরেকটি উল্লেখযোগ্য বই হলো "সূর্যের আদিঅন্ত"।

মূল্য : আঠারো টাকা (১৮'০০)

বেস্ট বুকস্
১এ কলেজ রো, কলিকাতা ৭০০০০৯